শংকর

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
—১লা বৈশাখ, ১৩৭২
—১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৫

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্‌-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :
শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীকানাই পাল

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ওয়েস্টার্ন প্লাস্টিকস

উৎসর্গ

গল্পের যাদুকর

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

রেখাচিত্র, তৈলচিত্র, চালচিত্র, আলোকচিত্র, ছায়াচিত্র ইত্যাদি অসংখ্য আকর্ষণী চিত্র থাকতে মানচিত্র কেন? তার কারণ মানচিত্রকে চিরকাল অন্য অনেকের মতো দূর থেকে ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখেছি।

প্রতিদিন মানচিত্র না আনলে ভূগোলের মাস্টারমশায় ভোলানাথবাবু ক্লাশে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তিনি বলতেন, 'ভূগোল পড় আর না পড়, মানচিত্রটা সময় পেলেই উল্টে যাবে। এই যে সাগর, মহাসাগর ও পর্বতমালা বেষ্টিত এবং নদীবিধৌত আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের এশিয়া মহাদেশ, আমাদের পৃথিবী—মানচিত্র না দেখলে কেমন করে তাদের জানবে?'

আমরা চুপ করে থাকতাম। ভোলানাথবাবু বলতেন, 'নিজের চোখে আমরা যতটুকু দেখেছি তার বাইরের কোনো জায়গার বিবরণ জানতে হলে মানচিত্রই আমাদের প্রধান সহায়। হাতের গোড়ায় সব সময় যদি মানচিত্র না থাকে, তবে বৈচিত্র্যে ভরা এই বিশাল পৃথিবীর সমুদ্র, নদী, হ্রদ, জলপ্রপাত, গিরিখাত, পর্বতমালা, সমভূমি, মালভূমি, উপত্যকা, বন-প্রান্তর, মরুভূমি ইত্যাদির অবস্থান, আয়তন এবং দূরত্ব সম্বন্ধে কেমন করে ধারণা করবে? কেমন করে জানবে স্থলভাগের বন্ধুরতা কোথায় কতখানি; পর্বতের উচ্চতা কত? নদীর গতি কোন দিকে? সাগরের গভীরতা কত? সমুদ্র স্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? গোবী মরুভূমি চেরাপুঞ্জির কাছে একটুকরো বৃষ্টিভরা মেঘ ভিক্ষা চেয়েও কেন বিফল মনোরথ হচ্ছে?'

সরু লাঠি দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্রের একটা অংশ দেখিয়ে ভোলানাথবাবু বলতেন, 'এই দেখো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উন্নত হয়ে ভূমি কেমন পর্বতের রূপ ধারণ করেছে। এই দেখো ১৬০০ মাইল দীর্ঘ আমাদের হিমালয়—পৃথিবীর উচ্চতম

পর্বতশ্রেণী। আর এই দেখো সর্বোচ্চ মালভূমি পামীর—যাকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এভারেস্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়। আবার দেখো গ্রস্ত উপত্যকায় পৃথিবীর নিম্নতম হ্রদ, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ ফুট নীচে মরুসাগর। ইতিহাসে এবং সংসারেও তোমরা বারবার এই উচ্চতার পার্থক্য দেখতে পাবে—কেউ ত্যাগ, তিতিক্ষা, শৌর্য, বীর্য, প্রেম ও মহত্বের এভারেস্ট ; আবার কেউ কামনা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ এবং লোভের মরুসাগর !'

ভোলানাথবাবু বলেছিলেন, 'এই উঁচু নীচু বোঝাবার জন্যে বিশেষভাবে আঁকা বন্ধুরতা-সূচক রিলিফ ম্যাপ পাওয়া যায়।'

এখন বুঝি, ইচ্ছে করলে সংসারের 'রিলিফ' ম্যাপও আঁকা যায়—কিন্তু কাজটা খুব নিরাপদ নাও হতে পারে। মানুষকে সঠিক মাপবার জন্যে আমাদের অনেক রাধানাথ শিকদারের প্রয়োজন।

ভারী সুন্দর গল্প করতে পারতেন ভোলানাথবাবু। তিনি বলতেন, 'ভেবে দেখো, এই সুবিশাল ভূমণ্ডল, যার ব্যাস ৮০০০ মাইল, পরিধি ২৫০০০ মাইল, দুঃসাহসী মানুষের কল তার প্রতিটি ইঞ্চি জরীপ করেছে। তোমরা জান ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত ?'

আমরা চুপ করে থেকেছি। ভোলানাথবাবু নিজেই উত্তর দিয়েছেন, 'অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু সত্যি কথা—পৃথিবীর আয়তন ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল! যুগযুগান্ত ধরে কত মানুষ তাদের সুখের গৃহকোণ ত্যাগ করে নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় অজানা সাগরে পাড়ি দিয়েছে। নির্জন মরুভূমিতে, শ্বাপদসঙ্কুল অন্ধকার অরণ্যে, মেরুপ্রদেশের অসহ্য শীতে কতজনের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছে—তবে তো আজ ক্লাশের এই ছোট্ট ঘরে বসে, ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে

আমরা বিশাল পৃথিবীর কথা জানতে পারছি। শত শত বছর ধরে সংখ্যাহীন সাধকের সাধনার ফল তোমাদের চোখের সামনে মানচিত্রের আকারে পড়ে রয়েছে। ইরাতোস্থিনিসের কথাই ধরো না। দু'হাজার বছর আগে এই মিশরীয় পণ্ডিত বহু প্রচেষ্টা করে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেছিলেন।'

যখন আরও বড় হয়েছি তখন ভোলানাথবাবুই বলেছেন, 'মানচিত্র কি একরকমের ? সংখ্যাহীন বিষয়ে মানচিত্র প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে। কোনোটায় রাজনৈতিক সীমা, কোনোটায় কেবল রাজপথ, কোনোটায় কেবল বায়ুর গতিপথ, কোনোটায় কেবল উদ্ভিজ্জ-সংস্থান কিংবা কেবল খনিজ-সম্পদই দেখানো হয়। প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি হাজার হাজার বিষয়ে মানচিত্র হয়।'

ভোলানাথবাবু কিন্তু আমাদের প্রায়ই বলতেন, 'একটা জিনিস সর্বদা মনে রেখো, একটা সুনির্দিষ্ট মান বা পরিমাণের সাহায্যে ছবি আঁকা হয় বলেই একে মানচিত্র বলা হয়ে থাকে।'

তখনও কিলোমিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার ইত্যাদির যুগ শুরু হয়নি। মাইল, গজ, ফুট, ইঞ্চিরা তখনও মনের সুখে অবাধে রাজত্ব করছে। ভোলানাথবাবু পেন্সিলের পিছন দিকটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে জিজ্ঞেস করতেন, 'এক মাইলে কত ইঞ্চি হয় তোমরা কেউ বলতে পারো ?'

আমাদের ক্লাশের চলমান ডিরেক্টরি সুরজিৎ রায় অমনি হাত তুলে বললে, 'হ্যাঁ স্যার, এক মাইল ইক্যুয়ালটু ৬৩,৩৬০ ইঞ্চি।'

'গুড্।' পেন্সিল বাজানো বন্ধ রেখে ভোলানাথবাবু বলতেন 'তোমাদের বই-এর ছোট মানচিত্রে হিমালয়ের দৈর্ঘ্য মাত্র চার ইঞ্চি। অথচ একটা পাখী যদি হিমালয়ের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে চায় তবে তাকে প্রায় ১৬০০ মাইল পথ উড়তে হবে।'

ব্যাপারটা আমাদের মাথায় ঢোকাবার জন্যে একটু সময় দিয়ে তিনি বললেন, 'অর্থাৎ এই মানচিত্রের স্কেল হলো ১ ইঞ্চি = ৪০০ মাইল। কিন্তু খুব সাবধান, অনেক মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী আঁকা নয়—সেখানে অনেক ছোট জিনিসকে বড় করে এবং বড় জিনিসকে ছোট করে দেখানো হয়। তাতে সব ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।'

ক্লাশের ছেলেরা বারবার সেই ভুল করেছে—তাদের আঁকা মানচিত্রে বিন্ধ্যপর্বতমালা হিমালয়ের থেকে আকারে বড় হয়ে গিয়েছে; ব্রহ্মপুত্র নদ গঙ্গানদীর তুলনায় ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করেছে; বোম্বাই কলকাতার খুব কাছে এসে গিয়েছে, অথচ দিল্লীকে মনে হয়েছে অনেক দূরের কোনো শহর।

ভোলানাথবাবু স্যর চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বারবার বলেছেন, 'বয়েজ, সর্বদা স্কেল কথাটা মনে রাখবে—সব জিনিসকে একই মাপে আঁকবে, ছোটকে বড় আর বড়কে ছোট করবে না। স্কেলে ভুল করলে এখন পিঠে স্কেল পড়বে আর পরীক্ষায় মিলবে মস্ত একটা গোল্লা।'

কিন্তু সত্যিই কিছু গোল্লা দেননি ভোলানাথ বাবু স্যার—দয়া করে অনেক ছাত্রকেই পাশ করিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা উপরের ক্লাশে উঠে গিয়েছে এবং আবার ভোলানাথবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

উপরের ক্লাশে ভোলানাথবাবু ইতিহাস পড়াতে আসতেন। কিন্তু ভূগোলের মাস্টার কিছুতেই স্কেলের কথা ভুলতে পারতেন না। তিনি বলতেন, 'ইতিহাসের মুস্কিল—এখানে অনেক কিছুই স্কেলে আঁকা নয়; অত্যাচারী পররাজ্যলোভী লম্পটদের সম্বন্ধে দশ পাতা লেখা, অথচ যাঁরা জ্ঞানে, গরীমায়, ত্যাগে, কর্মে এবং সেবায় আমাদের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন এবং জীবন-ধারাকে সমৃদ্ধ করলেন, আমাদের অন্ধকার জীবনে আলো

আনলেন, তাঁদের পাঁচজনকে হয়তো এক প্যারায় শেষ করে দেওয়া হলো।'

আমরা অবাক হয়ে ভোলনাথবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভোলানাথবাবু গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতেন, 'এখন বইতে যেমন যেমন লেখা আছে সেই রকম পড়ে যাও—পরীক্ষায় পাশ তো করতে হবে। কিন্তু পরে যখন পরীক্ষার অত্যাচার থাকবে না, তখন তোমরা তাদের কথা বেশী করে পড়বে যারা মানুষকে ভালবেসেছিল, যারা সত্যের জন্যে নিজেদের সুখ সম্পদ এমনকি জীবনও ত্যাগ করতে দ্বিধা করেনি। তাদের কেউ কেউ শেষপর্যন্ত কিছুটা সফল হয়েছিল, সেই ফলটুকু আজও আমরা ভোগ করছি—আর অনেকে কিছুই পারেনি। অনেকের রক্তে বৃথাই ধরিত্রীর বুক লাল হয়ে গিয়েছে—কোনো পরিবর্তনই তারা আনতে পারেনি। তাদের আত্মত্যাগটা বোধ হয় বৃথাই গিয়েছে।'

ভোলানাথবাবু বলতেন, 'বয়েজ, সংসার কী জিনিস আমি জানি—বড়ো হয়ে সংসারের নানা দুঃখ কষ্টের সঙ্গে হয়তো তোমরা এমন ভাবে জড়িয়ে পড়বে যে, লেখাপড়া করবার সময়ই পাবে না—নতুন করে জরীপ করে ট্রু-দি-স্কেল তোমরা মানুষের সঠিক মানচিত্র তৈরি করবার কথা ভাবতেই পারবে না। কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট—নিজেদেব ক্ষেত্রে, তোমাদের সংসারের আপন গণ্ডীতে, তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের ক্ষেত্রে যেন স্কেলে ভুল কোরো না। হিমালয়কে মানচিত্রে ছোট করে দেখালে হিমালয়ের কিছু এসে যায় না—কিন্তু যারা সংসারের সাধারণ মানুষ, যারা তোমার কাছে জাস্টিস প্রত্যাশা করে, মানচিত্রে তাদের ছোট করলে মহাপাপ হয়—যার যা প্রাপ্য যে যেন তত ইঞ্চি পায়।'

মানচিত্র

আমাদের সুরজিৎ হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'ম্যাপ আঁকা বড় শক্ত স্যার।'

'শক্ত বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। পৃথিবীর মানচিত্রকারদের জীবনী পড়ে দেখো। ভয় পেয়ে তাঁরা কখনও পিছিয়ে যাননি। তোমারা কখনও ছাড়বে না, সব সময় সব জায়গায় সুযোগ পেলেই মানচিত্র এঁকে যাবে—এতে পৃথিবীকে বুঝতে খুব সুবিধে হবে।'

ভোলানাথবাবু স্যারের সেই উপদেশটা আজও আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়—তখনই আবার মানচিত্রাঙ্কন শুরু করি।

বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরিবেশে আঁকা সংসারের কয়েকটি মানচিত্র একসঙ্গে উল্টে দেখতে গিয়ে আজ এতোদিন পরে ভোলানাথবাবু স্যারের কথাগুলো বারবার মনে পড়ছে। যার যা প্রাপ্য তাকে ততটুকু স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি নিশ্চয়, কিন্তু প্রতিটি মানচিত্রই আমি আমার ভালবাসার স্কেলে আঁকার চেষ্ট করেছি।

এখন শুরু হোক আমাদের মানচিত্রদর্শন।

প্রাকৃভিক

সুদূর অতীতে পিছিয়ে যাবার আগে এই সেদিনের কথা দিয়েই শুরু করি।

চমকে উঠেছিলাম বললে কিছুই বলা হয় না। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, আশ্চর্য হয়েছিলাম, ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, মাথা ঘুরছিল—বাংলা অভিধানের কোনো শব্দ দিয়েই মনের অবস্থা প্রকাশ করতে পারছি না। ভিলাই-প্রবাসী আমার এক নববিবাহিত বন্ধুর জন্যে কয়েকখানা গ্রামোফোন রেকর্ড কিনতে ধর্মতলা স্ট্রীটের এক নামকরা দোকানে ঢুকেছিলাম। সেখানেই যেন অশ্রুমামাকে দেখলাম।

গান বাজনার দোকানে অশ্রুমামা! না না, কিছুতেই হতে পারে না। কোনো হোটেলের বার-এ আচার্য বিনোবা ভাবেকে দেখা গিয়েছিল; কিংবা মোরারজী দেশাই গিনি-সোনার অলঙ্কার দিয়ে কোনো নববধূকে আশীর্বাদ করেছেন—এও আমি বিশ্বাস করতে রাজী আছি; কিন্তু গ্রামোফোনের দোকানে অশ্রুমামা? না না, অসম্ভব!

পকেট থেকে রুমালটা বার করে চোখদুটো মুছে নিলাম। কিন্তু ভুল হওয়া অসম্ভব—কাঁচের ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে বসে অশ্রুমামাই তো একমনে রেকর্ডের গান শুনছেন। পাশে যেন একটি মেয়েও রয়েছে। মেয়েটির দুটি বেণী এবং হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা আমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ যুবতীই—যৌবনের সিংহ দরজার সামনে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে শেষপর্যন্ত সে ভিতরে ঢুকেই পড়েছে।

কতদিন পরে অশ্রুমামাকে দেখছি—অন্ততঃ উনিশ-কুড়ি বছর পরে। কিন্তু তা বলে গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে একটা মেয়েকে পাশে বসিয়ে অশ্রুমামা চোখ বুজে গান শুনে

যাবেন, তা কেমন করে হয়? মেয়েটি এবার অশ্রুমামার কাঁধে হাত রাখলে।

মামা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পছন্দ হয়েছে?'

মাথার জোড়া সাপ দুটো দ্রুততালে নাচিয়ে মেয়েটি বোধহয় বললে সে আরও শুনবে। অশ্রুমামা কোনো আপত্তি করলেন না; বরং দোকানের কর্মচারীকে বললেন, 'আরও কয়েকটা রেকর্ড শোনান!'

বোধহয় আমি ভুল করছি। অশ্রুমামার মুখের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের হয়তো একটা চমকপ্রদ সাদৃশ্য আছে, এই পর্যন্ত।

কিন্তু মেয়েটি এবার আমাদের দিকে একবার মুখ ফেরালো। কিন্তু তাকেও যেন কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে। খুব চেনা-চেনা। কিন্তু তাকে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়েটির যা বয়স, তত বছরের মধ্যে অশ্রুমামার সঙ্গে দেখাই হয় নি আমার।

অশ্রুমামা চলে যাবার পর কৈশোরের সেই অবশিষ্ট দিনগুলোতে তাঁর কথা কতবার ভেবেছি। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি অশ্রুমামারা হয়তো আবার ফিরে আসবেন। কিংবা হয়তো বাড়িতে না এসে তিনি আমার ইস্কুলেই হাজির হবেন। অন্ততঃ যেসব দিনে মোহনবাগানের খেলা থাকতো, সেদিন ইস্কুলের মাঠ থেকে চোখটাকে একবার সার্চলাইটের মতো রাস্তার ওপর ঘুরিয়ে আনতাম। কিন্তু অশ্রুমামা ভুলেও কোনদিন আসেননি।

তারপর একদিন যৌবনের ঝোড়ো হাওয়া দুরন্ত বেগে আমার জীবন-উদ্যানেও হানা দিয়েছে—স্মৃতির অনেক শুকনো ঝরাপাতা আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই কোথায় উড়ে গিয়েছে। কিন্তু অশ্রুমামা যে মুহূর্তের জন্যেও হারিয়ে যান নি তার প্রমাণ, যতদিন কলেজে পড়েছি কখনও চায়ের দোকানে ঢুকিনি।

আরও পরে যেদিন প্রথম রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিলাম, অশ্রুমামার কথা আবার মনে পড়ে গিয়েছিল। মোগলাই পরোটার অর্ডার দিতেই মুক্তোমামার মুখটাও ভেসে উঠেছিল। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়েছিলুম। বলা যায় না, অশ্রুমামা যদি কাছাকাছি কোথাও থাকেন এবং দেখেন আমি চা খাচ্ছি, তাহলে···

এই তাহলের পরিণাম এতই ভয়াবহ যে, আর ভাবতে পারিনি। আজও যে আমি সিগারেট খাই না, তা বোধহয় কেবল অশ্রুমামারই জন্যে। অশ্রুমামা বলতেন, 'চা খেয়ে, বিড়ি ফুঁকে, আর কুঁই কুঁই করে গান গেয়ে পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ মানুষ হয়নি! মুরোদ যদি থাকে দুধ খাও, রাবড়ি খাও, মুরোদ না থাকে ছোলা-সেদ্ধ খাও, কুস্তি লড়ো; তবে না বুঝি!'

এতোদিন পরে অশ্রুমামাকে দেখে সে-সব আবার মনে পড়ছে। অশ্রুমামার মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। অশ্রুমামা সত্যিই বেশ বুড়ো হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু ওই মেয়েটা কে? ওর মুখটা এখন আরও চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ওর গায়ের রঙ শ্যামল, কিন্তু ভাবভঙ্গিতে সুন্দর একটা আলগা চটক আছে। আর ওর চোখদুটো—ঠিক যেন মীরামাসির চোখের মতই দুষ্টুমিভরা। কোনো যৌবনবতী কল্যাণী নারীর চোখ নয়, ঠিক যেন চোদ্দ বছরের ডানপিটে ছেলের বেপরোয়া বেআইনী চোখ। অথচ ঠিক তা ভাবলেও ভুল করা হবে। ওই আপাতদুরন্ত ও চঞ্চল দৃষ্টির পিছনে কোথায় যেন নারীত্বের গভীর সরোবর টলটল করছে—বাইরেটা পানায় ঢাকা, কানায় কানায় পূর্ণ দীঘিকে তাই সবুজ মাঠ বলে ভুল হবার সম্ভাবনা।

মীরামাসির চোখদুটোই ডাক্তাররা কেটে নিয়ে মেয়েটার অক্ষিকোটরে বসিয়ে দিয়েছেন নাকি? না মীরামাসিই কোনো

নবাবিষ্কৃত ওষুধের আশীর্বাদে আবার তাঁর কৈশোরে ফিরে গিয়েছেন ? এই মীরামাসিকেই তো আমরা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। এই বয়সের মীরামাসিই তো আমার সামান্য জীবনে অসামান্য বিপ্লবের নিঃশব্দ সূচনা করেছিলেন।

আর একটা রেকর্ড বাজানো শেষ হলো। মেয়েটি আবার বৃদ্ধ অশ্রুমামার শীর্ণ হাতটা জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি আরও গান শুনবো।' মীরামাসিও তাঁর বাবাকে ঠিক এমনি ভাবেই জড়িয়ে ধরতেন।

ওরা আবার গানের সাগরে ডুব দিল। আমি নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি। যেন আমি মানসিক হাসপাতালের রোগী—বিশেষ বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় আমার বিস্মৃত অতীতকে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। অনেক কিছুই ধীরে ধীরে মনে পড়ছে আমার। কিন্তু অশ্রুমামা ও মীরামাসি ? অসম্ভব! ইমপসিবল্! অ্যাবসার্ড!

কিন্তু যুগযুগান্তের হারিয়ে-যাওয়া দ্বীপ অতলান্ত সমুদ্রগর্ভ থেকে আবার উঠে আসছে! প্রথমেই মিলটন সায়েবের কথা মনে পড়ছে। হান্টলি বিস্কুট অ্যাণ্ড লজেন্স লিমিটেডের ইণ্ডিয়া ম্যানেজার মিলটন সায়েব। আর অশ্রুমামা প্রসঙ্গে তাঁর সেই কথাটি—'টীটোটাল'।

অশ্রুমামাকে মিলটন সায়েব বলেছিলেন, 'যারা মদ খায় না ইংলণ্ডে আমরা তাদেরই টীটোটালার বলি। কিন্তু ঠিক নয় সেটা। টী—চা-ও একধরনের নেশা। আই রেসপেক্ট ইউ অশ্রু। এখন টীটোটাল বলতে একমাত্র তোমাকেই আমি বুঝি।'

মুক্তোমামার কথাও আমার মনের মধ্যে এসে পড়ছে। আর বেচারা দিতুই বা কী দোষ করলেন ?

তাহলে ফিরে যাই সেই পুরনো যুগে—সেই দিনে যখন অশ্রুমামা ও মীরামাসি দু'জনেই আমার উপর সমানভাবে

রাজত্ব করতেন। আমার ক্ষুদ্র রাজ্যে কার আধিপত্য বেশী তা নিজেই তখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি।

ইতিহাসে এবং আদালতে টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোকে কালানুক্রমে সাজিয়ে নেবার রীতি আছে। আইন-জগতে বলে লিস্ট অফ ডেট্‌স্—তারিখের তালিকা। বাইরে থেকে এই তালিকাকে এমন কিছু মনে হয় না—কিন্তু বাঘা বাঘা আইনজ্ঞের কাছে শুনেছি, খুব জটিল ঘটনা বোঝবার ব্যাপারে (এবং বোঝাবার জন্যেও বটে) এই কালানুক্রমিক তালিকার তুলনা নেই।

সময়ানুক্রমে অশ্রুমামার কথাই প্রথম বলতে হবে। অশ্রুমামা যে কী করে আমাদের মামা হলেন তাও বুঝি না। আমরা তখন একটা বাসা ভাড়া নিয়ে সবে নতুন বাজার সেকেণ্ড বাইলেনে উঠে এসেছি। এ-পাড়ার বাড়িগুলো মিউনিসিপ্যাল আইন অমান্য করে একটার গায়ে একটা লেগে আছে। ইচ্ছে করলেই যেন একটা ছাত থেকে লাফিয়ে আর একটা ছাতে যাওয়া যায়। এখানে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল তাঁর নাম দিচ্ছু—অশ্রুমামার মা।

বয়স অল্প তখন। পড়াশোনার তেমন চিন্তা ছিল না। নতুন জায়গাতে এসে মনটাও ছটফট করছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখি পাশের দোতলা বাড়িটার দরজা খোলা।

সোজা ভিতরে ঢুকে পড়েছিলাম।

ঢোকবার পর একটু ভয় হলো। কী জানি, অচেনা বাড়িতে এইভাবে ঢুকে পড়া ঠিক হয়নি। বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই ধরা পড়ে গেলাম। দরজা

দিয়ে ঢুকতেই একটা সান-বাঁধানো উঠোন। উঠোনের পরেই বারান্দা। আর সেই বারান্দায় এক বৃদ্ধা বসে আছেন। তপ্তকাঞ্চন রঙ। মাথায় সাদা-পাকা বড় বড় চুল। সাদা থান পরা। চোখে চশমা লাগিয়ে দীর্ঘাঙ্গিনী ভদ্রমহিলা কী যেন পড়ছিলেন—'কর্মসকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কর্মে ফলস্পৃহা নাই! এইরূপ আমায় যে জানে সে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। এইরূপ জানিয়া পূর্বকালের মোক্ষাভিলাষিগণ কর্ম করিয়াছিলেন, তুমি পূর্বগামিদিগের পূর্বকাল কৃত কর্মসকল কর।'

বেশ যে গড় গড় করে সুর দিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন তা নয়---আস্তে আস্তে থেমে থেমে, মাঝে মাঝে প্রায় বানান করে করে বিড় বিড় করে পড়ছিলেন। ভয় হলো আমার। আমি এবার চলে আসছিলাম, কিন্তু চশমার ভিতর থেকে আমাকে দেখে তিনি হাতের ইশারায় থামতে বললেন। আমার ভয় আরও বেড়ে গেল। বললাম 'আমি ভুলে ঢুকে পড়েছি। আর কখনও করবো না। আমার মা জানতে পারলে আমার হাড় গুঁড়িয়ে ফেলবে।'

ভদ্রমহিলা শুনলেন না। পুজোর মধ্যে কথা বলতে পারছেন না। ইশারায় থামতে বলে, তাড়াতাড়ি পড়তে লাগলেন: 'যে কর্মতেও কর্মশূন্যতা দেখে, এবং অকর্মেও কর্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান। সেই যোগমুক্ত এবং সেই সর্বকর্মকারী! যাঁহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবর্জিত এবং যাঁহার কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন।'

বইটা বারকয়েক মাথায় ঠেকিয়ে, তিনি একটা দড়ি দিয়ে এবার সেটা বাঁধতে লাগলেন। একবার ভাবলাম এই সুযোগে পালাই কিন্তু সাহস হলো না—যদি ছুটে এসে ধরে ফেলেন। নিরুপায় হয়ে করুণ স্বরে বললাম, 'এবারের মতো ছেড়ে দিন।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'উঁহু, ঢুকেছো যখন ছাড়ছি না!'

'আমরা নতুন এসেছি কিনা। দরজা খোলা দেখে ভাব করবার জন্যে ঢুকে পড়েছি,' আমার সপক্ষে ওকালতি করলাম।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ও সব কিছু শুনতে চাই না, আগে উপরে উঠে এসো।'

ভাবলাম কপালে আজ দুঃখ আছে। কিন্তু এ কি! বকুনির বদলে মিষ্টি! পাশের থালা থেকে কয়েকটা বাতাসা তুলে বৃদ্ধা আমার হাতে দিলেন। 'আহা' আজ আমার কী কপাল, বাউনকে খাইয়ে নিজে জল খেতে পাবো।'

আমি যে বামুন তা উনি কী করে জানলেন, তাই ভাবছিলাম। কিন্তু বুড়ী দেখলুম আরও অনেক কিছু জানেন। বললেন, 'তোমারই নাম তো শংকর?'

'কী করে জানলেন?'

'আমি আর কী করে জানাবো? অশ্রুর কাছে শুনলাম। তোমাদের সব খবর তোমার বাবার কাছ থেকে অশ্রু জেনে নিয়েছে। তবে সে বোধহয় তোমাকে শংকর বলে ডাকবে না। শানকি সায়েব না কী একটা বলে ডাকবে ঠিক করেছে। জানিনি বাপু, ঠাকুর-দেবতার নাম ছিল—শংকর ভোলানাথ, এরপরে কি কোনো কথা আছে? কিন্তু তার সবই সায়েবী ব্যাপার—আমার কথা তো শুনবেনা। তা অশ্রু আজ সকাল সকালই ফিরে আসবে—তোমাদের সঙ্গে গল্প করবে বলে গেছে। কাল তোমাদের জন্যে আপিস থেকে ল্যাবেনচুস পর্যন্ত এনে রেখেছে।'

বুড়ির এই সব কথা শুনে আমি তো অবাক। এঁকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম—আমার মাথায় সত্যিই গোবর। বাতাসা খেতে খেতে আমি বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। বললাম, 'আমি যে বাতাসা খেয়েছি তা যেন মাকে বলবেন না!'

'কেন, মা বকবে? দেখি কত বড় আস্পর্ধা তার, বকুক দিকি! আমি কে হই জানো তো? তোমার দিদিমা। আমরা এ-বাড়িতে অনেকদিন ভাড়াটে আছি। তোমার দুই মামা—অশ্রুমামা আর মুক্তোমামা। বিকেলে আজ অশ্রুর সঙ্গে দেখা হবে। মুক্তোর সঙ্গে এখন ভাব হবে না। সে গিরিডি গিয়েছে হাওয়া বদলাতে।'

কয়েক মিনিটেই নতুন বন্ধু লাভ হলো। সারাজীবনই ঈশ্বরের এই বিশেষ অনুগ্রহ আমি পেয়েছি। হয়তো বিগত জন্মে নিঃসঙ্গ বন্ধুবিহীন জীবন যাপন করেছি; তাই এ-জন্মে সুদ সমেত বকেয়া পাওনা আদায় করছি। অন্তত, তাই যেন হয়! কারণ, এ-যদি আগাম সুখভোগ হয়, তাহলে সামনের জন্মে দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে এখন থেকেই শিউরে উঠছি!

বাতাসা মুখে পুরে জল খেতে খেতে দিদিমাকে বললাম, 'আপনারা খুব ভাল লোক।'

'ওমা, নাতি আমার বলে কি গো! আমাকে বুঝি খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছে—আমাকে বে করবে?'

আমি বলেছি, 'ধ্যাৎ!'

দিদিমা বলেছেন, এখনই কথা দিতে হবে না। মেয়েকে কিছুদিন ছাখো। যদি পছন্দ হয়. তখন না-হয় পাওনা-গণ্ডার কথা ভাবা যাবে!'

'ভাল হচ্ছে না বলছি!'

'ঠিক আছে বাপু, এ-সব কথা আমি বাইরে চাউর করছি না। ভিতরে ভিতরে দুজনের মধ্যে যা হয় হবে,' দিদিমা বলেছেন।

দিদিমার সঙ্গে আরও কথাবার্তা হয়েছে। জিজ্ঞেস করেছি, 'বাড়িগুলো এখানে এত গায়ে-গায়ে কেন?'

'সে আর বোলো না ভাই। ও-সব চোরদের সুবিধের

জন্যে বাড়িওয়ালা ঐভাবে তৈরি করেছে। ছাদে তো ভয়ে আমরা যাই না। সব সময় ছাদের দরজায় তালা লাগিয়ে রাখতে হয়। ছাদ দিয়ে ছাদ দিয়ে এক রাত্তিরে এখানে সাত বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছে।'

কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু ছোটবেলার সেই সব দিনের প্রতিটা কথা গ্রামোফোন কোম্পানির দোকানে দাঁড়িয়ে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে।

দিছু আমাকে প্রতিদিন যা-যা বলেছেন, অশ্রুমামার সঙ্গে আমার যা-যা কথা হয়েছে, অশ্রুমামা কবে কি খাইয়েছেন—তার কিছুই আমি ভুলিনি। আর মীরামাসিকেও না।

মীরামাসি তো নিজেই বলেছিলেন, 'আজ থেকে আমার নাম হাসি—অশ্রুর ঠিক উল্টো। ওরা যদি উত্তর মেরু হয়, তাহলে আমি দক্ষিণ মেরু। ওরা যদি ইংরেজ হয়, আমি জার্মান। ওরা যদি মোহনবাগান হয়, আমি ইস্টবেঙ্গল।'

পুরনো দিনের কথা এই যে এতো মনে আছে, তার একমাত্র কারণ বোধহয় আমার শৈশবই আমার স্বর্ণযুগ। বিধাতারূপী পুলিস কনস্টেবলের নির্দেশে জীবনের বাসটা ভোরবেলায় যেন কৈশোরের চৌমাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তারপর আবার জনাকীর্ণ বিপদসঙ্কুল এবড়ো খেবড়ো পথে যাত্রা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। কখন এ-যাত্রার শেষ হবে কে জানে। কিন্তু যাবার পথে, ভোরবেলার সেই চৌমাথার কথাই বারবার ভাবছি।

অশ্রুমামাকে না দেখেই ভালবেসেছিলাম। বিকেল থেকে অধীর আগ্রহে জানলার ধারে বসেছিলাম—কখন তিনি আসবেন।

আমার প্রতীক্ষা সার্থক করে অশ্রুমামা শেষপর্যন্ত অফিস থেকে ফিরলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি আর তার সঙ্গে কালো রঙের অক্সফোর্ড বুটজুতো পরেছেন অশ্রুমামা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। অশ্রুমামার বয়েস তখন কত হবে ? চল্লিশের কাছাকাছি। অন্তত পৌনে ছ'ফিট লম্বা। ডান দিকে ভ্রূতে লম্বা কাটা দাগ। মুখটা গোল। হাতে একটা ইংরিজী কাগজ। অফিসের এই জামাকাপড়ে অশ্রুমামাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছিল।

আমি দোতলায় জানলার উপরে বসেছিলাম। সোজা নীচে নেমে এসে দিত্বর বাড়িতে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন, হাত বাড়িয়ে অশ্রুমামা বললেন, 'স্যাংকে সায়েব, হাউ-ডু-ইউ-ডু ?'

আমি তখন ইংরিজী বুঝি না। বললাম, 'আমি তো হাডুডু খেলি না।'

অশ্রুমামা হেসে ফেললেন, 'তুমি সায়েব কিনা, তাই ইংরিজীতে আলাপ করলাম। সায়েবরা প্রথমে দেখা হলে ওই কথা বলে। মানে আপনি কেমন আছেন ?'

'আমি তো বেশ ভালই আছি।'

অশ্রুমামা আবার হেসে ফেললেন। 'উত্তরে তোমাকেও বলতে হবে, হাউ-ডু ইউ-ডু।'

অফিসের জামাকাপড় খুলে অশ্রুমামা একটা গামছা পরে ফেললেন। বারান্দায় একটা মাতুর বিছিয়ে তিনি সটান শুয়ে পড়লেন। সে কেবল কয়েক মিনিটের জন্যে, তারপর ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'সায়েব-বাড়ি কিনা, তাই ঘড়ি ধরে কাজ। মিলটন সায়েব আমাকে একদিন বলেছিলেন, "মিটরা, তোমরা হয়তো ভাবো আমি এই আপিসের বড়সায়েব। সম্পূর্ণ ভুল।

এখানকার বড়সায়েব হচ্ছেন উনি," বলে দেওয়ালের ঘড়িটাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।'

গা-হাত-পা ধুয়ে অশ্রুমামা আমাকে ঘরের মধ্যে ডাকলেন। সেখানে দুটো আসন পাতা রয়েছে। আমাকে বললেন, 'সায়েব, এবার বসে পড়ো। পুজো করতে হবে।'

'কী পুজো?' আমি একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম।

'বসে পড়ো, তারপর বলবো। পুজো জিনিসটা খুব ইম্পর্টাণ্ট! মিলটন সায়েবও পুজো করেন। রবিবার সকালে এক হাত অন্তর বজ্রপাত হলেও চার্চে যাবেন মেমসায়েবকে নিয়ে।'

দিদু এবার দুটো থালা হাতে ঘরে ঢুকলেন। তাতে চিঁড়ে-দই আর একটা করে সন্দেশ। মামা বললেন, 'অন ইওর মার্চ, রেডি, সেট গো! পুজো আরম্ভ করে দাও। এর নাম পেট পুজো।'

আমার লজ্জা লাগছিল খুব। আবার মনে মনে যে আনন্দও হচ্ছিল না, এমন নয়। দিদু অন্য সময় কত কথা বলেন। কিন্তু অশ্রুমামার সামনে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ান। খুব আস্তে আস্তে, যে-কটা কথা না বললেই নয়, তাই বলেন। দিদু বললেন, 'অশ্রু যখন বলছে, তখন খেয়ে নাও।'

আমার তখনও লজ্জা লাগছে। অশ্রুমামা বললেন, 'এই পুজোর কথা কেউ জানতে পারবে না। সুতরাং ভাববার কিছু নেই।'

আমি এবার আমার ভয়ের আসল কারণ নিবেদন করলাম। 'আপনি তো বলছেন জানতে পারবে না। কিন্তু একটু পরেই মা যখন আমার পেটে হাত দেবে, তখন কী হবে? পেট দমসম হয়ে রয়েছে দেখলে রাত্রের খাওয়া বন্ধ করে দেবে।'

অশ্রুমামা মিটমিট করে হেসে বললেন, 'সেটি কিছুতেই হবে না। এটা যে চিঁড়ে-দই। গলা দিয়ে নামতে নামতেই হজম হয়ে যায়। ভারি ভাল জিনিস।

'মিলটন সায়েবের সেবার বদহজম হলো। যা খান, তাই অম্বল হয়ে যায়। চোঁয়া ঢেঁকুর মারে। সায়েব-বাচ্চাদের কাছে ঢেঁকুর তোলাটা যে কী ধরনের অসভ্যতা জান না তো! মায়ের সামনেও ঢেঁকুর তুললে তিনবার এক্সকুজ মি, এক্সকুজ মি বলতে হবে। আর নিজের মেমসায়েবের সামনে করলে তো রক্ষে নেই। আমাদের ফেটিস সায়েবের বৌ তো ঐ কারণেই রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেল। ফেটিস সায়েবকেও বলেছিলাম, সায়েব, চিঁড়ে-দই ধরো। তা, সায়েবের মাথায় কথাটা গেল না।

'মিলটন সায়েব মিট্রা বলতে অজ্ঞান, তাছাড়া বুদ্ধিমান লোক। আমার কথা শুনে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু সায়েবেরও যেমন কাণ্ড—মেমসায়েবকে ফারপোর দোকানে পাঠিয়েছে চিঁড়ে-দই কিনতে।

'পরের দিন সকালে আপিসে এসেই মিলটন সায়েব বিরক্তভাবে ডেকে পাঠালেন। বেশ রেগেমেগেই বললেন, "অশ্‌রু, তুমি এমন ফুড আর মেডিসিনের নাম দিয়েছো যা হোল্ ক্যালকাটার কোথাও পাওয়া যায় না। ফারপোতে পর্যন্ত তার নাম শোনেনি। ফ্র্যাংক রস, বাথগেটও কোনো হেল্প করতে পারলে না।"

অশ্রুমামা চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, 'কত টন চিঁড়ে আর দই চাই?"

মিলটন সায়েব তখনই বৌকে অফিসে চলে আসতে ফোন করে দিলেন। মেমসায়েব আসতেই ওঁদের গাড়িতে চড়ে মামা চিঁড়ের দোকানে গেলেন। সেখান থেকে দই-এর

দোকানে। মেমসায়েব দোকানদারদের নাম-ঠিকানা সব লিখে নিলেন।

'তারপর তিন দিনের মধ্যেই চোঁয়া ঢেঁকুর চোঁ চাঁ দৌড় দিলে,' অশ্রুমামা বললেন। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তাহলে বুঝতেই পারছো, চিঁড়ে-দই খেলে কেউ ধরতে পারবে না।'

খাওয়া শেষ করে কল-ঘরে মুখ ধুতে গিয়ে আবার বিপদে পড়লাম। মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'এক সেকেণ্ডেই কাজ শেষ? তা হয় না। অন্ততঃ পাঁচবার কুলকুচো করতে হয়। সায়েবদের মুখে অত গন্ধ কেন? খেয়ে ভাল করে মুখ ধোয় না। মিলটন-মেমসায়েব তো অত স্নো-সেণ্ট মাখেন। কিন্তু মুখের মধ্যে যেন পচা মাছের বাজার বসেছে।'

প্রথমে একটু অস্বস্তি ও লজ্জা বোধ করেছিলাম। কিন্তু অশ্রুমামার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে, যা কিছুতেই প্রতিরোধ করা যায় না, অশ্রুমামাকে ভাল না বেসে যেন উপায় নেই। খাওয়া হয়ে গিয়েছে, তাঁকে ছেড়ে এবার আমি চলে যেতে পারতাম, কাছাকাছি কোনো মাঠে গিয়ে একটু খেলাধুলোও করতে পারতাম। কিন্তু তখন আমার অশ্রুমামার কাছে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে।

অশ্রুমামা এবার ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে একটা ইংরিজী খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন। অশ্রুমামা বললেন, 'ইণ্ডিয়াতে কাগজ এই একটাই আছে। এর নাম স্টেট্স্ম্যান। আর সব কাগজে ঝুড়ি ঝুড়ি ইংরিজী ভুল। ফ্রেজ, ইডিয়ম, প্রিপোজিসন, টেন্স সব গোলমাল করে ফেলে। ইংরিজী ভাষাটা যদি অতই সোজা হতো, তা হলে সবাই তো দেশ চালাতে পারতো।'

আমাদের বাড়িতে অন্য একটা কাগজ নেওয়া হতো।

তাই অশ্রুমামার কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মামার সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি তখন খুঁটিয়ে স্টেটস্‌ম্যান পড়তে শুরু করলেন।

এরপর অশ্রুমামাকে কতবারই তো স্টেটসম্যান পড়তে দেখেছি। কাগজটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পড়তে তাঁর অনেক সময় লাগতো, ততক্ষণ আমি চুপচাপ বসে থাকতাম। কোনো ছবি দেখলে ঝুঁকে পড়তাম। মামা তখন বুঝিয়ে দিতেন, এটা জেনারেল আইসেনহাওয়ারের ছবি।

মামা আবার মাঝে মাঝে ধাঁধা ধরতেন। 'বল দেখি, একটা চিলের যদি তুটো পা হয়, তবে চার চিলের ক'টা পা?' আমি বলতাম, 'এটার উত্তর খুব সোজা—আটটা।' মামা অমনি বলতেন, 'হয়নি। চার্চিলের তুটো পা—বিশ্বাস না হয়, এই ছবিটা দেখো। চার্চিল সায়েব সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলছেন।'

চার্চিলের কথা উঠলেই মামা একটু বিরক্ত হতেন। তুঃখের সঙ্গে বলতেন, 'লোকটার এতো বুদ্ধি। অথচ মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বোস এদের উপর কেন যে এত চটা।'

কথা বলতে বলতে মামা আবার কাগজের মধ্যে ডুবে যেতেন। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর হুঁশ থাকতো না। আমি তখন অধৈর্য হয়ে তাঁর চশমার খাপটা নিয়ে লোফালুফি করতাম; একবার খুলতাম আর একবার বন্ধ করতাম, আর অপেক্ষা করতাম কখন অশ্রুমামা খেলার পাতায় আসবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, এ-পাড়ায় আসবার আগে আমি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার ছিলাম। ওরা তখন প্রায়ই অনেক গোলটোল করতো। তাছাড়া আমাদের দেশ যখন যশোরে, তখন আমাদের ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার হওয়া উচিত,

এই জানতাম। কিন্তু অশ্রুমামাই আমাকে মোহনবাগানের দলে টেনেছিলেন।

আমি প্রথমেই রাজী হই নি! তখন তিনি আমাকে চকোলেট খাইয়ে বলেছেন 'স্যাংকে সায়েব, যারা সত্যি খেলোয়াড়, তাদেরই তোমার সাপোর্ট করা উচিত।'

আমি বলেছি, 'মোহনবাগান যে বড্ড হেরে যায়, কথায় কথায় ড্র করে। ওদের দলে থাকলে, ভাবতে ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

অশ্রুমামা সেদিনের একটা ছোট্ট ছেলেকে হাল্কাভাবে নেননি। যেন আমাকে দলে টানার পেছনেই মোহনবাগানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অশ্রুমামা বলেছেন, 'আমাদের দেশের কথাই ধরো না। সুভাষ বোস, গান্ধী, জহরলাল তো কত চেষ্টা করছে দেশকে ছাড়াবার জন্যে—পারছে না। তা বলে আমরা কী তাদের সাপোর্ট করবো না?'

আমি তবুও মত পরিবর্তন করিনি। বলেছি. 'এতদিন ইস্টবেঙ্গলকে সাপোর্ট করে এলাম।'

'কতদিন? ফুটবল খেলাতে কতদিন তোমার আগ্রহ হয়েছে?'

আমি বলেছি, 'গত বছর থেকে।'

'একটা বছর কিছু নয়! পাঁচ-ছ বছর খেলে কত প্লেয়ার ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে অন্য ক্লাবে চলে যাচ্ছে।'

আমার মনটা তখন প্রায় মোহবাগানের দলে চলে গিয়েছে। বলেছি, 'ওরা তো খুব ভদ্র টীম, তাই না?'

'ঝগড়া-ঝাঁটি, ল্যাঙ্ মারা, কাঁচি দেওয়া এ-সবের মধ্যে মোহানবাগান একদম নেই।'

জিজ্ঞেস করেছি, 'আচ্ছা মামা, মিলটন সায়েব মোহনবাগানের না ইস্টবেঙ্গলের?'

মামা দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'কারুর নয়—সায়েব ক্যালকাটা ক্লাবের সাপোর্টার। নিজেদের টীম যে। তবে একটা কথা তোমাকে বলতে পারি যদি কাউকে না বলো। একেবারে কনফিডেনসিয়াল। যদি মিলটন সায়েব জানতে পারেন যে আমি এটা লিক করেছি, তাহলে ইণ্ডিয়ানদের কোনোদিনই তিনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

'খবরের কাগজ ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলবো না।'

'খুব সাবধান কিন্তু। কারণ, আমাদের আপিসে অনেক ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার আছে। যদি একবার জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে মিলটন সায়েব বিপদে পড়ে যাবেন।'

সেদিন আমি কথা দিয়েছিলাম, প্রাণ থাকতে সেই গোপন সংবাদ কিছুতেই প্রকাশ করবো না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনও কোনোদিন আমার প্রতিশ্রুতির খেলাপ করিনি। অশ্রুমামার অফিসেও তো গিয়েছি কতবার। অষ্টা মামা, টি সি রায়, বেণু হালদার, ঘোতন নন্দী, এমন কি মিস ফ্রাই-এর সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে। এক একবার ওঁদের যখন উত্তেজিত ভাবে খেলা নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছি, তখন লোভও হয়েছে, কিন্তু আমি কাউকে কিছুই বলিনি।

মীরামাসিকেও বলিনি। এতোদিন পরে এখন যে প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছি তার কারণ, মিলটন সায়েব বহুদিন আগেই ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ইণ্ডিয়া কেন, মিলটন সায়েব যে সবার মায়া কাটিয়ে এই পৃথিবী থেকেও বিদায় নিয়েছেন, তা স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজেই কিছুদিন আগে দেখেছি।

শুধু মিলটন সায়েবই বা কেন, অশ্রুমামা, দিহু, মীরা মাসি, মুক্তোমামা কে কোথায় ভেসে গেল। সর্বনাশা ঝড়ে রাত্রের অন্ধকারে তারা যেন কোথায় চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল। কেবল আমি, এই হতভাগা স্যাংকে সায়েবই পুরনো দিনের

স্মৃতিগুলোকে ছেঁড়াকাঁথার মতো বুকের কাছে জড়ো করে চুপচাপ বসে আছি।

আজ তাই সেই অতি গোপনীয় সংবাদটি প্রকাশ করতে দ্বিধা কী?—মিলটন সায়েব গোপনে গোপনে মোহনবাগানকে ভালবাসতেন। মামাকে তিনি বলেছিলেন, 'অশ্রু যদি সি এফ সি না থাকতো তাহলে আমি মোহনবাগান ক্লাবের মেম্বার হতাম। ভেরি গ্রেট ক্লাব। এখনও শীল্ডের খেলায় প্রথমে ক্যালকাটাকে সাপোর্ট করি। কিন্তু আমাদের টীম তো হয় ফার্স্ট রাউণ্ডে না হয় সেকেণ্ড রাউণ্ডেই হেরে যায়। তারপরই আমার কনসেন্স ফ্রি—আমি তখন মোহনবাগানকে ফুল সাপোর্ট দিই। কারণ ওয়ান থিং, মোহনবাগান নন্-ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে, ওরা ফাউল করার মধ্যে নেই। আর তাছাড়া, মোহনবাগান জেণ্টল্‌মেন—ওরা ভদ্রতা জানে। খেলতে নেমেছে খেলে যাবে, জিতবার চেষ্টা করবে, দু একটা গোলও দেবে। কিন্তু অন্যপক্ষকে দুর্বল দেখলে ওরা অপমান করে না। এই তো সেদিন—ক্যালকাটাকে ইচ্ছে করলেই এক ডজন গোল খাইয়ে দিতে পারতো। কিন্তু মাত্র দুখানা দিয়েই থেমে গেল।'

অশ্রুমামার সংস্পর্শে এসে আমার জীবন যেন অন্য খাতে বইতে শুরু করেছিল। মোহনবাগানের কথা ভাবতে ভাবতে রাত্রে আমার ঘুম হতো না—আমি কোন দলে যাবো; কাকে আমার সাপোর্ট করা উচিত।

মামা এদিকে কাগজ পড়ে যাচ্ছেন। খেলার পাতায় এলেই, আমি উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসতাম। 'কী হলো মামা? ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান? কে জিতলো?'

অশ্রুমামা বলতেন, 'দুঃখের কথা বল কেন? ইস্টবেঙ্গল

জিতেছে, কিন্তু মোহনবাগান আবার ড্র ; মোহনবাগান জিততে ভুলে গিয়েছে—ড্র ছাড়া আর কিছুই যেন জানে না ওরা।’

বেচারা মোহনবাগানের জন্যে দুঃখ হয়েছে আমার। যারা ভাল মানুষ, যারা নিয়মকানুন মেনে চলে তারাই তো জিততে পারে না। অশ্রুমামার চাপে পড়ে নিজের অজান্তেই কখন আমি মোহনবাগানের শুভানুধ্যায়ী হয়ে পড়েছি।

অশ্রুমামা বলেছেন শুধু দূর থেকে সাপোর্ট করলে তো চলবে না। নিজে মাঠে গিয়ে মোহনবাগানকে জিততে সাহায্য করতে হবে। মামা নিজেই ব্যবস্থা করেছেন।

শনিবার দিন অশ্রুমামা মিলটন সায়েবের গাড়ি নিয়ে সোজা আমার ইস্কুলে হাজির হয়েছেন। হেডমাস্টারমশায়কে বাবার লেখা চিঠি দেখিয়ে সকাল সকাল ছুটি করিয়ে নিয়েছেন। তারপর গড়ের মাঠে গিয়ে লাইন দিয়েছি।

মাঠের আর সবই সহজ। কিন্তু শক্ত হলো আইসক্রীম-ওয়ালার সামনে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। অথচ উপায় নেই। রাস্তায় কিছু খাওয়া অশ্রুমামা মোটেই পছন্দ করেন না। অশ্রুমামা বলেন, ‘ভাল লোকেরা কখনও রাস্তায় খায় না। কোনো সায়েবকে কখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা বা আইসক্রিম খেতে দেখেছো? তুমিও না স্যাংকে সায়েব?’

এরপর আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু কতলোক তো কিনে খাচ্ছে—এরা সবাই কি খারাপ লোক? আর খাওয়াটা যদি খারাপই হতো, তাহলে ক্যালকাটা ক্লাবের সায়েবরা তাদের মাঠে এ-সব নিশ্চয়ই বিক্রি করবার পারমিশন দিতো না।

অশ্রুমামা বলেছেন, ‘মশলা-মুড়ি’ কাটা ফল, পটাটো চিপ্‌স, আলুকাবলী, ঘুগনি, আইসক্রিমের মধ্যে কত ময়লা বীজাণু রয়েছে। এ-সবের থেকেই অসুখ হয়।’

আমি বলেছি, 'চা? ওই যে ঘড়া থেকে ঢেলে বিক্রি করছে? ওটা তো গরম জিনিস। ওর মধ্যে তো কোনো বীজাণু থাকবে না।'

চায়ের কথা উঠতেই অশ্রুমামার মুখ যে অমন নীল হয়ে উঠবে আশা করিনি। 'তুমি বাড়িতেও চা খাও নাকি?' অশ্রুমামা জিজ্ঞেস করে বসলেন।

'না, আমি চা খাই না,' বলেছি আমি। 'চায়ের বদলে এক কাপ দুধ খাই।'

সেদিন অশ্রুমামা মাঠে আর কিছু বলেননি। কিন্তু পরের দিন দিত্বর সঙ্গে দুপুর বেলায় আমার দেখা হয়েছে।

দিত্ব তখনও গীতা পড়ছিলেন—'হে পুরুষর্ষভ! সুখদুঃখে সমভাব যে বীরপুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন।'

আমাকে দেখেই ইঙ্গিতে থামতে বললেন। তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করলেন তিনি। তারপর ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস্ করে বললেন, 'তোমাকে বলতে সাহস হচ্ছে না। কিন্তু অশ্রু তোমাকে খুব ভালবাসে, তাই না বলেও পারছি না। কালকে মাঠে তুমি চা খেতে চেয়েছিলে?'

ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বললাম. 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

দিত্ব আমার হাতটা চেপে ধরলেন। 'লক্ষ্মী দাত্ব আমার' সোনা আমার, ধন আমার, অশ্রুর কাছে কখনও চায়ের নাম পর্যন্ত কোরো না। চায়ের নাম শুনলে ও রেগে ওঠে। মুক্তো, আমার ছোটছেলে, একবার চা খেতে চেয়েছিল। আমি ভয়ে যাই। অশ্রু শুনলে আর রক্ষে রাখবে না, হয়তো খুনই করে ফেলবে।'

আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। 'কেন দিত্ব? চা খাওয়া খুব খারাপ বুঝি?'

'অশ্রু তাই তো বলে। ওতে নাকি পেটের রোগ হয়, মাথার ঘিলু কমে যায়। ছাত্তরদের স্মরণশক্তি নষ্ট হয়।'

অশ্রুমামাকে এতোদিন আমাদের একদম নিজেদের মতোই ভাবতাম। সেই অশ্রুমামা যে রাগ করতে পারেন, তাঁর যে বিশেষ পছন্দ-অপছন্দ আছে, তা জেনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু অশ্রুমামার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে যা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

অশ্রুমামা কেমন সরল মনে আমার সঙ্গে কাটাকুটি খেলেন, টক্কা-ফক্কা ধরেন, মাঝে মাঝে লুকোচুরিও খেলেন। কিন্তু চা আর গানের নাম শুনলেই কেমন হয়ে ওঠেন।

মুখটা কুঁচকে ওঠে, বেশ বিরক্ত হয়েছেন তা বোঝা যায়। বলেন, 'এই ঢক-ঢক করে চা খাওয়া, আর তার সঙ্গে কুঁই কুঁই করে গান ধরার জন্যেই তো জাতটার সর্বনাশ হচ্ছে। এই যে পরীক্ষায় এত ছেলে ফেল করছে, তার আর কোনো কারণ নেই। বাপ-মা ঢক-ঢক করে চা গিলছে, বাপ ছেলেকে বলছে দোকান থেকে সিগারেট কিনে আন, তারপর হয়তো সিনেমার পয়সা দিচ্ছে, পড়ার সময় রেডিও খুলে কুঁই কুঁই করে গান শুনছে। এতে যদি ছেলেপুলের সর্বনাশ না হয় তো কিসে হবে?'

আমি বয়সের তুলনায় একটু পাকাই ছিলাম, তবু অশ্রুমামার সব কথা বুঝতে পারতাম না। ওঁর মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম।

এতোদিন পরেও সে-সব দিনের কথা যে ভুলিনি, তা বুঝতে পারছি। হয়তো ভুলে যেতাম সবই, যদি এর মধ্যে মীরা মাসি না এসে পড়তেন। মীরামাসি যদি না বলতেন, 'হ্যাঁরে, তুই বেটাছেলে না মেয়েমানুষ?'

আমি বলতাম, 'বারে, আমি বয়েজ ইস্কুলে পড়ি, আমি মেয়েমানুষ হতে যাবো কোন দুঃখে?'

মীরামাসিমা তাঁর মোটা বেণীটা মাথায় জড়াতে জড়াতে বলতেন, 'তোর তো দেখি নিজের মতামত বলে কিছু নেই। তোর মামা যা বলে তাই তো বেদবাক্য বলে মেনে নিস।'

আমি বলেছি 'তা বলে কি স্বীকার করতে হবে, চা খাওরা ভাল? বাচ্চার মায়েরা চা খায় বলেই তো আজকালকার ছেলেদের ব্রেন কমে যাচ্ছে।'

মীরামাসি এবার খিল খিল করে হাসতে আরম্ভ করেছেন। আমার কানটা চেপে ধরে বলেছেন, ওরে আমার জ্যেঠামশাই এসেছেন রে! কি পাকা পাকা কথা! দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি—আজই দিদিকে সব বলে দিচ্ছি। বুড়োদের সঙ্গে দিনরাত মিশে মিশে এই দশা হয়েছে তোর। সব সময় ওখানে পড়ে থাকিস কেন? বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে বা খেলতে যেতে পারিস না?'

বেশ তো, এসব কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এই এতোদিন পরে গানের দোকানে অশ্রুমামা আর ঐ মেয়েটাকে দেখে আবার সব মনে পড়ে যাচ্ছে কেন?

অশ্রুমামা অফিস থেকে এসে জুতো খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করতেন 'মুক্তোর চিঠি এসেছে?'

দিদু ঘোমটার আড়াল দিয়ে ঘাড় নাড়তেন। তারপর একটা খাম এগিয়ে দিতেন। খাম খুলতে খুলতে অশ্রুমামা বলতেন, 'মুক্তোটা ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছে মা। চেঞ্জে রয়েছিস—কাজ নেই কম্ম নেই। পই পই করে বলে দিয়েছিলাম, হপ্তায় তিনখানা ইংরিজী চিঠি লিখবি। এসের স্টাইলে লিখবি—তাহলে ওখানকার খবরাখবরও দেওয়া হবে, আবার ইংরিজী লেখার অভ্যেসটাও হবে। তা, গত হপ্তায় তো মাত্র দুখানা লিখেছে।'

দিদু বললেন, 'হয়তো অতো লেখবার নেই।'

'তা নয় মা, ইংরিজী লিখতে গেলে যে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিতে হবে, ওই জন্যেই লিখতে ইচ্ছে করে না।'

তারপরই তিনি মুক্তোমামার চারপৃষ্ঠার ইংরিজীতে লেখা চিঠি মন দিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছেন। পড়তে পড়তেই মামা মুখটা বিরক্তিতে বাঁকালেন, 'নবাব-বাহাদুর নিশ্চয়ই ডিক্সনারিটা নিয়ে যাননি। বেড়াতে যাচ্ছেন, অম্বলের চিকিৎসা হবে গিরিডিতে, সঙ্গে আবার বই পত্তর নিয়ে যায় কে? নইলে এতো ইডিয়মের ভুল করা অসম্ভব।'

অশ্রুমামা এবার লালকালিতে সমস্ত চিঠিটা করেক্ট করলেন। তারপর দিদুকে বললেন, তোমার ছোট পুত্রের কাণ্ডটা দেখে যাও! এই রকম কয়েকটা চিঠি পেলে সায়েবরা ভয়ে এ দেশ ছেড়ে পালাবে, সুভাষ বোস গান্ধীকে কোনো চেষ্টা করতেই হবে না।'

পরের দিনই অশ্রুমামা সংশোধিত চিঠি আর একটা ডিক্সনারি রেজিস্ট্রি পার্সেলে গিরিডিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

দিদু গীতা-পড়া শেষ করে, আমাকে অনেক কথা নিবেদন করেছিলেন: 'কী করি বল? বাপ-মরা নাবালক ভাইটার জন্যে অশ্রু বিয়ে করলে না। আমাদের বাঁকুড়ার অবস্থা তো ভাল ছিল না। উনি হঠাৎ মারা গেলেন। অশ্রুর খুব পড়ার ইচ্ছে ছিল। তা হলো না। পরের বাড়িতে থেকে, টিউশনি করে অশ্রু কাজ শিখেছে। তারপর চাকরি যোগাড় করেছে। মিলটন সায়েবকে খুশী করবার জন্যে কী খাটাটাই খেটেছে। তারপর ভগবানের দয়ায় দুটো পয়সার মুখ যেমনি দেখেছে, অমনি মুক্তো আর আমাকে বাসাভাড়া করে নিয়ে এসেছে।

'ভাই-এর শরীর ভাল নয়—পেট-রোগা। সেই জন্য

অশ্রুর চিন্তার শেষ নেই। তার উপর বিলিতী কলেজে পড়াচ্ছে—মাস্টার রেখেছে। রোজ দেড় সের করে দুধ লাগে ওর জন্যে। ভাই-এর খরচের পাছে কোনো অসুবিধে হয় ভেবে অশ্রু বিয়েই করলে না। অশ্রু বলে, "আমার ভাইকে মা আমি ওই চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে মানুষ করতে পারবো না। খাঁটি বটের আঠার মতো দুধ দু'সের আড়াই সের রোজ না খেলে বুদ্ধি খুলবে কেন?" তারপর জামাকাপড় আছে, ইস্কুল কলেজ, মাস্টারের মাইনে আছে।'

দিদু বললেন, 'পেটে ধরেছি বটে, কিন্তু অশ্রুকে আমার ভয় লাগে; একবার রাগলে আর রক্ষে নেই। আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, ততদিন খেটে মরবো। তারপর এদের যে কী হবে কে জানে। মুক্তোটাকে তো প্রায়ই বলি, তাড়াতাড়ি লেখাপড়াটা সেরে নে। অন্ততঃ তোর বিয়ে দিয়ে একটু ঝাড়া-হাত-পা হই।'

অশ্রুমামা নিজের সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করতেন না। কিন্তু ভাই সম্বন্ধে বলতেন, 'মুক্তোটা যদি ইংরিজীটা ভাল করে শিখতে পারে, তাহলে ধার দেনা করে একবার বিলেত পাঠিয়ে দেবো। বিলেত না যেতে পারলে এই কলম-পেষা জাতের উন্নতি নেই। ইংরিজীটা আর কিছু নয়—শুধু গুড মেমরি—ভাল ভাল ফ্রেজ-ইডিয়ম মনে রাখবার শক্তি। সেই জন্যেই তো ঘি খাওয়া দরকার—খাঁটি ভাতুয়া ঘি ছাড়া তাই বাড়িতে কিচ্ছু ঢুকতে দিই না।'

অশ্রুমামার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও ধারণা হয়ে গিয়েছিল, শরীর এবং মগজ ঠিক রাখতে হলে ঘানির তেল, ভাতুয়া ঘি, পুকুরের মাছ, বরজের পটল, ঢেঁকিছাঁটা চাল, গমভাঙা আটা এইসব খেতে হবে। দুধের জন্যে হিন্দুস্থানী গয়লার উপর ভরসা করে বসে থাকলে চলবে না—

সকালবেলায় বালতি নিয়ে খাটালে যেতে হবে। দুধ দুইবার সময় কড়া নজর রাখতে হবে।

আর এই সব খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে চাই নিত্য গঙ্গাস্নান। গঙ্গার জলে যে অনেক মেডিসিন আছে, তা নাকি আজকাল সায়েবরাও স্বীকার করছে। আর সেই সঙ্গে ট্রাম-বাসকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখতে হবে।

'দিনকাল খুবই খারাপ। আগে পায়খানা বসতে লোকে তিন মাইল দূরে যেতো, আর এখন এক পা হাঁটবে না। ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়ে বসবে।' অশ্রুমামা বলতেন, 'ভেরি ভেরি ব্যাড হ্যাবিট। হাঁটবে, খাবে, খেলা দেখবে। চা খাওয়া, কুঁই কুঁই করে গান গাওয়া, সিনেমা দেখা এ-সব বকাটে ছেলের লক্ষণ। আর যারা বিড়ি ফোঁকে তারা দুদিন পরে পকেটমার হবে, না হয় কারখানায় লোহা পিটবে।'

অশ্রুমামার প্রতিটি কথা আমার কাছে বেদবাক্য ছিল। আমি চায়ের নাম শুনলে পর্যন্ত আঁতকে উঠতাম। আমাদের কাছাকাছি কয়েকটা বাড়িতে অশ্রুমামার ভয়ে কেউ কখনও ভুলেও গান গাইত না।

আমাদের সবারই এক বাড়িওয়ালা। তিনি মামাকে খুব খাতির করতেন; বলতেন, 'অশ্রুবাবু, এই পাড়াটাকে ভদ্দর-লোকের পাড়া করে তুলতে হবে। আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন নতুন ভাড়াটে আনবো না। যে ভাড়াটে আপনার কাজে বাধা দেবে, তাকে দূর করে দেবো। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।'

অশ্রুমামা বলতেন, 'মোড়ের ওই চায়ের দোকানটা দূর করে দিন। শুঁড়িখানা আর চায়ের দোকানের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। আর এও আপনাকে বলে রাখলাম, আমাদের দেশের মেয়েরা যদি চা খাওয়া না ছাড়ে, তাহলে তাদের সন্তান ভাল

হবে না। হতে পারে না, একটা অঙ্কের মতো। আপনিই ভাবুন না অনাদিবাবু, পেটে বাচ্চা রয়েছে, আর সেই সময় সেখানে ঢকঢক করে গরম চা পড়ছে। জিনিসটা এমন বিষাক্ত যে জামায় পড়লে দাগ ওঠে না, কোনোদিন চায়ের কেটলির ভিতরটা দেখেছেন আপনি? পেটের ভিতরটাও তো অমনি হচ্ছে।'

অনাদিবাবু বলতেন, 'যা বলেছেন। ওই জন্যেই বোধহয় আমার বৌমার সন্তানটি বাঁচলো না। আর আজকালকার মেয়েরা যা হয়েছে, পাঁচমিনিট চা খেতে দেরি হলে নাকি শরীর খারাপ হয়! ভগবান জানেন। আপনি শিক্ষিত লোক, দেখুন যদি দেশের মতিগতি ফেরাতে পারেন।'

এইভাবেই চলতো। এই বিশ্বাস বুকে করেই আমি হয়তো বড়ো হয়ে উঠতাম। কিন্তু ঈশ্বরের নিশ্চয় সে-পরিকল্পনা ছিল না। অশ্রুমামাকে বৃহত্তর পরীক্ষার মধ্যে ফেলবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। নইলে অশ্রুমামার বাড়ির দোতলার পুরনো ভাড়াটেরা চলে যাবে কেন, আর তার বদলে মীরামাসিরাই বা ভাড়াটে হয়ে আসবে কেন?

মীরামাসিদের সংসার ছোট। বাবা, মা আর তাঁদের একমাত্র সন্তান মীরামাসি।

কেন জানি না, মীরামাসিকে প্রথম দিন থেকেই ভাল লেগে গিয়েছিল। মীরামাসির দীর্ঘ সুগঠিত দেহটাকে এতোদিন পরেও বেশ স্পষ্ট মনে করতে পারছি। মীরামাসির প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বেণীটা যেন আমার চোখের সামনে এখনও দুলছে।

মীরামাসিমা গৌরী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর শ্যামবর্ণের মধ্যেও এক আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য ছিল। আর চোখদুটো মীরা-মাসিমার যে কি দিয়ে তৈরি হয়েছিল! সর্বদা যেন কথা

কইছে। যেন দুটো বেশী পাওয়ারের লাইট চোখের মধ্যে ফিট করা রয়েছে, যা দিয়ে তিনি যে কোন লোকের ভিতরটা দেখে নিতে পারেন।

মীরামাসিমার বেপরোয়া প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি যেন ঐ চুলের বেণীটা, যা কাউকে কেয়ার করে না। মীরামাসির শাড়ি-ব্লাউজের মধ্যেও যেন ওই মধুর ঔদ্ধত্যের ছাপ ছিল। আর মীরামাসির দাঁত—যেন দুসেট শ্বেতপাথরের অলঙ্কার। এমন নিখুঁত দাঁত যে, কখন মীরামাসি কথা বলবেন এবং দাঁতগুলো দেখতে পাবো, তার অপেক্ষা করতাম।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেই বসেছিলাম, 'মীরামাসি তোমার দাঁতগুলো এমন সুন্দর হলো কী করে?'

মীরামাসি প্রথমে একটু রেগে গিয়েছিলেন। 'তুই নিজে থেকে জিজ্ঞেস করছিস, না কেউ তোকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে?'

আমি অস্বস্তিতে পড়েছি, তবু বলেছি, 'না, আমার মাথায় এল, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

মীরামাসি বললেন, 'আমি খুব চালাক মেয়ে—ছোটবেলায় একটা করে দাঁত পড়েছে আর সেটা নিজে হাতে ইঁদুরের গর্তে দিয়ে এসেছি। ভাল দাঁত না হলে সব ইঁদুরের বারোটা বাজিয়ে ছাড়তাম না। একটা দাঁত শুধু গর্তে দিইনি, সেটাই খারাপ হয়েছে।'

'কোন্‌টা মাসি?'

মীরামাসি বললেন, 'ভাগ্যি সেটা মাড়ির দাঁত, বাইরে থেকে দেখা যায় না!'

'ওটা ইঁদুরের গর্তে দিলে না কেন?'

মীরামাসি আমার কানটা ধরে বললেন, 'দূর বোকা, দেবো কী করে? আমরা তখন ট্রেনে করে যাচ্ছি—বাবা লক্ষ্ণৌ

থেকে ট্রান্সফার হয়ে এলাহাবাদ চলেছেন। তখন কোথায় ইঁদুরের গর্ত পাবো ? তাই রেলের ধারেই ফেলে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যদি কাছাকাছি কোনো ইঁদুরে টেনে নিয়ে যায়। তা, ওখানকার পাজী ইঁদুরগুলো যে আমাকে ডুবিয়েছে তা নতুন দাঁতটা দেখেই বুঝেছি।'

মীরামাসিমারা যখন প্রথম এলেন, আমার তখনই আলাপ করবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু লজ্জা লাগছিল।

কিছুদিন পরের কথা। আমি সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরে ছাদে বসে গল্পের বই পড়ছিলাম। মীরামাসি যে কখন ওঁদের ছাদে উঠে এসে আমাকে দেখেছিলেন বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ শুনলাম, 'এই খোকা, কী বই পড়ছো ?'

চোখ তুলে তাঁকে দেখেই বললাম, '"শয়তানের সাথে পাঞ্জা", আজকে শেষ করতেই হবে।'

'খুব ভাল বই বুঝি ?'

বইএর থেকে চোখ না তুলেই বললাম, 'দুর্দান্ত দস্যু গোমেশ এখন রবীন রায়কে বন্দী করে ফেলেছে। আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো।'

মীরামাসি মিষ্টি হেসে, আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে ছাদে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যে আমার দিকে নজর রাখছিলেন তা বুঝিনি। বইটা পড়া শেষ করে যেমন উঠেছি তিনি বললেন, 'শেষ পর্যন্ত কী হলো ?'

'সবই ভাল, রবীন রায় গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। কিন্তু গোমেশকে পুলিস ধরতে পারলে না। সে চারতলা থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালাল।'

মীরামাসি বললেন, 'তাহলে কী হবে ?'

আমি বললাম, 'আর একখানা বই জোগাড় করতে হবে। এই যে লেখা রয়েছে—গুণ্ডা গোমেশের পরবর্তী কাহিনী—

"গোমেশের কীর্তি"। রবীন রায়কে ফাঁকি দিয়ে ক'দিন চালাবে? ওখানে নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবে।'

মীরামাসি হঠাৎ বললেন, 'লোফালুফি খেলতে পারো?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়।'

'দেখি কেমন ধরতে পারো', বলে ছাদ থেকে আমার দিকে কী একটা ছুঁড়ে দিলেন। লুফে নিয়ে দেখি চকোলেট। আমি আবার ছুঁড়ে ফেরত দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মীরামাসি শুনলেন না, বললেন, 'ফেরত দিলে ভাল হবে না বলছি।'

চকোলেট খেতে খেতেই আলাপ হয়ে গেল। মীরামাসি বললেন, 'আমি ভাই তোমার মতো পুঁচকে ছেলেকে 'তুমি' বলতে পারবো না। 'তুই' বললে রাগ করবি না তো?'

চকোলেট দিয়ে মীরামাসি ততক্ষণে আমাকে জয় করে নিয়েছেন। বললাম, 'আপনার যা খুশি বলবেন। অশ্রুমামা আমাকে স্যাংকে সায়েব বলে ডাকেন।'

মাসি যেন একটু রেগে উঠলেন। 'কী? সায়েব? ছিঃ, আমি পারবো না। সায়েবরা আমার দু'চোখের বিষ। সাহেবরাই তো আমাদের যত দুঃখের কারণ। তোকে আমি শংকর বলেই ডাকবো।'

এর পরে মাসিকে আমি 'শয়তানের সাথে পাঞ্জা' পড়তে দিয়েছি। মাসি বলেছে, 'একটাও বই নেই, সব পড়া হয়ে গিয়েছে। তুই আমাকে বাঁচালি।'

কয়েকদিন পরে ছাদে উঠে মাসিকে আর একটা বই পড়তে দিয়েছি। মাসি সেদিন আবার খোঁপায় ফুল গুঁজেছিলেন। সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে।

মাসি বললেন, 'লুফে নে দেখি', বলে একটা কড়াপাকের সন্দেশ আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু আমি ক্যাচ ধরতে পারলাম না, সন্দেশটা নোংরার উপর গিয়ে পড়লো।

মীরামাসি একটু রেগে গেলেন। বললেন, "তুই কোনো কম্মের নয়।' মীরামাসির হাতে আর একটা মাত্র সন্দেশ ছিল। বললেন, 'ধর', আমি বললাম, 'তা হয় না মাসি, ওটা আপনাকে খেতেই হবে।'

'বেশী পাকামো করিস নে,' বলে মীরামাসি সেটা আমাকে পাচার করে দিলেন। কোনো ওজর আপত্তি চললো না, সন্দেশটা খেতেই হল।

আমি বললাম, 'আপনার সন্দেশ এই ভাবে আমাকে দিয়ে দেন কেন? আপনার বাবা জানতে পারলে বকবেন।'

মীরামাসি আদুরে মেয়ের মতো বেণী নাচিয়ে বললেন, 'ইস্! বকে দেখুক না একবার।' ছাদের আলসের কাছে এগিয়ে এসে বেশ জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করলেন, 'আমার বাপি আমাকে ভয় করে। আমিই তো বাপিকে বকি।'

আমি অবাক হয়ে গিয়েছি—আমার বাবার সঙ্গে মীরা-মাসির বাপির কোনো মিলই নেই। কিন্তু পৃথিবীতে সবই যখন সম্ভব, তখন এটাও যে হতে পারে ধরে নিয়েছি।

বাপির ওপর মীরামাসির আধিপত্যের কারণটাও তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি---'আমি বাপির একমাত্র মেয়ে কিনা—তাই বাপি এবং মা-মণি দু'জনেই আমাকে খু-উ-ব ভালবাসে।'

আমাদের দু'জনের খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন বিকেল বেলা সেই যে ছাদে গিয়ে উঠতাম, নামতাম সূর্য অস্ত যাবার পর। পাড়ায় পাড়ায় তখন শাঁখের শব্দ উঠতো, তার সঙ্গে উনুনের আঁচের ধোঁয়া রাত্রির কাজটা আরও সহজ করে দিত।

মীরামাসি বলতেন, 'তুই এবার পড়্‌গে যা। আমি আরও একটু দাঁড়িয়ে থাকবো। আকাশে তারা-ওঠা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।'

মনে মনে মীরামাসিকে হিংসে করেছি। সুদূর আকাশের তারাদের দেখতে আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় নেই—মা এখনই কান ধরে নীচেয় নামিয়ে নিয়ে যাবে।

যাবার আগে মীরামাসি বলেছেন, 'কাল আবার আসিস।'

'কাল বোধহয় আসতে পারবো না। অশ্রুমামার সঙ্গে গল্প করতে হবে।'

বিরক্ত ও চিন্তিত হয়ে উঠেছেন মীরামাসি—'তুই ছোট ছেলে, ছোটর মতো থাকবি! বুড়োদের সঙ্গে দিনরাত পড়ে থাকিস কেন?'

'বা-রে, দিনরাত কই? ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে সূর্য ওঠার আগে অশ্রুমামার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে যাই। তারপর বিকেলবেলায় অশ্রুমামার কাছে স্টেট্‌সম্যানের খেলার খবর শুনি। রাত্রে পড়াশোনা হয়ে গেলে মামার কাছে এসে এক ঘণ্টা টক্কা-ফক্কা খেলি। রোববারে সকালে মামার সঙ্গে বাজার করতে যাই, তারপর গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকি। একটার সময় বাড়ি ফিরে, ভাত খেয়ে আবার মামার কাছে এসে বসি। মামা বইতে মলাট দিয়ে দেন; দরকার হলে জুতো রঙ করে দেন। তারপর অশ্রুমামার সঙ্গে একটু ইংরেজীতে কথা বলি। আমি হই মিলটন সায়েব; অশ্রুমামা অশ্‌রু মিট্রা। এই তো।'

মীরামাসি বললেন, 'বলিহারি যাই তোকে। ওইভাবে মিশলে তুইও কিছুদিনের মধ্যে পাকা বুড়োটি হয়ে যাবি।'

দিদিমা তখন বিড় বিড় করে পড়ছিলেন 'দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়।'

দিহুর উপর চড়াও হয়ে আমি সোজা জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম, 'বুড়োদের সঙ্গে মিশলে আমিও বুঝি বুড়ো হয়ে যাবো দিহু?'

আমার প্রশ্ন শুনে দিহু একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। 'কে বলেছে তোমাকে? এতটুকু ছেলের মাথায় তো এসব কথা ঢোকবার কথা নয়। কেউ বুঝি আমাদের সঙ্গে তোমাকে মিশতে বারণ করেছে?'

ভয় পেয়ে আমি বলেছি, 'কেউ বলেনি। এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

'উহুঁ! কেউ বলেছে নিশ্চয়। কে বলেছে তাও আন্দাজ করছি', বলে দিদিমা এবার উপরের দিকে আঙুলটা দেখিয়ে দিলেন। 'মেয়েটা যেন কেমনতর! ভাবভঙ্গীর কিছুই বুঝি না। অথচ অশ্রুর যে কী রাগ তা তো জানে না। কোন্ দিন না আবার কেলেঙ্কারি বেধে যায়।'

গীতার পোঁটলাটা কুলঙ্গিতে তুলতে তুলতে দিহু বললেন, 'তুমি ভাই ওপরের ওই মেয়েছানার সঙ্গে বেশী মিশো না। মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশলে বেটাছেলে মেনিমুখো হয়ে যায়। তুমি অশ্রুর সঙ্গে গল্প করবে। সে তোমাকে কত ভালবাসে। আপিস থেকে এসে স্যাংকে সায়েবকে না দেখলে ছটফট করে। যখন অশ্রুকে পাবে না, তখন মুক্তোর সঙ্গে গল্প কোরো তুমি।'

মুক্তোমামা তখন কিছুদিন হলো গিরিডি থেকে ফিরেছেন। মুক্তোমামাকে দেখলে কেউ তাঁকে অশ্রুমামার ভাই বলবে না। অশ্রুমামার তুলনায় মুক্তোমামা অনেক সুন্দর। তাঁর রঙটা দিহুর মতোই খুব ফর্সা। মাথার চুলগুলোও কোঁকড়া। মুক্তোমামার নাকটাও কেমন টিকালো—অশ্রুমামার মত থ্যাবড়া নয়। কিন্তু একটু রোগা, এই যা।

অশ্রুমামা নাকি আগে দিহুকে বলতেন, 'আমি বোধহয়

তোমার ছেলে নয়। কেউ বোধহয় হাসপাতালে তোমার আসল ছেলেকে চুরি করে আমাকে রেখে গিয়েছিল।' অশ্রুমামা হবার বেলায় কেস শক্ত ছিল, দিহুকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

মুক্তোমামা বলতেন, 'আমি নিশ্চয় তোমার ছেলে—আমি তো বাড়িতে হয়েছিলাম।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দিহু এবার চমকে উঠলেন। 'ও মুক্তো, তোর কলেজের যে দেরি হয়ে গেল।'

মুক্তোমামা তখন তক্তপোষে শুয়েছিলেন। দিহুর কথা যেন তাঁর কানেই গেল না। তারপর আড়ামোড়া ভেঙে বললেন, 'আজ আর কলেজ যেতে ভাল লাগছে না মা।'

দিহু গোবেচারা মানুষ। মুক্তোর পরে তাঁর আরও দুটো ছেলে হয়েছিল, বাঁচেনি। মুক্তোকে কিছু বলতে ভয় পান তিনি। বললেন, 'সেকি রে? অশ্রু শুনলে রসাতল করবে।'

'দাদা আর জানছে কী করে মা! তুমি যদি না বলো।' মুক্তোমামা এবার দিহুর গলাটা জড়িয়ে আদর করতে লাগলেন।

কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে দিয়ে দিহু বললেন, 'শরীরটা ভাল লাগছে না বুঝি? অশ্রু তোর জন্যে এতো করছে—দেড় সের করে দুধ, একছটাক করে মাখন, দুটো হাফ বয়েল ডিম, চারটে করে কলা, রোজ পুকুরের বাটা মাছের ঝোল, পেঁপে-সেদ্ধ, বিট, গাজর, কাজুবাদাম, ডাবের জল, বেলের মোরব্বা খাওয়াচ্ছে—তবুও সেই হাড়-জিরজিরে রয়ে গেলি।'

মুক্তোমামা আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে হাই তুললেন। 'তুমি আবার যেন কর্তার কাছে বলে বোসো না। শুনলেই হয়তো সেই সায়েব-ডাক্তারটার কাছে আবার পাঠিয়ে ছাড়বে। সে বেটাচ্ছেলের নাম ডক্টর হ্যানসেন, সেবারে যা

ভুগিয়েছে। ব্যাটার একটা কথা আমি বুঝতে পারি না; বললাম মাথা ধরে—সে বুঝলে আমার পিলে বেড়েছে।'

'সায়েব ডাক্তারের কাছে যে পাঠায়, সে তোর ভালর জন্যেই', দিদিমা বললেন।

'রক্ষে করো বাবা—ওরা মিলটন সায়েবের বৌ-এর চিকিৎসা করতে পারে। ভেতো বাঙালীর ধাতের বুঝবে কী? আমার জানটা কয়লা করে ছেড়ে দিয়েছিল। আবার যদি জল্লাদটার পাল্লায় পড়ি, তাহলে আমাকে বিবাগী হয়ে চলে যেতে হবে বলে রাখছি মা।'

দিদু বেশ ভয় পেয়ে গেলেন, কারণ তাঁর হাত দেখে এক পাঞ্জাবী গণকঠাকুর বলেছিল—ছোটছেলেটি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে। 'আমি কিচ্ছু বলছি না বাপু। কিন্তু পরে যদি অশ্রু শোনে তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল অথচ আমি তাকে বলিনি, তাহলে আমার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধাবে।'

মুক্তোমামা ততক্ষণে নাক-ডাকিয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করেছেন। মুক্তোমামা দিদুকে মোটেই তোয়াক্কা করেন না। কিন্তু অশ্রুমামাকে দেখলেই ভয়ে কাঠ হয়ে থাকেন। তখন মুখে বই গুঁজে বসে থাকতে হয়।

তিনটের পরে দিদু মুক্তোমামাকে ডেকে দেন। 'ও মুক্তো, ওঠ রে, আর ঘুমোলে চোখ ফুলে উঠবে—অশ্রু দেখলেই ধরে ফেলবে। মিছরি ভেজানো আছে, জলটা খেয়ে খপরের কাগজটা পড়ে ফেল। আপিস থেকে ফিরে অশ্রু আবার বকবে।'

বিরক্তভাবে মুক্তোমামা বললেন, 'এ-এক মহা-ঝামেলা হলো দেখছি। দাদার ঠেলাতেই প্রাণ যায়, তার উপর তোমার খবরদারি আর সহ্য হয় না! আমি উপর থেকে বাংলা আনন্দবাজারখানা এনে পড়ে নিচ্ছি।'

'সে কী রে? পয়সা দিয়ে তোর জন্যেই না অশ্রু স্টেসম্যান নিচ্ছে?'

"ওতে শুধু সায়েবদের খবর মা। আর কিস্‌সু থাকে না। আর কী দাঁতভাঙা ইংরিজী—একটা খবর পড়ে মানে বুঝতে বুঝতেই মাথা ধরে যায়,' মুখ কুঁচকে মুক্তোমামা নিবেদন করলেন।

মুক্তোমামা আমাকে বললেন, 'যা তো লক্ষ্মীটি, ওপর থেকে বাংলা কাগজটা নিয়ে আয় তো।'

ওপরে তখন মীরামাসির মা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অন্য একটা ঘরে পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ে দেখি মীরামাসি এলোচুলে ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে আনন্দবাজার পড়ছেন আর মাঝে মাঝে পা দোলাচ্ছেন। পা দোলানোর উদ্দেশ্য ঘুম তাড়ানো। দুপুরে ঘুমোলে ওজন বেড়ে যায়, মীরামাসির বিশ্বাস। আর মোটা হতে চান না তিনি। এই আধশোয়া অবস্থাতে মীরামাসিকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমাকে এমন সময় দেখে মীরামাসি একটু অবাক হয়ে গেলেন।

'ইস্কুল যাসনি তুই?'

'আজ যে ছুটি, দুর্লভবাবু স্যর মারা গিয়েছেন!'

শুনে মীরামাসির মনটা খারাপ হয়ে গেল। দুর্লভবাবু স্যরকে তিনি চেনেন না, জানেন না। তবু দেখলাম মীরামাসির চোখ ছল ছল করছে। বললেন, 'আহা রে! ভগবানটা পাজি আছে। মানুষকে কেন মারেন বল তো?'

আমি বললাম, 'ভগবানের নিজের মা-বাবা মরলে তবে বুঝবে অন্য লোকের কত কষ্ট হয়।'

ইজি-চেয়ারের হাতলটা দেখিয়ে দিয়ে মীরামাসি বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এখানে বোস।'

'বসলে চলবে না। কাগজটা দিন, মুক্তোমামা পড়বে।'

'ওঁদের তো ইংরিজী কাগজ আছে।'

'সে তো আছে। আগে বাংলা কাগজটা পড়ে মানে-টানে বুঝে নিয়ে তারপর মুক্তোমামা স্টেট্‌স্‌ম্যান পড়বে। তখন অশ্রুমামা যা কোশ্চেন করবে, মুক্তোমামা সটাসট বলে দেবে।'

মীরামাসি ওঁর বড় বড় চোখদুটো ঘুরিয়ে একটু যেন অবাক হয়ে গেলেন। 'খবরের কাগজের আবার পরীক্ষা! বেশ মজা তো! আচ্ছা, আজ থেকে বাপিকেও আমি পরীক্ষা করবো। না বলতে পারলে, এমন বকবো যে বাপি কেঁদে ফেলবে।'

আমার হাতে কাগজটা দিয়ে মীরামাসি বললেন, 'যদি পারিস, আমাকে ইংরিজী কাগজটা একটু দিয়ে যা।'

নীচে কাগজটা মুক্তোমামার হাতে দিয়ে বললাম, 'ইংরিজী কাগজটা একটু চাইছেন।'

দিদু বললেন, 'মীরার বাপ আজকে আপিস যান্‌ নি বুঝি ?'

'মীরামাসি নিজেই চাইছে', আমি উত্তর দিলাম।

'কী জানি বাপু! রকম সকম দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। মেয়েছানা আবার সায়েবদের লেখা কী বুঝবে ?'

মীরামাসির ঘরে আবার কাগজটা পৌঁছে দিয়েছি। ঘরের মধ্যেটা আগে ভাল করে দেখিনি। মাসির কত ছবি দেয়ালে টাঙানো রয়েছে। মাসি বললেন, 'প্রতিবছর জন্মদিনে বাবা আমার ছবি তোলায়। এই যে দেখছিস—গামলায় আমি চান করছি—এই আমার প্রথম ছবি। এটা আমার মোটেই ভাল লাগে না—কিন্তু বাপি এটা খুব পছন্দ করে, তাই বাঁধিয়ে রেখেছে।'

আমি মীরামাসির মুখের দিকে তাকালাম। মীরামাসি বললেন, 'সবচেয়ে মজার ব্যাপার, বাপির অ্যালবামে আমার মায়ের ঠিক এই ছোটবেলার গামলায় চান করবার ছবি আছে।

মামার বাড়ি থেকে বাপি নিয়ে এসেছিল। বাপিটা না খুব অসভ্য। বাপি কি বলে জানিস ?'

'কী বলে ?'

'বাপি বলে, আমার যখন বিয়ের পর বাচ্চা হবে, তখন এই রকম একটা ছবি তোলাবে—আর তিনটেকে একসঙ্গে এনলার্জ করে বাঁধিয়ে রাখবে।'

মীরামাসির ঘরে একটা আলমারিতে অনেক বইও রয়েছে। 'এতো বই কোথা থেকে পেলে ?' মাসিকে প্রশ্ন করলাম।

'বাপি কিনে দেয়। প্রত্যেকবার পুজোর আগে দোকানে যাই—যত ইচ্ছে বই কিনি। বিশেষ করে শিব্রাম চকরবরতির কোনো বই বাদ দিই না। তার ওপর শিশুসাথী, মৌচাকের গ্রাহক ছিলাম। সব বাঁধিয়ে রেখেছি। এখন আবার ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, দেশ কিনি। তুই এখন 'ঘনশ্যামের ঘোড়া', 'হাওড়া-আমতা রেল দুর্ঘটনা', কিংবা মৌচাক পড়তে পারিস। বড় হয়ে বসুমতী, দেশ পড়বি।'

এবার আমি চলে আসতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মীরামাসি জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'টা বাজে রে ?

'চারটে প্রায়।'

মীরামাসি এবার সোজা হয়ে বসলেন। 'তাহলে একটু দাঁড়া না ? চা খেয়ে যাবি।'

আমি শুনেই চমকে উঠেছি। পায়ের গোড়ায় বোমা ফাটলেও এর থেকে ভয় পেতাম না। আমার মুখটা বোধহয় ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল এবং তা লক্ষ্য করেই মীরামাসি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো তোর ?'

যেন আমার অপাপবিদ্ধ চরিত্রের উপর মীরামাসি কলঙ্ক-লেপনের অপচেষ্টা করেছিলেন; আমার সাদা ধোপভাঙা জামাকাপড়ের উপর কোনো গাড়ি যেন কাদা ছিটিয়ে দিতে

যাচ্ছিল—কোনোক্রমে রক্ষা পেয়ে গিয়েছি। একটু বিরক্ত-ভাবেই বললাম, 'আর কখনও অমন কথা বলবেন না। যদি অশ্রুমামার কানে কথাটা যায়, তাহলে কী অবস্থাটা যে হবে!'

এতোদিন পরেও, গ্রামোফোন কোম্পানির দোকানে দাঁড়িয়ে, মীরামাসির সেদিনকার বিস্মিত মুখটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার উপর তিনি রাগ করতে পারতেন—কিন্তু সমস্ত রাগ ও অবজ্ঞাটা যেন অশ্রুমামার উপর গিয়েই পড়লো। আমি বোধহয় অজ্ঞাতে তাঁর মনে আঘাতও দিয়েছি। আমি চলে আসতে যাচ্ছিলাম। বললেন, 'এই শোন।'

'বলুন।'

'তুই তো ইস্কুলে পড়িস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এটা কোন্ শতাব্দী?'

'এটা তো বিংশ শতাব্দী। সবাই জানে।'

'না, সবাই সেটা জানে না। ওটা সব সময় মনে রাখবার চেষ্টা করিস।'

কোনো উত্তর না দিয়ে আমি বেরিয়ে এসেছি। ব্যাপারটা সেদিন যদি এইখানেই শেষ হতো তা হলে মন্দ হতো না। কিন্তু তা হবার নয়।

অশ্রুমামা সেদিন অফিস থেকে এসে মুক্তোমামাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কলেজ থেকে কখন এলি?'

দিদিমাই উত্তর দিলেন। 'ওদের এক প্রফেসরের শরীর খারাপ—আসেনি বলে আজ একটু সকাল সকাল ফিরেছে।'

'নিশ্চয় বাঙালী প্রফেসর। এই আমাদের জাতের দোষ। সায়েব হলে কিছুতেই কামাই করতো না। চা-খেকো, পিলে-ফোলা বাঙালি তো! হয়তো শরীরটা একটু ম্যাজম্যাজ করেছে, কিংবা মাথা ধরেছে, দাও কামাই করে।'

আমি দেখলুম মুক্তোমামা ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছেন।

তারপরেই অশ্রুমামার নজর একটা ভয়াবহ জিনিসে পড়লো। 'মা, বাংলা কাগজ কোত্থেকে এল? মুক্তো এনেছে বুঝি?'

অমন যে দিদিমা, তাঁর মুখটাও নীল হয়ে উঠলো। আমারও গা-টা যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। কাগজটা পাল্টানো হয়নি। কিন্তু দিদিমা সামলে উঠলেন। 'ও, কাগজটা এখনও পড়ে রয়েছে বুঝি? আমিই চেয়ে এনেছি—একাদশী কবে দেখবো বলে। তোদের ইংরিজী কাগজে তো ও-সব বাপু থাকে না।'

কাগজটা মুড়ে দিহু আমার হাতে দিলেন এবং ছুটে গিয়ে আমি পাল্টাপাল্টি করে স্টেট্‌স্‌ম্যান ফেরত আনলাম। কিন্তু তখনও যে বিপদ বাকি ছিল তা জানতাম না। গা হাত-পা ধুয়ে দুধ-মুড়ি খেয়ে, কাগজটা পড়তে গিয়েই ব্যাপারটা ধরা পড়লো—ভিতরের একটা পাতা থেকে ব্লেড দিয়ে কিছুটা অংশ কেউ কেটে নিয়েছে। অশ্রুমামা বিরক্তভাবে বললেন, 'মা, এমনভাবে কাগজটা কাটলে কে? কেউ কি ওটা নিয়ে গিয়েছিল?'

আমার নিজেরই তখন মাথাটা ঘুরছে। মুক্তোমামার অবস্থা কী হবে ভেবে আমি ঘেমে উঠলাম। মুক্তোমামার চোখ দুটো তখন যেন ভয়ে বেরিয়ে আসছে। উপস্থিতবুদ্ধির দেবী কে জানি না, কিন্তু তিনি সেই মুহূর্তে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে চরম বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। বললাম, 'আমি নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'ছবি ছিল বুঝি? তা, খবরের কাগজের ছবি কেটে কেটে একটা অ্যালবাম করতে পারো। তবে সঙ্গে সঙ্গে কেটো না—ইচ্ছে হলে একদিনের পুরনো কাগজ কেটো।' অশ্রুমামার এই মন্তব্য শুনে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মুক্তোমামার দিকে মুখ ফিরিয়ে অশ্রুমামা বললেন—'স্টেট্স্‌ম্যানের এডিটোরিয়ালটা পড়েছিস?'

মুক্তোমামা চুপ করে বসে রইলেন!

'কাগজটা বুঝি স্যাংকে সায়েব সারাদিন নিয়ে রেখেছিল? তা ঠিক আছে, এখনি পড়ে ফেল।'

মুক্তোমামা গম্ভীর হয়ে এডিটোরিয়াল পড়তে আরম্ভ করলেন।

অশ্রুমামা বললেন, 'ডিক্সনারিটি কোথায় গেল। কতবার বলেছি না, সবসময় ডিক্সনারি আর পেন্সিল নিয়ে পড়বি। যে-কথাটার মানে সন্দেহ হবে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা অক্সফোর্ড, চেম্বার্স কিংবা ওয়েবস্টার থেকে দেখে নিয়ে কাগজের মার্জিনে মানেটা লিখে ফেলবি। তাহলে আর কখনো ভুল হবে না। তেমন দরকার হলে, নিজের ফ্রেজ-ডাইরিতে লিখে নিতে হবে। ইডিয়াম হলে—ইডিয়াম-ডাইরিতে।'

মুক্তোমামা ঘাড় গুঁজে তিনখানা ডিক্সনারি এবং নিজের ফ্রেজ ও ইডিয়মের চামড়া-বাঁধানো ডাইরি, পেন্সিল ও কলম নিয়ে স্টেট্স্‌ম্যানের এডিটোরিয়াল পড়তে শুরু করলেন।

মীরামাসির উপর খুব রেগে গিয়েছিলাম। কাগজটা যে ওইভাবে কেটে তিনি আমাদের বিপদে ফেলবেন, তা কল্পনা করিনি।

মীরামাসি তখন ছাদে বেড়াতে গিয়েছেন, মাথায় আবার রজনীগন্ধার মালা জড়িয়েছেন মীরামাসি। আমাকে দেখেই বললেন, 'কী সুন্দর ফুল দেখ! আমি তো খুব ফুল ভালবাসি, তাই বাপি রোজ আমার জন্যে ফুল কিনে আনে।'

আমি উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে রইলাম। মীরামাসি বললেন, 'কীরে চুপ করে আছিস কেন?'

বললাম, 'আপনার জন্যে মুক্তোমামার যা হেনস্তা হচ্ছিল।

অশ্রুমামাকে তো চেনেন না! যা রাগী, হয়তো কলেজে-পড়া ছেলের কানই মলে দিতেন।'

মীরামাসি এবার বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। 'কেন? কী হয়েছে?'

'আপনি ছবি কেটেছেন?'

'হ্যাঁরে, তোকে বলা হয়নি। সোমানা আপ্পারাওয়ের যা একখানা সুন্দর ছবি বেরিয়েছে, লোভ সামলাতে পারলাম না। আমি তো ফুটবলের অনেক ছবি কেটে রাখি।'

'সোমানার ছবি? তার মানে আপনি কি ইস্টবেঙ্গলের দলে?'

'হ্যাঁ। ইস্টবেঙ্গলকে সাপোর্ট করবো না তো কি ওই ল্যাদাড়ু মোহনবাগানকে করবো? তেজ কাকে বলে যদি দেখতে হয়, তাহলে ইস্টবেঙ্গল—বুঝেছিস?'

তাহলে, এবার থেকে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। বললাম, 'আপনি তাহলে শত্রুপক্ষের লোক।'

'তুই বুঝি মোহনবাগানের?

'হ্যাঁ, আমি, অশ্রুমামা, মুক্তোমামা দিদু—সবাই মোহনবাগান! কত বড় বড় লোক মোহনবাগানের সাপোর্টার। মিল্টন সায়েবও বলেছেন মোহনবাগান ভদ্র টিম।'

মীরামাসি এবার মনে বোধহয় খুব দুঃখ পেলেন। আঙুল দিয়ে ডান হাতের নোখটা কামড়াতে কামড়তে বললেন, 'এ অসম্ভব। তোর ওপর আমার অনেক আশা আছে। এ কখনই হ'তে পারে না।'

আমি বললাম, 'কী হলো?'

'তোর অশ্রুমামারা না-হয় পশ্চিমবঙ্গের ঘটি। সাম্বাজারের সসীবাবুর সঙ্গে সসা খেতে খেতে ওঁরা না-হয় মোহনবামের

হয়ে চিৎকার করতে পারেন। কিন্তু তুই? তোর বাড়ি না যশোর? তোর দুই বোনের না খুলনায় এবং ময়মনসিং-এ বিয়ে হয়েছে? তুই কী বলে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিস?

আমি এই ধরনের অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম, 'মোহনবাগান কত ভদ্র, পেনাল্টিতে গোল দেয় না।'

কিন্তু মীরামাসি নিজের মনেই বললেন, 'তোর আর দোষ কী? লোকে যা মাথায় ঢোকাবে, তাই তো বুঝবি। তোর আর বয়স কত।'

মীরামাসির ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কোন সম্মোহনী শক্তি আছে যা আমাকে অবশ করে দেয়। আমি যেন প্রতিবাদের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলি। ইচ্ছে থাকলেও তাঁকে দুচার কথা শোনাবার সামর্থ্য থাকে না।

মীরামাসি বললেন, 'তোর মুক্তোমামাকে বলিস আমি খুব দুঃখিত। এ-নিয়ে কথা উঠবে জানলে আমি কাগজ কাটতাম না। যদি তেমন অসুবিধে হয় তাহলে বাপিকে দিয়ে একটা কাগজ কিনিয়ে এনে দিতে পারি।'

'অসুবিধে হবে না, অশ্রুমামাকে বলেছি আমি কেটেছি।'

'তাই বুঝি? ওমা, কী ভাল ছেলে রে!' মীরামাসি অভিভূত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে আমিও মীরামাসির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

মীরামাসি বললেন, 'তুই ওই ছাদ থেকে আমাদের ছাতে চলে আয়, তোকে সন্দেশ খাওয়াবো। একটা মাত্র সন্দেশ আছে, ছুড়ে দিলে যদি লুফতে না পারিস!'

আমি এই ধরনের আজব প্রস্তাব এর আগে কখনও শুনিনি। দুটো ছাদের মধ্যে তেমন ফাঁক নেই বটে; কিন্তু

একবার পা পিছলে গেলে দেখতে হবে না। তাছাড়া, মা যদি একবার শুনতে পায়, ছাদের আলসে টপকে আমি অন্য ছাদে গিয়েছি, তাহলেও রক্ষে থাকবে না। কিন্তু আমাকে গড়িমসি করতে দেখে মীরামাসি যে হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করে বসবেন তাও ভাবি নি।

মীরামাসি আমাকে কিছু বললেন না। বুকের কাপড়টা সামান্য সরিয়ে, আঁচলটাকে অাঁট করে কোমরে জড়িয়ে নিলেন। গোড়ালির কাপড়টাকে সামান্য তুলে কোমরে গুঁজে নিলেন। মাথার ফুলের মালাটাও ঠিক করে নিলেন। তারপর অন্য ছাদগুলোর দিকে একবার সতর্কভাবে তাকিয়ে, একসাইজ করবার ভঙ্গীতে দুটো হাত কয়েকবার ঘুরিয়ে নিলেন।

এবার বলা নেই কওয়া নেই, মীরামাসি সোজা ছাদের আলসের উপর উঠে পড়লেন। এক মুহূর্তে টাল সামলে নিয়ে মীরামাসি আমাদের ছাদের দিকে লং জাম্প মারলেন। সভয়ে আমি তখন চোখ বুজে ফেলেছি। মীরামাসির ছাদ থেকে ঝাঁপ দেবার এমন সর্বনাশা খেয়াল চাপলো কেন কে জানে।

কিন্তু মীরামাসির কিছু হয়নি, তিনি নিরাপদেই আমাদের ছাদে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর লাফ দিয়ে নামবার এমনই কায়দা যে, ঝপাং করে কোনো আওয়াজও হলো না। ঠিক যেন একটা ব্যাডমিণ্টনের ফেদার কক পাশের বাড়ি থেকে ছিটকে এসে আমাদের ছাদে পড়লো।

আমি তখনও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছি। কিন্তু মীরামাসির কিছুই হয়নি। বললেন 'এ আর কতটুকু, এ-সব চোখ বুজে টপকানো যায়।' মীরামাসির হাতেই সন্দেশটা ছিল। বললেন, 'নে, খেয়ে নে।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মীরামাসি সম্বন্ধে আমার মতামত

যেন সম্পূর্ণ পালটে গেল। আমি বিনা দ্বিধায় এই বীরাঙ্গনার ভক্ত হয়ে উঠলাম। মীরামাসিকে বলেছি, 'তোমার খুব সাহস।'

মীরামাসি বললেন, 'সাহস না থাকলে কিছুই হবে না। মা আমাকে বকাবকি করে; কিন্তু বাপি বলে, মেয়েরা সাহসী না হলে ভারতবর্ষের মুক্তি নেই।'

আমি তখন অত বুঝিনা। প্রশ্ন করেছি, 'কেন?'

'বাপি বলে, মায়েদের বুকে সাহস থাকলে তবে তো তাদের ছেলেরা সাহসী হবে।'

'ও, এইবার বুঝেছি। তার মানে, দিছু যদি খুব বীর না হয়, সব সময় যদি ভয়ে ভয়ে থাকে, তা হলে মুক্তোমামারও সাহস বাড়বে না।'

আমার বিশ্লেষণে মীরামাসি যেন একটু ফাঁপরে পড়লেন, বললেন, 'তোর মাকে দেখছি বলতেই হবে—একদম বুড়োটে বনে যাচ্ছিস। এখন সন্দেশ খা।'

মীরামাসি এবার কোমরে আঁচলটা আবার আঁটতে শুরু করলেন।

বললাম, 'কী দরকার মাসি, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও।'

মীরামাসি উত্তর দিলেন, 'সেটি হচ্ছে না। যেখান দিয়ে এসেছি, ঠিক সেখান দিয়েই ফিরবো।'

লক্ষ্মীটি মাসি, তুমি সিঁড়ি দিয়ে চলে যাও। আমি তোমাকে দিয়ে আসছি। আমার ভয় করছে।'

'পড়লে তো আমি পড়বো। তোর ভয় কিসের?' মীরামাসি নিজের অবাধ্য চুলগুলোকে নির্মম হস্তে কপাল থেকে সরিয়ে দিলেন।

'তোমার লাগলে বুঝি আমার কষ্ট হবে না?'

মীরামাসির কঠিন পুরুষালিভাব হঠাৎ কোমল হয়ে গেল। 'সত্যি তুই আমাকে খুব ভালবাসিস। আমিও তোকে

ভালবাসি। কিন্তু আমি যদি পড়ি, দু-একজন খুব খুশী হবে। যেমন নিচের বুড়ী। আমাকে একদম দেখতে পারে না। মাকে বলেছে—সমথ মেয়েমানুষকে অত আদর দিও না। আদর দিলে মেয়ে খারাপ হয়ে যায়। অশ্রু বলে, মেয়েরা শাসনে না থাকলে সংসার ভেসে যায়। কী আশ্চর্য বুড়ী রে! তোমার অশ্রু যা বলে, তা তুমি মানগে যাও, তোমার মুক্তোর বউ এলে তাকে মানতে বোলো। আমার কী? আমরা কী ভাড়া দিয়ে থাকি না?'

অশ্রুমামার বিরুদ্ধে কোনো কথার মধ্যে আমি নেই, তাই চুপচাপ রইলাম। মীরামাসি বললেন, 'আমার বাবা আমাকে ভালবাসবে, তার জন্যেও বুড়ীর ছেলের অনুমতি চাই? তুই বুড়ীকে বলে দিস, আমি রাগলে ভাল হবে না।'

আমি বিব্রত হয়ে কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। মীরামাসি বললেন, 'অন্ধকার হয়ে আসছে, এবার লাফ দিয়ে ফিরে যাই। এখন গিয়েই চা খাবো। তোর দিদুকে বলিস, আমি চা খাবো, গান গাইবো, আমার যা খুশী করবো।'

মীরামাসি আর একমুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না। আমাদের ছাদের আলসেতে উঠে, আর এক লাফে নিজেদের ছাদে গিয়ে পড়লেন।

এরপরও তো কতবার মীরামাসির এই বীরাঙ্গনা মূর্তি দেখেছি। কতবারই তো তিনি লাফ দিয়ে আমাদের ছাদে এসেছেন। ইস্কুলে বন্ধুদের কাছে গল্পও করেছি। বন্ধুরা অবাক হয়ে শুনেছে।

আমি বলেছি, মীরামাসির যা সাহস তাতে মাসি যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু মীরামাসির ঐ দোষ—চা খেতে ভালবাসে; আর গানও। গুণ গুণ করে গান ধরে মাসি।'

অশ্রুমামা যদি এ-সব জানতে পারেন, আমার সঙ্গে হয়তো

আর কথাই বলবেন না। রাত্রে মাতুরে বসে, অন্ধকারের মধ্যে আমরা ত্ব'জন গল্প করি। 'জানো স্যাংকে সায়েব, এই চা আর গানই আমাদের সর্বনাশ করলে। ফোতো বাবুতে দেশটা ভরে গেল।'

'গান বুঝি খারাপ ?' আমি অশ্রুমামাকে প্রশ্ন করি।

'গান বলতে আগে বোঝাতো ঠাকুর-দেবতার গান। কেত্তন, ভজন তো পুজোরই অংশ। কিন্তু এখনকার সব গান অতি নোংরা। আর তেমনি হয়েছে বাপ-মা। মেয়ে গাইছে—তুমি আসবে বলে এলে না, আমার হৃদয় তাই পেলে না—আর বাপ-মা নির্বিকার হয়ে তাই শুনছে। মানে বুঝে গান শুনলে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে। যে-সব ছোঁড়া গান গায় তারাও বকে যায়, পরীক্ষায় চিৎপটাং হয়।'

মীরামাসি আমার মুখে এই কথা শুনে বলেছিলেন, 'বলা উচিত নয়, কিন্তু এও এক ধরনের পাগলামো।' মীরামাসি বলেছিলেন, 'যখন বড় হবি তখন সেক্সপীয়রের লেখা পড়বি। তিনি বলেছেন, যে মানুষ গান ভালবাসে না, সে খুন করতে পারে।'

আমি রেগে গিয়েছি। 'তার মানে তুমি বলতে চাও আমি আর অশ্রুমামা খুনে ?'

মীরামাসি বলেছেন, 'তোকে কিছু বলছি না; তুই তো এখনও ছেলেমানুষ—ভালমন্দ বোঝবার বয়স হয়নি।'

আপিস থেকে ফিরে অশ্রুমামা সেদিন বসেছিলেন। সেক্সপীয়রের কথা তুললাম। তিনি বললেন, 'ও-সব পাকা কথা কোত্থেকে শিখলে ? কে তোমার মাথাটি চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছে ?'

আমি মীরামাসির নাম করতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছি। অশ্রুমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয় ইস্কুলের

কোনো বখাটে ছোড়া। তার সঙ্গে মোটেই মিশবে না। জীবনে যদি উন্নতি করতে চাও, তাহলে ঐ বন্ধু থেকে সব সময় দশ হাত দূরে থাকবে।'

এ-সব কত দিন আগের কথা। এতোদিন ধরে পৃথিবীর জল-হাওয়ায় মনটার কত না পরিবর্তন হয়েছে।

কিন্তু সেদিন মনের মধ্যে কোনও প্যাঁচ ছিল না। অশ্রু-মামার উপর বিশ্বাস ছিল পরিপূর্ণ। তিনি যা বলেন তাই যে সত্যি, তাই যে শেষপর্যন্ত হবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না।

সন্দেহের কোনও সুযোগও দেন নি তিনি। সর্বদা স্নেহ ও প্রীতি দিয়ে আমাকে ঘিরে রেখেছিলেন। খাওয়া, শোওয়া, খেলা দেখা, গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়া—সব অশ্রুমামার সঙ্গে। বইয়ের মলাট দিয়ে দিয়েছেন অশ্রুমামা, নিজের জুতোর সঙ্গে আমার জুতোতে কালি মাখিয়ে দিয়েছেন, এমনকি চুলও ছেঁটে দিতেন নিজে। একটা পুরনো বিস্কুটের টিনের মধ্যে চুল ছাঁটার কাঁচি, চিরুনি, বুরুশ, আয়না ইত্যাদি ছিল।

মামা বলতেন, 'এ-সব অর্ডিনারি নাপতে ছাঁটের কী জানে? সায়েবী ছাঁট দিয়ে দেবো আমি। আর চুল-ছাঁটাটি জেনে রাখবে খুব ইমপর্টান্ট। এই মাথা খাটিয়েই তো সায়েবরা তুনিয়া চালাচ্ছে। ওই যে টেরি-কাটা বা বাবরী চুল রাখা—ও-সব সায়েবদের মধ্যে দেখতে পাবে না।'

অশ্রুমামার সব কথাই ছিল আমার কাছে ধ্রুব সত্য। মুক্তোমামাও বোধহয় তাই বিশ্বাস করতেন। মীরামাসির সঙ্গে আর দেখা করবো না ঠিক করেছিলাম। দেখা করলেই যে আমার মাথা গোলমাল হয়ে যায়। আমি এখন মোহনবাগানের

সাপোর্টার, কিন্তু মীরামাসির সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় আমি অন্যায় করছি—আমার ইস্টবেঙ্গলকেই সাপোর্ট করা উচিত। চা যে বিষ তা জানি—কিন্তু মীরামাসি সেই বিষও তো কেমন হাসিমুখে খাচ্ছেন, তাতে তাঁর শরীর তো মোটেই খারাপ হচ্ছে না। বরং মীরামাসির স্বাস্থ্য যেন দেহের আধার থেকে উছলে পড়ছে। গায়ে জোরও কত মীরামাসির। আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিলেন একদিন। এক মিনিটে আমাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন—'তুই কেন, আরও আচ্ছা আচ্ছা লোককে পাঞ্জাতে হারিয়ে দিতে পারি।'

'অশ্রুমামা, মুক্তোমামা এদের হারাতে পারবে? এদের সঙ্গে একদিন লড়ো না দেখি।'

'হারিয়ে ভূত করে দিতে পারি। কিন্তু লড়া যায় না।' মীরামাসি বলেছেন।

'কেন যায় না? আমি ব্যবস্থা করছি।'

'দূর বোকা! আমি যে মেয়ে, অন্য লোকের হাত ধরতে নেই। আমি শুধু বাপির সঙ্গে লড়ি। বাপির গায়ে জোর আছে, তাও আমার সঙ্গে পারে না।'

এই আমার মীরামাসি। অন্যদিকে মুক্তোমামা চা স্পর্শ করেন না, লেবু দিয়ে মিছরির জল খান। তবু পেটের গোলমাল লেগেই আছে।

কলেজে পাস করে মামা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়েন। খেয়ে উঠে পড়তে যাবার আগে মুক্তোমামা একবার পায়খানায় যাবেনই।

দিদু ভয় পেয়ে যান। বলেন, 'তোর এই অভ্যেসটা ছাড় মুক্তো। কোনদিন অশ্রুর নজরে পড়ে যাবি।'

মুক্তোমামা রেগে গিয়ে বলেন, 'নিজের ইচ্ছেমতো পায়খানায় যাবার স্বাধীনতাও নেই আমার?'

দিহু বলেন, 'অশ্রুর কাছে শুনিস নি—খেয়ে হাগে আর শুয়ে জাগে, সে ছেলে না কোনো কাজে লাগে।' মুক্তোমামা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

পেটের গোলমাল থাকলেও মুক্তোমামার চেহারাটা আজকাল অনেক সুন্দর হয়েছে। একটু মোটা হয়েছেন তিনি, আর রঙটাও যেন নতুন চুনকাম করা হয়েছে। মুক্তোমামাও আমাকে ভালবাসেন। মুক্তোমামা একদিন বললেন, 'একটা গল্পের বই দিস তো আমায়। শুয়ে শুয়ে পড়বো।'

দিহু আবার ভয় পেয়ে যান। 'ইংরিজী বই পড় না বাপু। বাংলা গল্প পড়ছিস শুনলে অশ্রু রসাতল করবে। অশ্রু কতদিন ধরে তোকে ইংরিজীতে ভাববার, ইংরিজীতে কাঁদবার, ইংরিজীতে হাসবার চেষ্টা করতে বলছে।'

মুক্তোমামার মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। 'আমার মাথা ধরেছে মা। মাথা-ধরা অবস্থায় ডিক্সনারি নিয়ে ইংরিজী বই পড়তে যে কী কষ্ট হয় তা জানো না।'

মাথা ধরবার কথায় দিহু কাতর হয়ে পড়লেন। 'হ্যাঁরে, আবার মাথা-ধরা কেন? জ্বর-টর আসছে না তো? দেখি তোর গা। না, গা তোর ঠাণ্ডা। থাক বাপু, ইংরিজী বই পড়ে দরকার নেই।

সত্যিই খুব মাথা ধরেছে মুক্তোমামার। বিছানায় শুয়ে বললেন, 'দেখো, আবার দাদাকে বলে বোসো না যেন। তাহলে আবার এক্স-রে, বাহ্যে-পেচ্ছাপ, রক্ত পরীক্ষা করাতে করাতে জান কয়লা হয়ে যাবে।'

আমি অশ্রুমামার লোক, অশ্রুমামার সঙ্গে একমাত্র আমারই সব রকম কথাবার্তা হয়। একমাত্র আমাকেই অশ্রুমামা কখনও রাগ দেখাননি। পৃথিবীর খারাপ মানুষদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ অশ্রুমামা আমার কাছেই করেন। এই যে পৃথিবীর মানুষরা

গাঁজা, সিদ্ধি, মদ, চা খেয়ে, তাসপাশা খেলে, নেচে-কুঁদে গান গেয়ে নিজেদের এবং অনাগত বংশধরদের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করছে, সে-সম্বন্ধে আমার কাছেই অশ্রুমামা দুঃখ করেন।

'আমার কী ? আমার তো আর ছেলেপুলে নেই—পৃথিবী রসাতলে গেলেও আমার কিচ্ছু এসে যেতো না। কিন্তু মুক্তোটা রয়েছে। এখন থেকে বাধা না দিলে, প্রতিবাদ না করলে ওর ছেলেপুলেরা কষ্ট পাবে,' অশ্রুমামা বলতেন।

অশ্রুমামা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারতেন। কিন্তু দেখেন নি। মুক্তোমামাও আমাকে ভালবাসতেন। আমার হাতের লেখা দেখে দিতেন। অঙ্ক আটকালে কষে দিতেন। শুধু দিদুই আমাকে সন্দেহ করতেন। প্রায়ই বলতেন, 'যারা এর কথা ওকে লাগায়, ওর কথা একে লাগায়—ভগবান কখনও তাদের ভাল করেন না। লক্ষ্মী ধন আমার, অশ্রুকে যেন কোন কথা বোলো না। ভাই-অন্ত প্রাণ ওর। ভায়ের জন্যে নিজে সংসার করলে না। আর, দোতলার ঐ দামাল মেয়েটার কাছেও বেশী যেও না। মেয়েটা বেটাছেলের ওপরে যায়।'

কিন্তু দোতলাতেই চলে গিয়েছি আমি। দেখি মীরামাসি বাপির চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন। বাপি বলছেন, 'হলো মা ?'

মীরামাসি আবার চুল ঘেঁটে ফেললেন। 'ঠিক হলো না। আবার করে দিচ্ছি।'

আবার চুল আঁচড়ে বললেন, 'যা করে দিলুম, ঠিক যেন এই থাকে। অফিস থেকে যখন ফিরবে তখন যদি দেখি খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাহলে বকবো।'

বাপি উঠে পড়লেন, 'তাহলে এবার যাচ্ছি মা।'

মীরামাসি বললেন, 'যাও, কিন্তু ঠিক সময়ে ফিরবে। না হলে ভাল হবে না। আর ফেরবার সময় আমার জন্যে একটা হাত-লাট্টু আনবে।'

মীরামাসির মা নিরুপায় হয়ে বাবা ও মেয়ের কীর্তি দেখছিলেন। বললেন, 'ধন্যি! মেয়ের হুকুমে সকালে আপিসেই গেলে না।'

বাপি বেরিয়ে যেতেই মীরামাসি আমাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। আমার চুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর মাথাটাও যে কাকের বাসা হয়ে রয়েছে। আয়, কাছে আয়। কোথা থেকে চুল কাটিস রে? গাড়োয়ান ছাঁটও এর থেকে ভাল।'

আমার চুলটাও মীরামাসি চিরুনি দিয়ে ঠিক করতে লাগলেন। ভয় পেয়ে বললাম, 'টেরি কেটে দেবেন না যেন। এমনি আঁচড়ে দিন।'

'কেন, টেরি কাটলে মামা বুঝি কথা বন্ধ করে দেবে? টেরি না কাটলেই ভাল ছেলে আর টেরি কাটলেই খারাপ ছেলে—এমন কোনো আইন নেই।'

আমি চুপ করে রইলুম। মাসি বললেন, 'বাপিকে আজ আটকে রেখেছিলুম। বাপি তো আমাকে ভয় করে, কখনও আমার অবাধ্য হয় না। বাপিকে বললুম, "তুমি এখন আপিসে যাবে না।" বাপি বললে, "এখন না গেলে লেট হয়ে যাবে যে মা।" আমি বললুম, "হয় হবে। যদি যাও ভাল হবে না বলছি।" বাপিকে এতক্ষণ ডিটেন করে রেখেছিলুম—এই তিনটের সময় ছাড়লাম।'

আমি বিস্ময়ে মীরামাসির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। মীরামাসি যে ছেলেমানুষি করছে, তা সেই ছোট বয়েসেও আমার বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না।

মীরামাসি বললেন, 'এখন বুঝছি, বাপিকে আটকে রাখা ঠিক হয় নি। কিন্তু পারলাম না। মাথার মধ্যে কোত্থেকে যে এক ভূত চেপে বসলো।'

এবার বইয়ের কথা তুললাম। 'একটা বাংলা বই দেবে? মুক্তো মামার খুব মাথা ধরেছে। শুয়ে শুয়ে পড়বে।'

'খুব মাথা ধরেছে বুঝি?' মীরামাসি জিজ্ঞেস করলেন, 'খুউব?'

'যন্ত্রণায় ছটফট করছে।'

'একটা কথা বলবো?'

'বলো না।'

'আমাদের চা হচ্ছে। একটু গরম চা নিয়ে যা না। আর সঙ্গে শরদিন্দুর একখানা ব্যোমকেশের গল্প। মাথা-ধরা ছেড়ে যাবে।'

মীরামাসির সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। অশ্রুমামার ভাইকে তিনি চা খাবার পরামর্শ দিচ্ছেন! কিন্তু তাঁর বলার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। তাই নীচে নেমে এসে মুক্তোমামাকে কানে কানে খবরটা নিবেদন করলাম।

ভেবেছিলাম, মুক্তোমামাও রেগে উঠবেন। মেয়েটার স্পর্ধার সমুচিত জবাব দেবেন। কিন্তু কিছুই হলো না। বললেন, 'তা, মন্দ কথা নয়, মাথাটা ছেড়েও যেতে পারে। তুই মাকে বলিস তোদের বাড়ি থেকে ওষুধ এনেছিস।'

উৎসাহী দূত আবার দোতলায় গিয়ে হাজির হয়েছে। মীরা মাসি আমাকে ফিরে আসতে দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

আমি বললাম, 'মামা রাজী হয়েছেন।'

মীরামাসিও বেশ খুশী হলেন। আমাকে কাপে করে চা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'কাপ-ডিশ থাকলে মামা ধরা পড়ে যাবেন। আপনি গেলাসে চা দিন।'

মীরামাসি গেলাসে চা ঢালতে ঢালতে বলেছিলেন, 'কাপে বুঝি ওষুধ খাওয়া যায় না?'

হয়তো খাওয়া যায়। কিন্তু কাপ-ডিশ আর চা আমাদের কাছে অভিন্ন ছিল। তার কারণ বোধহয় অশ্রুমামার ঘরে

আলমারির মধ্যে রাখা তিনটে কাপ-ডিশ। অশ্রুমামার ঘরে মদের বোতল এবং পেগ দেখলেও হয়তো এতো আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু দিহুর কাছে ব্যাপারটা শুনেছিলাম। দিহু বলেছিলেন, ও দুটো অশ্রুর মিলটন সায়েবের জন্যে কেনা।

মিলটন সায়েব একবার অশ্রুর বাড়ি দেখতে আসবেন বলেছিলেন। অশ্রুমামা কায়দা করে বারণ করেছিলেন কিন্তু মিলটন সায়েব শোনেননি। তিনি বলেছিলেন, 'আই ওয়ান্ট টু সী ইওর মাদার—দি গ্রেট লেডি যিনি তোমার মতো সনকে মানুষ করেছেন।'

অশ্রুমামা বাড়িতে এসে মাকে বলেছিলেন। দিহু তখন বলেছিলেন, 'সায়েবের খাবার-দাবার কী হবে?'

মামা বলেছিলেন, 'শনিবারের বিকেলে আসবে। ওই সময় ওরা চা খায়।'

সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারেননি অশ্রুমামা। অন্তরাত্মা আর সৌজন্যবোধের মধ্যে টাগ-অফ-ওয়ার চলেছে তখন। এতদিন মিলটন সায়েবের সঙ্গে মিশেছেন, বাড়িতেও গিয়েছেন কয়েকবার, কিন্তু ম্লেচ্ছর সঙ্গে বসে খাননি। যারা ষাঁড়ের মাংস খায়, যাদের এঁটো-কাটা বিচার নেই, তাদের কাছে চাকরি করা যায়, কিন্তু পাত পেড়ে খাওয়া যায় না। কিন্তু এখন অশ্রুমামা যে গৃহস্বামী, কী করে অতিথি সৎকার করবেন?

অনেক চিন্তা করেও চায়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। যা তিনি পছন্দ করেন না, যা তিনি খারাপ বলে জানেন, তা কী ভাবে তিনি অন্যের হাতে তুলে দেবেন? কিন্তু শেষপর্যন্ত ভেবেছিলেন, উপায় নেই। সায়েবদের জন্যে নিয়ম কানুন নেই। ষাঁড়ের-ডালনা-খাওয়া ধাতে চা কোনও ক্ষতি করে না।

দিহু নিজেই মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। 'কী করে

যে চা রাঁধে তা তো জানিনি বাপু। যাই হোক, পাশের বাড়ি থেকে দুটো কাপ-ডিশ নিয়ে আসি।'

অশ্রুমামা বলেছিলেন, 'তা কিছুতেই হয় না। মিলটন সায়েবকে অপরের খেকো কাপে আমি চা দিতে পারবো না।'

নতুন তিনটে কাপ আর ডিশ কিনে এনেছিলেন। ঠিক হয়েছিল, সায়েব ও তাঁর বৌ দুটো কাপ ডিসে চা খাবেন, আর একটা কাপে অশ্রুমামা বেলের শরবৎ খাবেন।

বাড়িতে রিহার্সেল চলেছিল। মুক্তোমামা হয়েছিলেন মিলটন সায়েব, আর দিদু নিয়েছিল মিসেস মিলটনের ভূমিকা। অশ্রুমামা ওঁদের সঙ্গে ফট ফট করে ইংরিজী বলতে বলতে, কাপ ডিশে বেলের শরবৎ খাওয়া অভ্যেস করছিলেন।

দিদু বলেছিলেন, 'ডিশটা রয়েছে কী জন্যে? ওতে ঢেলে খা।'

অশ্রুমামা বলেছিলেন, 'না মা, কোনো আসল সায়ের ডিশে ঢেলে খায় না—ওরা ফেতি সায়েব।'

সব ঠিক-ঠাক হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত মিলটন সায়েবের আসা হয়ে ওঠেনি। মিলটন সায়েবের বেয়ারা এসে সেই শনিবারে দিদুর নামে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল— 'আমার স্ত্রীর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হওয়ায়, যাওয়া হল না। অপরাধ মার্জনা করবেন।'

সেই থেকেই কাপগুলো রয়েছে। কোনদিন হয়তো মিলটন সায়েব আবার আসতে চাইবেন, তাই কাপ ডিশগুলো ফেলে দেওয়া হয়নি। কিন্তু নিষিদ্ধ পানীয়ের প্রতীক হিসেবেই ওগুলো আলমারির মধ্যে তালাবদ্ধ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করতো। চায়ের কাপ ডিশ হাতে মীরামাসির ঘর থেকে বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সেই কারণেই বোধহয় অসম্ভব ছিল।

দিহু বললেন, 'হ্যাঁরে মুক্তো, কী খাচ্ছিস তুই ?'

মুক্তোমামা একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'ওষুধ।'

'যা-তা ওষুধ খাসনে, ওতে আবার বুকের ব্যামো ধরে শুনেছি।' বিকেলের কুটনো কাটতে কাটতে দিহু বললেন।

'আঃ!' মুক্তোমামা আর একবার চুমুক দিলেন। আমার মনে হলো আমারই চোখের সামনে বোতল থেকে মদ ঢেলে মুক্তোমামা খাচ্ছেন।

কোনো কথা বললেন না মুক্তোমামা। শুধু নিজের কোঁকড়ানো চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে লাগলেন। মুক্তোমামা রোগা বটে, কিন্তু সুন্দর। 'কোরা মানুষ তৈরি করে ভগবান তাকে পৃথিবীতে পাঠাবার আগে একেবার ভাল করে কেচে নেন। আমাকে কেচেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ইস্তিরি করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই চুলগুলো কুঁকড়ে গিয়েছে', মুক্তোমামা আমাকে বলেছিলেন।

অশ্রুমামা থাকলেই মুক্তোমামা একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে যান। অন্যসময় মুক্তোমামা বেশ কথা বলেন। মুক্তোমামা আজকে তাঁর কালো চশমাটা পরেছেন। তাই আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওটা কিন্তু লুকিয়ে কেনা। অশ্রুমামা দেখলে ভেঙেই ফেলবেন। বলবেন, 'ভগবানের আলো ভগবানের দেওয়া চোখে এসে লাগবে। নেচার এবং তোমার মধ্যে খরচা করে কালো পাঁচিল তুলে দেওয়ার কোনো মানে হয় না।'

চা খাওয়া শেষ হলে চায়ের গেলাসটা নিতে গেলাম। মুক্তোমামা জোর করে সেটা কেড়ে নিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেললেন। তারপর আমার হাতে দিলেন।

আমি যে কী করবো বুঝে উঠতে পারি না। অশ্রুমামা, মুক্তোমামা, মীরামাসি সবাইকে আমার ভাল লাগে—সবার

কাছে যেতে ইচ্ছে করে আমার। সবাই যা বলে তাই আমার ঠিক এবং সত্যি বলে মনে হয়। অথচ ওরা তিনজন কেন যে তিন মুখে ছুটছে—বুঝে উঠতে পারি না।

চা খেয়ে মুক্তোমামা যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন। আমাকে বললেন, 'তুই কিন্তু খুব পুণ্যি করছিস। ভগবানের পোস্ট-আফিসে তোর নামে একটা পাস-বই আছে—সেখানে সব জমা পড়ছে। পরে সুদ-সমেত ফেরত পাবি।'

মুক্তোমামার মুখ দেখে সেদিন বিশেষ কিছু বোঝবার মতো বয়স হয়নি আমার। কিন্তু ভারি মায়া হয়েছিল। বললাম 'মামা, তোমার ব্যথা কমেছে?'

মুক্তোমামা আমার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললেন, 'হ্যাঁরে, খুব কমে গেছে।'

'তবে দেখো! অথচ মীরামাসিকে তোমরা পাজি বলো। মীরামাসি নিজে হাতে চা ছাঁকলো। হাতে একটু গরম জলও পড়ে গিয়েছে।'

'অ্যাঁ, পুড়ে গেছে নাকি?'

'না না, পোড়েনি। পুড়লে তো আমি জানতে পারতাম।'

মীরামাসির হাতে গেলাসটা দিতেই তিনি সেটা ধুতে যাচ্ছিলেন। বললাম, 'মামা, সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে।'

শুনেই মাসি আবার চটে উঠলেন। মাসির মাথার মধ্যে যেন একটা ভূত ঘুমিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে তার ঘুম ভেঙে যায়। বললেন, 'আমি বুঝি ধুয়ে নিতে পারতাম না? ও বুঝেছি, গায়ে পড়ে ঝগড়া করবার চেষ্টা!'

মাসিকে বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম, মুক্তোমামা ঝগড়া বাধাবার জন্যে কিছুই করেনি, বরং মীরামাসির সুবিধে হবে ভেবেই ধুয়ে দিয়েছে।

মীরামাসির রাগ তবু কমলো না। 'যা যা, চোরের সাক্ষী

মাতাল। তুই আর বাজে বকিস না। তুই তো আরও খারাপ। না হলে ইস্টবেঙ্গলের লোক হয়ে মোহনবাগানের দলে ভিড়িস?'

এতোদিন পরে সেই সব কথা স্মরণ করতে গিয়ে আমার হাসি আসছে। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল, এ অপমান সহ্য করে কেমন করে বেঁচে থাকবো? যেন কতকগুলো গুণ্ডা ছেলে হাফপ্যাণ্ট কেড়ে নিয়ে জোর করে আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে আমার।

মীরামাসিও ভুল বুঝলেন আমায়। আমি কি নিজের স্বার্থের কথা ভেবে মোহনবাগানের সাপোর্টার হয়েছি। ইস্টবেঙ্গল যে মোহনবাগানের মতো গোরাদের হারাতে পারে না। ওদের যত তেজ এই মোহনবাগানের কাছে। কালিঘাট, এরিয়ান্সের কাছে হেরে মরবে; কিন্তু মোহনবাগানের সর্বনাশ করবার জন্যে জান দিয়ে লড়ে যাবে। আর আমি বা অশ্রুমামা মাঠে গেলেই বেচারা মোহনবাগান হেরে যাবে। টিকিট পেলেও আমি আর অশ্রুমামা তাই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় যাবো না ঠিক করেছি। সোমানা-আপ্পারাওয়ের দৌলতে ইস্টবেঙ্গল তো আজকাল খুব জিতছে—ওদেব দলে গেলেই তো লাভ। তবু আদর্শের কথা ভেবে আমি মোহনবাগানে জয়েন করেছি। মনে মনে এমনও ভেবেছি, মোহনবাগান যদি লীগের খেলায় লাস্ট হয়, শিল্ডে যদি ফার্স্ট রাউণ্ডেও হেরে যায়, তবু আমি মোহনবাগানকে ছাড়বো না। কোনোদিন ছাড়বো না।

'কী হয়েছে? মুখ শুকিয়ে কেন?' অশ্রুমামা যে কখন ফিরে এসেছেন বুঝিনি। চোখদুটোও যেন লাল হয়েছে মনে হচ্ছে। কাঁদছিলে নাকি? ছিঃ, সায়েবদের কাঁদতে আছে

নাকি ? এই তো হিটলার ইংরেজদের এতো মারছে ; বোমা ফেলে ঘর-দোর ভেঙে ফেলছে, কিন্তু চার্চিল কী কাঁদছে ?'

সত্যি, কোথাকার কোন্ একটা ডানপিটে অসভ্য মেয়ের কথায় আমার চোখের জল ফেলা উচিত হয়নি। কিন্তু ফুটবলের সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, কোনো দলেই আমি থাকবো না।

আমার কথা শুনে অশ্রুমামা গম্ভীর হয়ে উঠলেন, 'কেউ কিছু বলেছে নাকি ?'

'ইস্টবেঙ্গলের লোক হয়ে আমি আর কখনও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে যাবো না।'

অশ্রুমামা অবাক হয়ে গেলেন। ও মা যশোর জেলার লোক আবার কবে থেকে বাঙাল হলো ? পদ্মা না পেরোলে বাঙাল হয় না। তোমরা হলে আর কি মাঝামাঝি। না ঘটি, না বাঙাল। ইয়ার্কি করে অনেকে শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে যে আসে তাকেই বাঙাল বলে। তোমার দিদু ঠিকই বলে, বাঙালরা অনেকেই পাজী। এই চা খাওয়া, গান গাওয়া, ধিঙ্গিপনা করা, মেয়েদের গুণ্ডাপনা এ-সব ওদের মধ্যে অনেক বেশী। আর যাদের এই সব মরাল, তারা আস্তে আস্তে অন্যদেরও খারাপ করে। এক টুকরি আমের মধ্যে একটা পচা আম রাখো, সেইটা ভালোর সংসর্গে ভাল হবে না ; উল্টে সবগুলোকে একা খারাপ করে ছাড়বে। দুনিয়ার এই নিয়ম। চা-খাওয়া এবং গান বাজনাকরা এমন জিনিস যে, ছাত্ররা পড়াশোনায় গাড্ডু খাবে।'

না, আমি আর এ-সবের মধ্যে থাকবো না। মীরামাসি, মুক্তোমামা কাউকে আমি ভাল করবার চেষ্টা করবো না। পৃথিবীতে যা হয় হবে ; আমি এবার থেকে এদের সবার সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে, আবার ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমাবো।

তাদের সঙ্গে ইস্কুলের মাঠে খেলা করবো। রাত্রে খাওয়ার পর অশ্রুমামার সঙ্গেও গল্প করবো না। ওই সময় রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের বই পড়বো। পৃথিবীর এই ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে পড়ে নিজেকে আমি আর কষ্ট দেবো না।

তবে নিজে আমি ভালো থাকবো। নিজে আমি চা খাবো না; গান গাইবো না। যদি কখনও যুদ্ধের বই আসে তবেই কেবল সিনেমায় যাবো; আর যখন বড়ে হবো তখনও বাবার মতো সিগারেট খাবো না। দুধ খেতে আমার ভাল লাগে না—তবু দরকার হলে তখন মিলটন সায়েব যেখান থেকে দুধ কেনেন সেই এডওয়ার্ড কেভেণ্টার কোম্পানির বটের আঠার মতো ঘন দুধ কয়েক বোতল খেয়ে ফেলবো।

তাই করেছি আমি। সবার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করেছি। একটু সুবিধেও হয়েছে। কারণ, অশ্রুমামা তখন মিলটন সায়েবের সঙ্গে অফিসের কাজে বম্বে গিয়েছেন। অশ্রুমামা থাকলে হয়তো আমার অসুবিধে হতো।

রাস্তায় মুক্তোমামার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। 'হ্যাঁরে, তোর খবর কি? দাদা নেই বলে আসা ছেড়ে দিলি নাকি? সিভিল ভারসাস মিলিটারি একজিবিশন ফুটবল আছে, যাবি?'

আমি যাবো না শুনে মামা ফিস-ফিস করে এক গোপন প্রস্তাব করেছেন। 'এখন তো দাদা নেই, চল না, একটা ওয়াণ্ডারফুল জিনিস খাওয়াবো। অনাদির মোগলাই পরোটা। একটা খেলে পাগল হয়ে যাবি। তারপর যদি তোর ক্ষিদে থাকে, চিংড়ি কাটলেট খেতে পারিস। সঙ্গে কত কি দেয়—পিঁয়াজ, বিট গাজর সেদ্ধ, টমাটো-সস, মাস্টার্ড, আর নুন-মরিচ তো আছেই। ভয় কি তোর? এতে অন্যায় কিছু নেই—তুই আর আমি তো চা খাচ্ছি না।'

আমি গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিয়েছি আমার যাওয়া হবে না।

মুক্তোমামা বলেছেন, 'খুব পেট ভার আছে বুঝি? ওপরে খুব খেয়েছিস বুঝি?'

'কেন খেতে যাবো?'

মুক্তোমামা বললেন, 'বা-রে, এই শুনলাম তোর মাসি ফার্স্ট ডিভিসনে আই-এ পাস করেছে। এই ডামাডোলের বাজারে কী করে ফার্স্ট ডিভিসন ম্যানেজ করলে কে জানে। অথচ, পড়ায় তো একদম মন আছে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'ও-সব কথা শুনে আমার কোনো লাভ নেই মামা। মীরামাসি আমার সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছে। আমাকে যা-তা বলেছে।'

মুক্তোমামা আমার কথা শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। 'কী ব্যাপার, তোর সঙ্গেও ঝগড়া?'

তবু সুখবরটা পেয়ে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল মীরামাসির কাছে ছুটে যাই। বলি, 'মাসি, তুমি না চা খাও? তুমি না সিনেমা দেখো? কী করে ভাল রেজাল্ট করলে?' কিন্তু নিজের মনটাকে সংযমের শিকলে বেঁধে ফেলেছি। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর জড়িয়ে পড়বো না।

বাড়িতে একলা বসে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'নীলসায়রের অচিন পারে' পড়ছিলাম। সমুদ্রের বুকে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক আটলাণ্টা দ্বীপের গল্পের মধ্যে নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন সময় নীচে থেকে মায়ের গলা শুনতে পেলাম—'ওরে, মীরা তোকে খুঁজছে।'

মীরামাসি এবার আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। পাতলা একটা শাড়ি পরেছেন মীরামাসি; সঙ্গে আকাশে-নীল অর্গাণ্ডির ব্লাউজ। আর ভিতরেও একটা ছোট্ট সাদা জামা পরেন মীরামাসি। সেটাও দেখা যাচ্ছে। খালি পায়েই

নিঃশব্দে উঠে এসেছেন তিনি। মীরামাসি চুলগুলোতে সাবান দিয়েছেন বোধহয়—তাই একটু ফেঁপে রয়েছে।

আমার কাঁধে হাতটা রেখে মীরামাসি এমন করুণভাবে হাসলেন যে, রাগ করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো।

'আমার ওপর রাগ করেছিস তুই?'

'একজন কেউ রাগ করলে তোমার কি এসে যায়?' আমি অভিমানের সঙ্গে উত্তর দিলাম।

সেদিন মীরামাসি একটা ইস্কুলের ছোট্ট ছেলেকে অত গুরুত্ব না দিলেও কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু সেই ডানপিটে মেয়েটা যে-আমাকে অপমান করেছিল, যে একছাত থেকে লাফিয়ে আর একছাতে গিয়েছিল, সে যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। আমাকে জোর করে নিজেদের ছাতে টেনে নিয়ে এসে মীরামাসি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। 'আমার দোষ হয়ে গিয়েছে। আর কখনও তোর মনে আঘাত দেবো না।'

'থাক থাক, ও সব কথা আর বলতে হবে না। এমনি আসছিলাম না, রাগ-টাগ করিনি', আমি বললাম। কিন্তু মীরামাসি কেমন করে জানলেন, আমি রাগ করেছি। একমাত্র মুক্তোমামা ছাড়া পৃথিবীর কেউ তো ব্যাপারটা জানে না।

'কী করে জানলে তুমি, আমি রাগ করেছি? তোমার তো জানবার কথা নয়।'

মীরামাসির মুখ এবার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। একটু ইতস্ততঃ করলেন, তারপর আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'কাউকে বলবি না বল? মা কালীর দিব্যি বল?'

'দিব্যি গালতে মা যে বারণ করে দিয়েছে।'

'তাহলে এই বইটা ছুঁয়ে বল।'

'বিদ্যে ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলবো না। বললে আমি যেন অঙ্কে ফেল করি।'

'তোর মুক্তোমামার কাছে শুনলাম।'

মুক্তোমামা! মুক্তোমামাদের সঙ্গে তোমাদের তো আড়ি। মামা তো কখনও তোমার সঙ্গে কথা বলতো না। মামার বুঝি আবার মাথা ধরেছিল? আবার বুঝি চা খেতে এসেছিল?'

'দূর বোকা!' মাসি আমার মাথায় আবার হাত রাখলেন। 'মাথা আঁচড়াসনি বুঝি?'

'না আঁচড়াইনি। এমনি রাখছি—যদি মুক্তোমামার মতো কোঁকড়া হয়ে যায়।'

'দূর বোকা!'

'কিন্তু মামার সঙ্গে কী করে তোমার ভাব হলো?'

'আমি যে আবার কলেজে ভর্তি হয়েছি। কলেজ স্ট্রীটে বাসে উঠতে গিয়ে দেখা হলো। ওঁর কাছেই শুনলাম।'

মীরামাসির মিষ্টি কথায় আমার রাগ গলে গিয়েছে। বললাম, 'আমার দোষ হয়ে গিয়েছে। আর কখনও রাগ করবো না।'

'দূর বোকা, রাগ করবি না কেন? বেটাছেলের একটু তেজ থাকা ভাল। তবে আমাকে ভুল বুঝিস না', মীরামাসি বললেন। 'বাপির কাছে আদর পেয়ে পেয়ে আমি এমন মুখরা হয়ে গিয়েছি। তোর মুক্তোমামাকেও বলিস আমাকে যেন ভুল না বোঝে।'

মীরামাসিকে এরপর পড়াশোনা সম্বন্ধে জেরা করতে শুরু করেছি। 'বি-এতে অনেক বই, পারবে তুমি?'

'চেষ্টা তো করতে হবে,' মীরামাসি উত্তর দিয়েছেন।

'আচ্ছা মীরামাসি, তোমার কলেজ তো অনেক দূরে। একলা যেতে পারবে? দিদু তো একা গলির মোড়-পর্যন্ত যেতে পারে না।'

মীরামাসি বললেন, 'বাসে করে যাবার জন্যে কী আর

দারোয়ান লাগে ? আজকাল মেয়েরা একা একা বিলেত-আমেরিকা যাচ্ছে।'

মাসি এরপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেছেন। 'জানিস, আজকে একটা মজার জিনিস আসছে। পরীক্ষায় পাস করেছি বলে, আমার কথামতো বাপি একটা গ্রামোফোন কিনে আনবে। কী মজাটাই হবে! ভালভাল গান শুনবো, যখন খুশি। আর রোববারে আমার হারমোনিয়ামটাও ফিরে আসবে। পরীক্ষার জন্যে এতোদিন মামারবাড়িতে পড়ে ছিল।'

অ্যাঁ! কলের গান! অশ্রুমামার মাথার ওপরে গান হবে! হারমোনিয়াম বাজবে! সেই দৃশ্য কল্পনা করেই আমি শিউরে উঠলাম।

'কী বলছো, মাসি ?'

'কী হলো তোর ?' মাসি বললেন। 'একটু বসে যা, বাপি এল বলে।'

একটুও সময় নষ্ট না করে একতলায় নেমে এসেছি। দিদুকে বললাম, 'দিদু, ওপরে কলের গান আসছে। মীরামাসি রোজ গানও গাইবে।'

দিদু তখন পড়ছিলেন—'হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্বক চিত্ত হরণ করে। ইন্দ্রিয়েব বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে। কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে।'

আমার কথায় তাঁর হাতের বই বন্ধ হয়ে গেল। বললেন, 'সর্বনাশ করেছে, বলিস কী রে ? ওই ধিঙ্গি মেয়ে কি আমাদের মাথার উপর নাচবে-গাইবে নাকি ?'

'গাইবে জানি, নাচবার খবরটা খোঁজ নিতে হয়,' আমি বললাম।

'ঠাকুর দয়া করো, ভদ্রলোকের বাড়িতে একি অনাসৃষ্টি কাণ্ড!'

দিত্নুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই উপর থেকে হঠাৎ কালের গানের আওয়াজ ভেসে এল। অনেকগুলো লোক যেন হারমোনিয়াম, তবলা, এস্রাজ, সেতার, বেহালা নিয়ে বসে গিয়েছে। আর একজন পুরুষ ভারি গলায় বিচিত্র সুরে আধুনিক গান গাইছে।

দিত্নুর মুখ দেখে মনে হলো, বাড়িতে যেন বাজ পড়ছে। দিত্নুর ভয়, 'অশ্রুকে ওরা চেনে না। হয়তো হাতাহাতি হয়ে যাবে। পুরো বাড়িটা অশ্রুরই নামে। ভাড়া দেবার আগে খোঁজ নেয়—হারমোনিয়াম, তবলা এই সব আছে কিনা। থাকলে ভাড়া হবে না।'

আগের ভাড়াটেও কোত্থেকে গানের যন্তরপাতি এনে হাজির করেছিল। অশ্রুমামা বলেছিলেন, 'অপ্রীতিকর কিছু করতে চাই না; অন্য বাড়ি দেখে উঠে যান।' অশ্রুমামার মেজাজ তারা জানে, তাই সুড়সুড় করে পালাবার পথ পায়নি।

'এরা তো এখনও আমার অশ্রুর রাগ দেখেনি। দেখলে বুঝবে। সে একেবারে পরশুরামের রাগ,' দিত্নু আমাকে বললেন। তারপর আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'যা বাছা, একটু বলে আয় ওই ধিঙ্গি মেয়েকে।'

উপরে গিয়ে দেখি, মীরামাসি গ্রামোফোনের হাতল ঘোরাচ্ছেন। আমাকে বললেন, 'গান শোন। কে. এল, সায়গলের গলা—ওয়াণ্ডারফুল!'

আমি বললাম, 'দিত্নু এখনই গান বন্ধ করতে বললে। মামা শুনলে রসাতল করবে।'

আমার কথায় কান না দিয়ে মীরামাসি নিজের মনেই দম দিয়ে চললেন। তখন আমি বললাম, 'অশ্রুমামার এই বাড়িতে গান গাওয়ার নিয়ম নেই।'

'কোন্ আইনে?' মীরামাসি ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলেন। 'গায়ের জোরে গান বন্ধ করা যায় না। চোখ রাঙিয়ে আমাকে কেউ দমাতে পারবে না।'

মীরামাসিদের এখান থেকে উঠে যেতে হয়, তা আমি মোটেই চাই না। তাই হাত দুটো ধরে বললাম, 'লক্ষীটি বন্ধ কর, নইলে আগেকার ভাড়াটের মতো তোমাদেরও উঠে যেতে হবে।'

মীরামাসি এবার সত্যিই রেগে উঠলেন। 'বটে? তোকে দূত পাঠিয়েছে। উঠিয়ে দেবার ভয়! যতদিন বাপি ভাড়া দেয়, দেখি কে আমাদের এখান থেকে তোলে!'

মীরামাসির মা ছুটে এলেন। 'ছিঃ, অমন চিৎকার করছিস কেন?'

আমি উঠে চলে এলাম। ভাগ্যে অশ্রুমামা বম্বে থেকে ফেরেনি এখনও। না হলে কী যে হতো। হয়তো রক্তারক্তিই বেধে যেত। রাগ চড়ে গেলে অশ্রুমামার রক্তে বহুদিনের পুরনো জমিদারটা যেন জেগে ওঠে। মুক্তোমামার পড়ার সময় পাশের বস্তিতে চিৎকার করে গাইবার জন্যে একজনকে ঠাস করে চড় মেরেছিলেন। বাড়িওয়ালাকে বলে অশ্রুমামা তাকে পাড়াছাড়া করিয়েছিলেন।

দিদুরই যেন যত ভয়। 'কী থেকে কি হয় কিছুই ঠিক নেই। একি বিপদ ডেকে আনলে ঠাকুর!'

তারপর হারমোনিয়ামও এসে গিয়েছে। আমাদের বাড়ি থেকে বসে বসে সভয়ে শুনেছি মীরামাসি গাইছে—মরি মরি ওগো সুন্দর।

অশ্রুমামার ঘরে এসে দেখি, ভয়াবহ স্তব্ধতা—দিদু পাথরের মতো চুপচাপ শুয়ে আছেন। ওই দিনই অশ্রুমামার আসার কথা। দিদু নিজেই এবার ওপরে উঠে গেলেন। নেমে এলেন একটু পরেই ; আমাকে কিছু বললেন না।

আরও খানিকক্ষণ পরে গান বন্ধ হয়ে গেল। মাত্র দশ মিনিটও হয়নি ; এর মধ্যে গান বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ; মীরামাসিও ছাদে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন, 'ভদ্রমহিলা হাতটা জড়িয়ে ধরলেন বলে কিছু করা গেল না। মিনতি করে বললেন, লক্ষ্মী মা আমার, একটা অনুরোধ রাখ। অশ্রু আজ জ্বলে পুড়ে বম্বে থেকে আসছে। আজকের দিনটার জন্যে আমাকে রক্ষে কর।'

আমি মীরামাসির মুখের দিকে তাকালাম। মীরামাসি বললেন, 'একে বলে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি। তবে আবার লড়াই আরম্ভ হবে। আমার গোঁ যখন চেপেছে—তখন দরকার হলে অর্কেস্ট্রা পার্টি নিয়ে আসবো। সঙ্গে নাচও প্র্যাকটিশ করবো।'

শেষ চেষ্টা করে বললাম, 'গান গাওয়া যে খারাপ মাসি। ওই জন্যেই তো আমাদের হারু ফেল করলে।'

মীরামাসি বললেন, 'খারাপই যদি হবে, তবে রবিঠাকুর কেন গান গাইতেন ?'

সত্যিই তো, রবীন্দ্রনাথের কথা তো আমার মাথায় আসেনি। এর কোনো উত্তর নেই। হয়তো অশ্রুমামাকে এবার বোঝানো যাবে। আর অশ্রুমামা একবার বুঝলে গানে আপত্তি করবেন না।

অশ্রুমামা তখন নিজের ঘরে বসে মুক্তোমামার সঙ্গে ইংরিজীতে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। ইংরিজীতে তিনি-বললেন, 'কথা আটকে যাচ্ছে কেন ? আমাকে

তোমার দাদা ভেবো না, ভাবো আমি মিলটন সায়েব, হাণ্ট্‌লি বিস্কুট অ্যাণ্ড লজেন্স লিমিটেডের ইণ্ডিয়া ব্রাঞ্চের ম্যানেজার, আর তুমি অশ্রু মিট্‌রা—তার পিএ।'

মুক্তোমামা চুপ করে রইলেন। অশ্রুমামা বললেন, 'কতদিন বলেছি, বাংলায় ভেবে ইংরিজীতে ট্রানশ্লেসন করে কথা বলবার অভ্যাস ছাড়তে হবে। ইংরিজীতে ভেবে, ইংরিজীতে কথা বলতে হবে।'

আরও কিছুক্ষণ কথা হলো ওঁদের মধ্যে। তারপর মুক্তোমামা বললেন, 'আমার ইউনিভার্সিটির পড়া আছে।'

অশ্রুমামা বললেন, 'ঠিক আছে। তবে জেনে রেখো, বই-পড়া বিদ্যেয় লাইফে বিশেষ লাভ হয় না। আসলে ফড়ফড় করে ইংরিজী বলার অভ্যেসটাই ইমপর্টান্ট—এটা কিন্তু আমার নিজের কথা নয়, খোদ মিলটন সায়েব বলেছেন।'

অশ্রুমামা এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন। আমার সঙ্গে ইংরিজীর বালাই নেই। আমার কাছে তিনি যেন সত্যিই ছেলেমানুষ হয়ে যান। সুযোগ বুঝে রবীন্দ্রনাথের কথা তুললাম।

গানের ব্যাপারে দিদুর কাছ থেকে কিছু কিছু কথা তাঁর কানে গেছে মনে হলো। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজও পেয়েছেন, গানও গেয়েছেন। নোবেল প্রাইজ পেয়ে গান কেন, তুমি রাস্তার ধুলোতে গড়াগড়ি গেলেও কিছু বলবো না। ইন ফ্যাক্ট, মিলটন সায়েবও রবিঠাকুরের হাই থটের প্রশংসা করেন। ওই সব হাই চিন্তা করে, কেউ যদি গান লেখে আমি তার পা ধুয়ে জল খাবো। তা বলে বাঈজীদের আমি ঠাকুরঘরে এনে পুজো করতে পারবো না। ভদ্রঘরের মেয়েদের গান গাইতে দিলে আর দেখতে হবে না. বেনোজল ঢুকলে রক্ষে নেই।'

অশ্রুমামা কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন। তারপর বললেন, 'সব শিক্ষার দোষ। মুক্তোকে তাই আমি সব দিক দিয়ে আইডিয়াল শিক্ষা দিচ্ছি। ইণ্ডিয়ান ছেলেদের যেমন হওয়া উচিত, যা আমার হবার ইচ্ছে ছিল, অথচ পয়সার অভাবে হয়নি, তাই আমি মুক্তোর মধ্য দিয়ে চেষ্টা করছি। এ সম্বন্ধে বম্বেতে মিলটন সায়েবের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। মিলটন সায়েবও আমাদের আদর্শের ভক্ত। উনি বলেন, মেয়ে বলতে তোমরা ভাবো মাদারের কথা; আর আমাদের কাছে মেয়েমানুষ মানে ওয়াইফ। আমাদের মেয়েরা ওয়াইফ হবার জন্যে নাচে-কোঁদে, গান গায়, মদ খায়, পার্টিতে যায়। আর তোমাদের মেয়েরা মাদার হবার জন্যে ছোটবেলা থেকে পুজো-আচ্ছা করে, রান্না শেখে, উপোস করে।'

মিলটন সায়েবের আরও কথা শোনবার জন্যে অশ্রুমামার কাছে এগিয়ে এলাম। অশ্রুমামা বললেন, 'এখনও কাউকে বলো না। মিলটন সাহেব মুক্তোর বিলেতে গিয়ে থাকবার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তার জন্যে যদি আমাকে ঘড়ি-আংটি-বোতাম সব বিক্রি করতে হয়, তাও করবো। মুক্তোকে শুধু আমার ভাই ভেবো না—মুক্তোর মধ্যে আমি একটা আইডিয়াল ম্যান তৈরি করছি। সেখানে আমি মরিয়া। মুক্তো যখন পড়বে, বা তুমি যখন পড়বে তখন কেউ প্যাঁপোঁ করে হারমোনিয়াম ধরবে, আর আমি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবো, সে হবে না।'

অশ্রুমামা যেন স্বপ্নের চলচ্চিত্র দেখছেন। 'মুক্তোর কোনো ব্যাপারে কোনো ত্রুটি রাখছি না। ও যখন মানুষ হবে, তখন অফিসের লোককে বলতেই হবে—মিট্‌রা বে করেনি, কিন্তু একখানা ভাই মানুষ করেছে বটে। মুক্তোর পরেই, তোমাকে ধরবো। আমি যা-যা বলে যাই—তা

চোখ-কান বুজে করে যাবে। অন্য কোনো বদ পাল্লায় পড়বে না।'

অশ্রুমামার মুখ দেখে সত্যিই আমার ভয় হয়েছিল। আইনতঃ গান বন্ধ করবার কোনো অধিকার তাঁর নেই ; কিন্তু সেই কথা ভেবে তিনি নিশ্চুপ হয়ে থাকবেন না। হয়তো একটা কেলেঙ্কারি হবে।

দিতুর সঙ্গেও কথা হয়েছে। বললেন, 'ওর বাপকে বললাম। কিন্তু মেয়ে তাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। বললে, "সবই বুঝছি। কিন্তু যা অভিমানিনী মেয়ে আমার! যদি আপনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু করতে পারেন।" মুয়ে আগুন, তার মানে আমাকে গিয়ে মেয়ের পায়ে ধরতে হবে। দোষও করবি আবার চোখও রাঙাবি।'

মুক্তোমামার সঙ্গে এ নিয়ে আমার কোনো কথা হয়নি। তিনি চুপচাপ বসে দিতুর কথা শুনে যান, আর বইয়ের পাতা ওল্টান। মুখে যতই বলুন, দিতু আবার মীরামাসির হাতে-পায়ে ধরতে গিয়েছেন : 'যদি গাইতেই হয়, দুপুরবেলা গেয়ো মা। অশ্রু যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ নয়।"

'দুপুরবেলায় তো আমি কলেজে যাই।' মীরামাসি বলেছেন।

আমার সঙ্গে যখন ছাদে দেখা হয়েছে, তখন মীরামাসি বলেছেন, 'আমরা ওপর নীচে লড়ছি—তুই কেন ভয়ে জড়সড় হয়ে রয়েছিস? এখন থেকে আমার নাম হাসি—অশ্রুর ঠিক উল্টো। ওরা যদি উত্তর মেরু হয়, তাহলে আমি দক্ষিণ মেরু। ওরা যদি ইংরেজ হয়, তাহলে আমি জার্মান। ওরা মোহনবাগান, আমি ইস্টবেঙ্গল। অশ্রুবাবুর মাকে কথা দিয়েছি—পনেরো দিনের মধ্যে কিছু করবো না।'

আমি বলেছি, 'লক্ষ্মীটি, মিটিয়ে নাও। তোমাকে ইস্কুল

থেকে অনেক গল্পের বই এনে দেবো। তোমার ওখানে বসে গল্প করতে আমার যে খুব ভাল লাগে।'

মীরামাসি আমাকে ভুল বুঝলেন, 'ও, অশ্রুমামার ভয়ে এখন বুঝি তোর আমার এখানে আসবার সাহস নেই। তুই বুঝি পুরোপুরি ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছিস? তোর সঙ্গে কোনোদিন কথা বলবো না। যদি বলি, তাহলে আমি যেন কালিঘাটের কুকুর হই।'

'মীরামাসি, মীরামাসি, একি বললে তুমি!' আমি ডাকলাম, কিন্তু কোনো সাড়া না দিয়েই তিনি দ্রুত ছাদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

এতোদিন পরে ভাবতে আজও আশ্চর্য লাগে, মীরামাসির প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়েছিল। আমার সঙ্গে তারপর আর কোনোদিনই তাঁর কথা হয়নি। আমি প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাদে দাঁড়িয়ে থেকেছি। কিন্তু মীরামাসি আসেননি।

অগত্যা দিদুর কাছে গিয়ে চুপচাপ বসে থেকেছি, আর প্রতিদিন দিদুর মুখে সেই পুরনো কথা শুনেছি—'যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে।'

পড়া শেষ করে দিদু বলেছেন—'আজ আমি মঙ্গলচণ্ডীর পুজো দিতে যাবো। মেয়েটা আর কথা রাখবে না বলে দিয়েছে। এবার বিকেলবেলায় অশ্রু অফিস থেকে ফিরলেই গান ধরবে। বারুদের গাদায় বসে আছি, বন। একটা দেশলাই কাঠি পড়বার অপেক্ষা।'

কিন্তু সেই ভয়াবহ মুহূর্ত বোধহয় অনাগতই রয়ে গেল। মীরামাসি ও মুক্তোমামা প্রায় একই সঙ্গে কলেজ থেকে ফিরলেন। অশ্রুমামাও ফিরে এলেন। আশেপাশের ছেলেরা

চিৎকার করে বই পড়া শুরু করলো। মুক্তোমামাও তাঁর মোটামোটা ইংরিজী বইগুলো নিয়ে বসেছেন। কিন্তু কই? মীরামাসির গান তো শুরু হলো না।

দিহু বললেন, 'কী জানি বাপু ; হয়তো ছুঁড়ি অন্য কোনো মতলব পাকাচ্ছে।' একবার দিহুর ইচ্ছে হয়েছে উপরে গিয়ে খোঁজ করে আসেন, কিন্তু সাহস করেননি।

উৎকণ্ঠার কিন্তু শেষ নেই। বিস্ফোরণের আশঙ্কায় আরও কিছুদিন কাটলো। কিন্তু কোথার বিস্ফোরণ? বরং যা ঘটলো তার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না।

একদিন ইস্কুল থেকে এসে শুনলাম, মীরামাসিরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই একপক্ষ রণে ভঙ্গ দিল।

মীরামাসি যাবার আগেও আমার সঙ্গে একটা কথা বলে গেলেন না। কিন্তু মীরামাসি যেশেষপর্যন্তএইভাবে ভয় পাবেন, এইভাবে পরাজয় স্বীকার করবেন তা আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনি। মনে মনে মীরামাসিকে একটু ছোটও করে ফেলেছি। কিন্তু তখনও যে সবটা জানা হয়নি, তা কেমন করে বুঝবো?

অশ্রুমামা বলেছিলেন, 'আপদ বিদেয় হয়েছে। ঘর খালি পড়ে থাক, আর ভাড়া দিচ্ছি না। মুক্তো পাস করুক, পড়াশোনার পাট চুকুক, তারপর যা হয় হবে।'

আমি কেবল মীরামাসিদের শূন্য ঘর তিনখানার দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হতো এই বুঝি মীরামাসি বিকেলে ছাদে বসে থাকতাম, মনে হতো এই বুঝি মীরামাসী উঠে আসবেন। কিন্তু কোথায় মীরামাসি?

এ-দিকের রণাঙ্গনও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দিহু কয়েকদিন জয়ের আস্ফালন দেখাতে মায়ের কাছে এসেছিলেন। 'অশ্রুকে ভয় না করে উপায় আছে! প্রথমে তো খুব তড়পেছিল।'

তারপর চুপচাপ। আমিও দিতুদের বাসায় যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলাম। আমার তখন কিছুই ভাল লাগতো না। সব কিছু এড়িয়ে একলা থাকতে ইচ্ছে করতো তখন। নিজের অজান্তে একবার বড্ড জড়িয়ে পড়েছিলাম, আর সেই ভুল করবো না।

কিন্তু আবার বিস্ফোরণ হলো। কে যেন একটা টাইম বোমা অশ্রুমামার বাড়িতে গোপনে রেখে গিয়েছিল, এতোদিন পরে ঠিক সময়মতো বিস্ফোরণ হলো। পড়তে বসেছিলাম। হঠাৎ অশ্রুমামার গর্জন শুনলাম, 'গেট আউট! গেট আউট ইডিয়ট! এই মুহূর্তে তুমি দূর হও!

মুক্তোমামারও গলার স্বর শোনা গেল—'দাদা, তোমার পায়ে পড়ি! তুমি ভুল বুঝো না!

'সার্টেনলি নট্। গেট আউট। তোমাকে দারোয়ান দিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া উচিত।'

দিতুর কান্নার স্বরও শুনতে পেলাম। 'ও অশ্রু, বাবা আমার, একটু শান্ত হ'। বেস্পতিবারের বারবেলা। আমার যে বুক ধড়ফড় করছে, বাবা।'

'যাও যাও, জেনেশুনে আর ন্যাকা সেজো না,' অশ্রুমামা দিতুকে বললেন।

আমার একবার যেতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সাহস হলো না। ছাদ থেকে দেখলাম, মুক্তোমামা একবস্ত্রে বেরিয়ে গেলেন। বেরোবার সময় আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে মুক্তোমামা হাসলেন, আমাকে ইঙ্গিতে বললেন, 'এখন আসি।'

বাড়িতে শুনলাম, মা ফিসফিস করে কাকে বলছেন, 'ভিতরে ভিতরে যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয়েছে কে জানতো? মুক্তো নাকি মীরাকে লুকিয়ে বিয়ে করেছে। সত্যি বলতে কি, দুজনকে কথা বলতেও দেখিনি কখনো।

এখন শুনছি, কলেজে যাওয়ার সময় এবং ফেরবার পথে ওদের দু'জনের প্রায়ই দেখা হতো।'

যিনি শুনছিলেন তাঁরও যেন চোখ খুলে যাচ্ছে। বললেন, 'তাই বলি। বলা নেই কওয়া নেই কেমন হার মেনে নিয়ে মীরারা সুড়সুড় করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। অথচ যা গোঁয়ার মেয়ে, তার অমন কিল খেয়ে কিল হজম করবার কথা নয়।'

সাজানো বাগান যেন সত্যিই শুকিয়ে গেল। সব সুখ বিসর্জন দিয়ে, নিজের বাগানে পরম যত্নে অশ্রুমামা যেন মাত্র একটা ফুলগাছের চারাই মানুষ করছিলেন! কিন্তু চারিদিকে বেড়া দিয়েও তাকে গাছ-থেকো গরুর হাত থেকে রক্ষে করতে পারলেন না। অশ্রুমামার দিকে তাকাতে ভয় করছে। এতোদিন ধরে বহু আদর ও যত্নে যাকে গড়ে তুলেছিলেন, তাকেই যেন এই মুহূর্তে নিজের হাতে গুলি করে খুন করেছেন তিনি। নিজের মনে, অন্ধকার ঘরে তিনি পায়চারি করছেন। আর ও-ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দিদু কাঁদছেন। কোনো কথা নেই অশ্রুমামার মুখে।

দিদু কান্নার মধ্যেই বললেন, 'কেন তুই ওকে তাড়ালি? ওকে তাড়াবার তুই কে? ওর বাপ নেই বলেই না তো তোর এতো সাহস হল।'

উত্তেজনায় অশ্রুমামার দেহ তখনও মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার দিকে একবার তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'সায়েবের পেটপুজো হয়েছে তো?' তারপর তিনি নিজের মধ্যেই নিজে ডুবে গেলেন।

যে অশ্রুমামা পঁচিশ বছর চাকরিতে কোনোদিনই কামাই করেননি, তিনি আপিসেও গেলেন না। একদিন, দু'দিন

করে তিন দিন কেটে গেল। তারপর যে মিলটন সায়েব উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেই অশ্রুমামার খোঁজে আসবেন তা কল্পনাও করিনি। মিলটন সায়েবের কত গল্প শুনেছি; আমি নিজেই রাতের পর রাত মিলটন সায়েবের গল্প বলে যেতে পারি, কিন্তু এই তাঁকে দেখলাম। এর আগে খেলার মাঠ ছাড়া আর কোথাও সায়েবও দেখিনি। কী সুন্দর চেহারা তাঁর। আর কী লম্বা। চুলে টেরি কাটেননি মিলটন সায়েব—কিন্তু জুলপি দুটো কী বড়ো, গালের অর্ধেক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মিলটন সায়েবের গোঁফটাও ফাস্টক্লাস—বড় হয়ে আমিও ওই রকম গোঁফ রাখবো।

দিদু ইতিমধ্যে বরং একটু সামলে উঠেছেন। মিলটন সায়েব প্রথমে তাঁর সঙ্গে গিয়েই দেখা করলেন। হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। দিদুও গলায় আঁচল দিয়ে সায়েবকে দূর থেকে নমস্কার করলেন। তাবপর কাঁদতে কাঁদতে বাংলায় বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে; অশ্রুকে আপনি খেতে বলুন।'

মিলটন সায়েব অশ্রুর ঘরে ঢুকতে ম্লান হেসে মামা বললেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

উত্তরে সাহেব বললেন, 'তুমি অফিসে না গেলে কী করে আমি ভাল থাকতে পারি অশ্‌রু?'

অশ্রুমামা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিলটন সায়েব বললেন, 'আমি বড় হাঙ্‌রি ফিল করছি। তোমাদের বাড়িতে যা আছে তাই খাবো।'

দিদু এই সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি দুটো ডিশে খাবার এনে হাজির করলেন। ছুরি-কাঁটা কিছুই ছিল না, শুধু একটা চামচ দিয়েছিলেন দিদু। সায়েব তাও ব্যবহার না করে হাত দিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। বললেন, 'অশ্‌রু

আমি কোনো আপত্তি শুনতে চাই না; তোমাকেও খেতে হবে।'

নিরুপায় অশ্রুমামা খাওয়া শুরু করলেন। সায়েব খেতে খেতেই বললেন, 'আমি সব শুনেছি। দোষ তোমাদের নয়। দোষ ইওরোপীয়ানদেরই। আমাদের কাছেই তোমাদের ইয়ংম্যানরা মেয়েদের মাদার হিসেবে না দেখে ওয়াইফ হিসেবে দেখতে শিখেছে।'

আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল সায়েবকে মোহনবাগানের কথা জিজ্ঞাসা করি। কথা উঠলে হয়তো বলেই ফেলতাম, 'আমি জানি, আপনি লুকিয়ে মোহনবাগানকে সাপোর্ট করেন। ইস্টবেঙ্গলকে আপনি একদম দেখতে পারেন না।

কিন্তু তার আগেই দিদু এসে ঘরে ঢুকলেন। দিদু ইতিমধ্যে আলমারি খুলে সেই বহুদিনের পুরনো চায়ের কাপ নামিয়ে ফেলেছেন। দিদু বললেন, 'সায়েবকে জিজ্ঞাসা কর চা খাবেন তো?'

'টী? টিটোটালারের বাড়িতে টী! কখনই নয়।' মিলটন সায়েব তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

অশ্রুমামা তখনও বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মিলটন সায়েব বললেন, 'কাল থেকে তোমাকে অফিসে যেতে হবে।' অশ্রুমামার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে মিলটন সায়েব বললেন, 'কী ভাবছো?'

'হ্যাভ্ আই ডান দি রাইট থিং?' অশ্রুমামা কোনো-রকমে ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলেন।

'তোমার অন্তর যখন বলছে তুমি ঠিক করেছো, তখন নিশ্চয়ই তুমি ঠিক করেছো। টীটোটালার ইন দি রাইট সেন্স যদি পৃথিবীতে কেউ থাকে, সে তুমি। পিওরকে যারা

পিউরিটান বলে উড়িয়ে দিতে চায় আমি তাদের দলে নেই। তুমি একটা গ্রেট এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলে—তোমার হোল্ লাইফের সেই গবেষণা যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য সব রকম স্টেপ নেবার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে। আমি পুরোপুরি তোমার দলে।'

মিলটন সাহেব সেদিনকার মত বিদায় নিয়েছিলেন। অশ্রুমামাও পরের দিন থেকে আবার আপিস যাওয়া শুরু করেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, 'দেখলে তো, একটা সায়েবও বললে চা খাওয়া জিনিসটা কোনোরকমেই ভাল নয়।'

কিন্তু অশ্রুমামা এবং দিত্বর পক্ষে এই বাড়িতে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। দিত্বর শরীরটা বেশ ভেঙে পড়েছে। আমাকে বলেছেন, 'ওদের খবর শুনেছিস কিছু?'

মা র কাছে শুনেছি, মুক্তোমামা শ্যামপুকুরের দিকে একটা ছোট্ট কুটরি ভাড়া করেছেন। কোথায় একটা মাস্টারি জোগাড় করেছেন। মীরামাসিরও তেজ আছে—বাপির কাছ থেকে কিছু নেননি। কিন্তু সেসব কথা দিত্বকে বলিনি।

অশ্রুমামা ও দিত্বও একদিন বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথায় উঠে গেলেন।

আমার ক্ষমতা ছিল না ভাই। থাকলে আমিও সেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতাম। ওই বাড়িটার দিকে তাকালে আমার চোখদুটো সজল হয়ে উঠতো। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি মীরামাসি, অশ্রুমামা, মুক্তোমামা সবাই এখনও ওই বাড়িতে রয়েছেন। আমার সঙ্গে সবাই গল্প করছেন। কিন্তু যখন ঘুম ভেঙে গিয়েছে, তখন চোখ দিয়ে জল বেরোতে শুরু করেছে।

তারপরও কতদিন কেটে গিয়েছে এবং এই এতোদিন পরে গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে অশ্রুমামাকে আবিষ্কার করে

আমি যেন আবার সেই হারিয়ে-যাওয়া নগরীকে খুঁড়ে বার করতে আরম্ভ করেছি।

কিন্তু অশ্রুমামাকে কেমন করে গানের দোকানে দেখবো? নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি আমি। অশ্রুমামার হাত ধরে মেয়েটি আমার সামনে দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল। অশ্রুমামা আমাকে দেখে চিনতে পারলেন না। অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছেন মামা।

আমি আর পারলাম না। ডাকলাম, 'অশ্রুমামা!'

'স্যাংকে সায়েব না?' অশ্রুমামা চমকে মুখ ফেরালেন। 'কত বড় হয়ে গিয়েছো তুমি?' অশ্রুমামা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। 'বাবা কেমন আছেন? মা কেমন আছেন?'

'বাবা তো অনেকদিন গত হয়েছেন! মা ভাল আছেন।'

অশ্রুমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'একে চিনতে পারছো?'

'চিনতে পারছি না। কিন্তু মুখের মধ্যে কার যেন আশ্চর্য ছবি রয়েছে।' আমি বললাম।

অশ্রুমামা এবার যেন কেমন হয়ে গেলেন। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার মা-মণি সুরঙ্গমা মিত্র! গান গান করে পাগল। রেডিয়োতেও গায়।'

এবার আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে হাঁটছি আমরা। আমরা দুজন পিছিয়ে রয়েছি, সুরঙ্গমা একটু এগিয়ে গিয়েছে। অশ্রুমামার দেহ বার্ধক্যে একটু নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সামান্য কুঁজো হয়ে গিয়েছেন তিনি। বললেন, 'চিনতে পারলে না? মুক্তোর মেয়ে।'

মুক্তোমামা-মীরামাসির মেয়ে কেমন করে আবার অশ্রুমামার কাছে এল? বুঝতে পারছি না কিছুই। মামা বললেন, 'আমার কাছেই থাকে এরা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মুক্তোমামা কেমন আছেন ?'

অশ্রুমামাকে যেন কোনো ভয়াবহ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ফেলেছি। তাঁর শরীরটা যেন একবার কেঁপে উঠলো, চোখ দুটো ছল ছল করছে।

আমার হাতটা পুরনো দিনের মতো করে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মুক্তো ? সে তো সুরঙ্গমার জন্মের আগেই আমাদের চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

'এঁ্যা' !'

'বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরে, ওরা দু'জন একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কথা বলিনি, তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারপর নাকি, মুক্তো দিনরাত কী-সব ভাবতো। জ্বরের ঘোরে আমার কথা প্রায় বলতো। তবু কেউ আমাকে খবর দেয়নি। জানো, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর, নিজের বাসাতে ওরা কোনোদিন চা ঢুকতে দেয়নি। মুক্তোর বউ কখনও ভুলেও গান গায়নি। লোকে বিশ্বাস করতে চায় না ; কিন্তু ও বলতো, আমার দাদা যা চান না, যা ভালবাসেন না, তা আমরা কিছুতেই করবো না। মীরাকেও বলে গিয়েছিল, দাদা ছাড়া কিন্তু আমার কেউ নেই। আমি না থাকলে দাদাই তোমার ভরসা।'

আমাদের কথার মধ্যেই মুক্তোমামার মেয়ে আরও একটু এগিয়ে গিয়েছিল। বেণী দুলিয়ে সে আবার পিছনে ফিরে এল। এবার সে যা বললে, তার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সে বললে, 'আপনি মাকেও চেনেন বুঝি ? কী মজা ! মাকে আজই গিয়ে বলবো।'

'কম বয়সে তোমার মা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছেন', আমি শান্ত অথচ সহজ ভাবে বললাম।

উচ্ছল হয়ে উঠলো সুরঙ্গমা। বললে, 'মা-মণি বুঝি খুব

তুষ্টু ছিল ? দাঁড়াও, আজ গিয়ে খুব বকে দেবো। তোমারও দোষ আছে জেঠু, আমাকে আগে বলে দাওনি কেন ?'

বিষণ্ণ জেঠু হাসলেন। সুরঙ্গমা বললে, 'জেঠু, চলো না, কোনো একটা চায়ের দোকানে বসে গল্প শুনি।'

চায়ের দোকান ! চমকে উঠে, আমি অশ্রুমামার কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলাম : কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে অশ্রুমামা বললেন, 'সেই ভাল, চল কোথাও গিয়ে একটু বসি।'

আমার বিস্মিত মুখের দিকে না তাকিয়েই, অশ্রুমামা নিজের মনে বললেন, 'মিলটন সায়েবকে সব বলেছিলাম। সমস্ত কথা শুনে মিলটন সায়েবই বলেছিলেন—অশ্রু, তুমি তোমার ব্রাদারকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলে, তাকে স্বাধীনতা দাওনি ; এবার আর একটা এক্সপেরিমেণ্ট করো—ব্রাদারের মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়ে দেখো কি হয়।'

ওঁদের সঙ্গে চায়ের দোকানে ঢুকিনি আমি। ধর্মতলা ও মতিশীল স্ট্রীটের মোড়ে নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আমি কেবল টিটোটালার অশ্রুমামাকে সুরঙ্গমার হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলাম।

বাণিজ্যিক

কিছুদিন আগে একটা নতুন বিষয়ে বই লেখবার আগ্রহ হয়েছিল। সেই সময়েই নিচের এই চিঠিটা আমার হস্তগত হয়। বইটা আজও লেখা হয়ে ওঠেনি। আদৌ কোনোদিন লিখবো কিনা; কিংবা লিখলেও কোনোদিন প্রকাশ করবো কিনা এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। স্বর্ণলতা সেনের চিঠিটা আমি মাঝে মাঝে পড়ে থাকি। আপনারা পড়ুন, পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। বলাবাহুল্য স্বর্ণলতা সেন নামটা কাল্পনিক।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শংকরবাবু, পত্রলেখিকার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। গত রাত্রের ব্যাপারটার জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত। অনুগ্রহ করে হাবুলবাবুকে কিছু বলবেন না, এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ।

কবে আবার আপনি আসছেন জানি না; তখন সাক্ষাতেই প্রশ্ন করবো ভেবেছিলাম। কিন্তু কেন জানি না দেরি সইছে না। তাই সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করছি, কল গার্লদের জীবন অবলম্বন করে বই লেখবার যে পরিকল্পনা আপনি গ্রহণ করেছেন, তার কোনো পরিবর্তন সম্ভব কিনা।

আপনার দু'একখানা বই সম্বন্ধে যা আলোচনা শুনেছি, তাতে বুঝেছি নতুন নতুন বিষয় নিয়ে লিখতে ভালবাসেন আপনি। এমন সব জগতের কথা আপনি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চান যার খবর এখনও পাঠকদের অজ্ঞাত অথবা স্বল্পজ্ঞাত। শুনলাম বাংলা সাহিত্যের অনেক পাঠক পাঠিকা এই ধরনের গল্প পড়তে খুব ভালবাসেন। সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমানা বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও নগদ লাভ হয়।

আপনি হয়তো আমার বাংলা দেখে একটু অবাক হচ্ছেন; কিন্তু আমিও একদিন ইস্কুলে পড়াশোনা করেছি; ভাল রচনা

লিখতে পারতাম, গান জানতাম একটু-আধটু,সঞ্চয়িতার অনেক কবিতাও আমার মুখস্থ ছিল। এখন সে-সব ভুলে গিয়েছি। কিন্তু ইংরিজীতে কথা বলা অভ্যাস করেছি ; যাকে আপনারা টেলিফোন-আদব বলেন তাতে আমি বেশ অভ্যস্ত।

সুতরাং এখন যা করছি, তা যদি আপনাদের চেষ্টায় উঠেও যায়, তাহলে কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি জুটেও যেতে পারে। কিন্তু এ-সব ব্যক্তিগত কথার অবতারণা করে আমি আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করতে চাই না। সত্যিকথা বলতে কি, আমার কাছেও সময় অমূল্য না হলেও মূল্যবান।

একটু পরেই আমরা একদল অতিথি আশা করছি—এর মধ্যে বিদেশীও আছেন। এঁরা অবশ্য হাবুলবাবুর মাধ্যমে আসছেন না—বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পেরে এঁরা ফোন করেছিলেন। সুতবাং আজকের রোজগারের মধ্যে কমিশন বাদ যাবার কোনো প্রশ্ন নেই। আমার এবং আমার বান্ধবী মিতালি দাস, চম্পা চ্যাটার্জি, লীলা সালভি, ফুলবন্ত চোপরা, ডরোথি রে এবং আরও কয়েকজন, যাদের আপনি চেনেন না, সবাইয়ের কিছু বেশী লাভ হবে।

কিন্তু তা বলে যে হাবুলবাবুকে আমরা অসন্তুষ্ট করতে চাই তা নয়। আমাদেব এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পিছনে তাঁর এবং তাঁর মতো আরও কয়েকজনের যথেষ্ট দান আছে। তাঁদেরই অনুগ্রহে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে অনেক প্রখ্যাতদের পদধূলি পড়েছে। আর তাছাড়া হাবুলবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো আজকের নয়।

যা বলছিলাম, পরিচিত অপরিচিত বহুজনই হয়তো আপনার ভাবী গ্রন্থের বিষয়টির প্রশংসা করবেন। সি-জি বা কল-গার্ল সম্বন্ধে সবারই কৌতূহল। দেশবিদেশের বিনোদিনী বালিকাদের খবর আজকাল কে না আগ্রহ নিয়ে পড়ে? দৈনিক

পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকায় সবিস্তারে খবর বেরোয়—ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় শহরে এখন বিনোদিনী কুলের অভিজাত বালিকাদের প্রবল প্রতাপ। বিগ বিজ্‌নেসের সঙ্গে এই সব রমনীয় রমনীদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। টেলিফোন-যোগে এঁদের ডেকে পাঠানো যায়; অথবা সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করা চলতে পারে। এঁদের ঐন্দ্রজালিক কটাক্ষে পারচেজ অফিসারের পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়; এবং বিগলিত করুণা মোটা অঙ্কের অর্ডারের রূপ ধারণ করে বিক্রেতা কোম্পানির ব্যবসায়-মরুভূমিকে শ্যামল সজীব করে তোলে।

আর শুধু তাই বা কেন? প্রখ্যাত রেলওয়ে কোম্পানি ট্রেনযাত্রী আকৃষ্ট করবার জন্য ভ্রমণসঙ্গিনী সরবরাহের লোভ দেখিয়ে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। এ-বিষয়ে কাটিং নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে।

এঁরা বলেন, দীর্ঘপথে একলা ভ্রমণ করতে আপনার এক-ঘেঁয়ে আলুনো লাগতে পারে। রেলের কাউণ্টারে বলুন: 'ভ্রমণসঙ্গিনী চাই'। তাঁরা সাদরে আপনাকে তালিকাভুক্ত সঙ্গিনীদের ফটো অ্যালবাম দেখাবেন। আপনি পছন্দ অনুসারে তিনটি ছবির নম্বর বলুন। এঁদের প্রত্যেককেই ফোনে পাওয়া যায়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে।

প্রথমজনের যদি অসুবিধে হয়, দ্বিতীয়জন আছে; সেখানেও সফল না হলে তৃতীয়জনকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। ঠকবার সম্ভাবনা নেই—কারণ সঙ্গদানের পারিশ্রমিকের হার ঠিক করা আছে; কণ্ট্রোলদরেই পেয়ে যাবেন। রেল কোম্পানি দালালির জন্য কমিশন নেন না—দু'খানা টিকিট বিক্রি করতে পেরেই তাঁরা খুশী। যাত্রীও ডবল টিকিট কেটে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন; সঙ্গিনী যথাসময়েই ট্রেনের 'কুপে'-তে হাজির হবেন।

কেবল ট্রেনযাত্রা নয়; রাজনীতির তীর্থযাত্রায় বিনোদিনী

বালিকাদের প্রতিপত্তির কথা বৃটেনের সেই মৃত অস্থি-বিশারদ ভদ্রলোকটির অনুগ্রহে স্কুলের ছাত্র থেকে পঁচাত্তর বছরের পেন্সনভোগী বৃদ্ধ পর্যন্ত কার অজ্ঞাত ?

কাগজে উঁচুতলার অনেক নিচু কথা বেরিয়েছে। কিন্তু তাতে কৌতূহলের নিরসন তো দূরের কথা, চাহিদা আরও বাড়ছে। সুতরাং নতুন লেখার বিষয় নির্বাচনে আপনি যথেষ্ট বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনি ঠিকই বুঝেছেন, সাগরের ওপারে যেসব দেশ আছে শুধু সেখানকার কাহিনী শুনেই মানুষের মন সন্তুষ্ট হতে চাইছে না। তারা নিজেদের এই শহরের খবর জানতে আগ্রহী।

আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত জনৈক উচ্চ-পদস্থ ভদ্রলোক সেদিন আপনাকে যা বলেছিলেন হাবুলবাবুর মুখে তা শুনে খুব মজা পেয়েছি। চা খেতে খেতে তিনি আপনার সঙ্গে গল্প করছিলেন। তাঁর হাতে বিদেশ থেকে প্রকাশিত একখানা 'পড়্য-পকেটে-সদ্যখুন' মার্কা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ভদ্রলোকের স্ত্রী সেটা আপনার সামনেই স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে ফেলেছিলেন। তিনটি সন্তানের জননী ভদ্রমহিলা পত্রিকার মধ্যে এমন ভাবে ডুবে গিয়েছিলেন যে এটিকেটের গ্রামার অমান্য করে চা-বিতরণের দায়িত্ব স্বামীকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল।

পড়া শেষ করে যখন তাঁর খেয়াল হলো, তখন আপনাদের কাপ খালি হয়ে গিয়েছে। আপনাদের কাছে 'অ্যাপলজি' ভিক্ষা করে তিনি স্বামীকে বলেছিলেন, 'পড়ে দেখো, কি যা-তা লিখেছে। এ-সব কাগজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া চলবে না—খুকু পড়বে ! তুমি বরং এটা অফিসে ডেলিভারি নিও।'

ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন 'যদি বলো তো নেওয়াই বন্ধ করে দিতে পারি।'

'না না, ভারি ইন্টারেস্টিং খবরাখবর থাকে। ওটা না পড়লে আমার পেট ফুলে ওঠে। অফিস থেকে ব্যাগের মধ্যে করে নিয়ে আসবে। আমি রাত্রে পড়ে, আবার ব্যাগে ঢুকিয়ে দেবো. তুমি সকালে অফিসে নিয়ে চলে আসবে! খুকু জানতেও পারবে না।' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এতো লুকোচুরি কী ভালো?'

মহিলা উত্তর দিয়েছিলেন 'বিয়ে হবার আগে পর্যন্তই লুকোচুরি করছি; স্বামীর ঘরে গিয়ে খুকু যা খুশি-তাই পড়বে।'

এর পর আপনারা তিনজনে একসঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন। ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আমাদের এই শহরে কুমারী কীলার কে, প্রফুমো কে? ডাঃ স্টিফেন ওয়ার্ডই বা কে? শহরের কোন বাড়িতে, কী ভাবে নাইটের পর নাইট একই নাটকের পুনরভিনয় হচ্ছে কে জানে।'

আপনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'সে-সব আমরা কী ভাবে জানবো? উঁচুমহলের খবর তো আপনারাই রাখবেন।'

সেদিন সবাই একসঙ্গে হেসে উঠেছিলেন; কিন্তু ব্যাপারটা আপনি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারেন নি। নতুন বইটার আইডিয়া তখন আপনার মাথায় এসে গিয়েছে।

তারপর থেকেই আপনি ঘুরছেন। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি আপনি বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাবুলবাবু সম্বন্ধে আমরা যাই ভাবি, তাঁর কাছে আপনার যে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার কারণ আছে তা স্বীকার করি। হাবুলবাবু না থাকলে আপনি নিশ্চয়ই এই জগতের ভিতরে ঢুকতে পারতেন না। আমাদের সঙ্গেও আপনার আলাপ হতো না।

ভাবছি, শেষ পর্যন্ত যদি সত্যিই আপনি আমাদের নিয়ে বই লেখেন সেখানে হাবুল মিত্তিরকে কেমন ভাবে আঁকবেন। যদিও আপনি তথ্যনিষ্ঠ হন, যদি আপনার কলম সত্যের প্রতি সামান্যও শ্রদ্ধাশীল হয়, তাহলে হাবুল মিত্রকে বাংলাদেশের

লোকেরা অবাক হয়ে দেখবে। কিন্তু এখনও সময় আছে; বিষয়টি আবার বিবেচনা করুন, আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

কালকের ব্যাপারে আমি সত্যিই লজ্জিত। কালকে আপনি দেখা করতে এলেন, অথচ আপনার সঙ্গে দেখা হলো না। আপনাকে ঘরে ঢুকতে পর্যন্ত দিতে পারলাম না।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার দোষ নেই। প্রিভিয়াস অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকলে আমি কাউকে এণ্টারটেন করি না। সন্ধোবেলাটা আমি ফ্রী ছিলাম। তাই আপনাকে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে খুব হাই লেভেল থেকে একজন 'স্টুডেণ্ট' নেবার অনুরোধ এল। তবুও হয়তো না বলে দিতাম; কিন্তু শুনলাম স্টুডেণ্টটি এই শহরের অতি অভিজাত পল্লীতে আকাশছোঁয়া বাড়ি তৈরি করছেন! ন্যায্য ভাড়ায় কয়েকখানা এয়ারকণ্ডিশন ফ্ল্যাট পাবার সম্ভাবনা আছে! আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের নেপথ্যমালিকরা (সহজবোধ্য কারণে যাঁদের পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়) এতে বিশেষভাবে আগ্রহী।

আমাদের এখনকার বাড়ি দেখেছেন তো। পাড়াটা অভিজাত, কিন্তু প্রচণ্ড অভিজাত নয়। এয়ার-কণ্ডিশন করবার অসুবিধে রয়েছে; অথচ এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের অনেকেই পাখার হাওয়ায় জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত নন। এইসব ভেবে শেষ মুহূর্তে আমাকে ওই লোকটির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হলো। তখনই আপনাকে খবর পাঠাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু টেলিফোন ডিরেক্টরিতে আপনার নাম নেই। ফোন না নিয়ে থাকেন কী করে? আমাদের তো একমুহূর্তও চলে না! এই টেলিফোনের মাধ্যমেই তো আমাদের ব্যবসা চলেছে।

নতুন বাড়িতে যদি ফ্ল্যাট পাই, তাহলে ব্যবসা অনেক

বেড়ে যাবে বলেই হাবুলবাবুর বিশ্বাস। আরও অনেক বড় বড় লোককে এণ্টারটেন করতে পারা যাবে নিশ্চয়। কিন্তু এ-সব তো আমাদের পেশার কথা; আগামীকাল যখন উনি কমিশন আদায় করতে আসবেন তখন আলোচনা করা যাবে।

এখন আপনাকে প্রশ্ন করি, কল্-গার্লদের নিয়ে আপনি কি উপন্যাস লিখবেনই? আপনি সাহিত্যিক, সমাজের যে কোনো দিক নিয়ে বই লেখবার অধিকার আপনার অবশ্যই আছে। আপনি সেদিন হাবুলবাবুকে বলেছেন, এই জীবনের সবকটা দিক আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন। সব দেখে-শুনে, বিচার বিবেচনা করে আপনি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন; এবং তারপর লেখার মাধ্যমে ছবি আঁকবার চেষ্টা করবেন। এ-বিষয়ে আমাদের কিছু বলবার নেই। কারণ কল গার্লরা কোন অধিকারে পর্দানশীন গৃহবধুর প্রাইভেসি দাবি করবে?

দেখলাম হাবুলবাবু আপনার শুভানুধ্যায়ী—প্রায় আপনার ভক্ত লোক। হাবুল মিত্তিরকে যাঁরা জানেন, বিশেষ করে আমাদের এই ব্যবসায়, তাঁদের কাছে এটা সত্যিই আশ্চর্য খবর।

মেয়েদের অনেকে মনে করে ওঁর হার্ট বলে কিছু নেই, থাকলেও সেটা প্ল্যাস্টিকের তৈরি, রক্ত মাংসের নয়। হাবুলবাবু সম্বন্ধে হয়তো আমার এ-সব আপনাকে লেখা উচিত নয়; হয়তো আপনার কাছ থেকে এ-চিঠি তাঁর হাতে পড়তে পারে। তাতে আমার সমূহ অশান্তির সম্ভাবনা—কিন্তু আমার মধ্যে একটা ডোণ্ট-কেয়ারি ভাবও আছে। অত ভেবেচিন্তে চিঠিপত্তর উকিল-ব্যারিস্টাররা লেখে; আপনারা সাহিত্যিকরাও একটা কথা ব্যবহার করার আগে পাঁচবার কলম কামড়াতে পারেন; আমাদের ব্যবসাতে ও-সবের রেওয়াজ নেই; লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে দেহকেই আমরা সাবধানে ব্যবহার করিনা, তার আবার কথা!

হাবুলবাবু কিসের ব্যবসা করেন; কী ভাবে পয়সা রোজগার করেন সে-সব আপনার এতোদিনে নিশ্চয় অনেকটা জানা হয়ে গিয়েছে। (না হলে সেদিন আমাদের এখানে আপনি এসেছিলেন কী করে?) হাবুলবাবুর দেখছি ওই একটা দুর্বলতা আছে—অবসর সময়ে গল্পের বই পড়তে ভালবাসেন। আমার ঘরেও মাঝে মাঝে বই নিয়ে আসেন। যতক্ষণ ফোন বাজে না, যতক্ষণ 'স্টুডেন্ট' থাকেনা ততক্ষণ বই-এর পাতা উল্টোন। ওঁর কাছেই শুনলাম, হোটেলের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে আপনি নাকি ঢাউস একখানা বই লিখেছেন। সে-বইটাতে নাকি আপনি অনেকের সুখ দুঃখের কথা অন্তর দিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন।

কী আশ্চর্য, সংসারে যারা এত কঠিন এত নিরস; গল্প পড়তে বসে তারা অত ভাল হয়ে যায় কী করে? হাবুল মিত্তির কী করে আপনার করবী গুহর কথা পড়তে পড়তে চোখের জল মুছতে আরম্ভ করে? অথচ আমি নিজে জানি শম্পা, চম্পা, শুভ্রার অনেক টাকাই হাবুলবাবু দেন নি।

আমারও কিছু টাকা মারবার চেষ্টা করেছেন হাবুলবাবু। প্রায়ই ফ্রী স্টুডেন্ট এনে হাজির করেন। স্টুডেন্ট এনে চোখ টিপে বলেন, ফ্রী লেসন্ দিতে হবে। দু' একবার ছেড়েও দিয়েছি—পরে শুনলাম হাবুল মিত্তির তাদের কাছে পুরো টাকা আদায় করেছেন। এখন তাই ফুল ফ্রী তো দূরের কথা, হাফ্ ফ্রীর কথা উঠলেও বলি, 'আমি কিন্তু স্টুডেন্টকে লেসন্ দেবার সময়েই ফ্রী-এর কথা জিজ্ঞেস করবো।'

হাবুল মিত্তির বলেন, 'দোহাই ওই কাজটি কোরো না স্বর্ণ, ভেরি ইনফ্লুয়েনসিয়াল স্টুডেন্ট। এদের মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় আসতে না দিলে, তোমাদের আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলবে। এরা কত ভাল বল—এরা ঘুষ চায় না;

ডিনারে নেমতন্ন চায় না, মদের বোতল চায় না; শুধু মাঝে মাঝে ফ্রী স্টুডেন্ট হয়ে তোমার এখানে আসতে চায়।'

কিন্তু মুখে হাবুলমিত্তির যাই বলুন না কেন, ভিতরে ভিতরে আমার সম্বন্ধে তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছেন—নেহাত বাধ্য না হলে টাকাটা মারবার চেষ্টা করেন না।

'স্টুডেন্ট' কথাটা শুনে আপনি বোধ হয় এখন আর তেমন আশ্চর্য হচ্ছেন না। সেদিন যখন আমাদের এই ডানসিং স্কুলে এসেছিলেন তখন কথাটা নিশ্চয় শুনে গিয়েছেন। হয়তো হাবুলবাবু নিজেই আপনাকে আবার বলবেন।

প্রথমে যখন কথাটা শুনেছিলাম তখন আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই ক' বছরের মধ্যে কথাটা কতবারই তো পাল্টালো। প্রথমে ছিল 'খদ্দের', তারপর হলো 'পেশেণ্ট', তারপর 'গেস্ট' (যাকে বলেন কিনা অতিথি), তারপর 'কাস্টমার', এখন 'স্টুডেন্ট'—ছাত্র বলে যাকে। এরপরও নিশ্চয় আবার পাল্টাবে। সেই আদিম যুগের পুরনো কাসুন্দিকে কত নতুন নামে ডাকতে হবে।

আমার অভিজ্ঞতার কথাই আপনাকে নিবেদন করি। এখন আমার উপর দায়িত্ব অনেক—আধডজন মেয়ের ভাগ্য আমার উপর নির্ভর করে। আমাদের এখন অভাব নেই তেমন। মালিকদের ভাগ এবং হাবুলবাবুর কমিশন বাদ দিয়েও আমাদের অনেক থাকে। শাড়ি গয়নাগাটির জন্যেও চিন্তা করতে হয় না, ঠিক জুটে যায়। আর গাড়ির তো কথাই নেই। টেলিফোনে খবর দিলে অনেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না।

আপনার নিশ্চয় জানা প্রয়োজন, কেমন করে এই লাইনে এলাম। কারণটা অতি পুরাতন—তার থেকে কী করে যে অভিনব গল্প সৃষ্টি করবেন বুঝতে পারছি না। আর্থিক অনটন,

না হয় অনিচ্ছাকৃত পদস্খলন—পতিতার জীবনকাহিনীতে এই দুটো কারণ শুনতে শুনতে পাঠক-পাঠিকাদের কান পচে গিয়েছে। না, আমি কোনো প্রাইভেট টিউটর বা পাড়ার কোনো দাদার সঙ্গে বেরিয়ে এসে প্রতারিত হয়ে এ-লাইনে আসিনি। শিয়ালদা স্টেশন থেকেও আমার জীবনের নতুন পর্ব আরম্ভ হয়নি। হলে আপনার মুশকিল হতো—রেফিউজীদের গল্প এখন রেফিউজীরাও পড়তে চায় না!

আমার ঘটনাটাও অবশ্য তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। আমার অভাব ছিল, স্বামীও ছিল। তারপর স্বামী মারা গেলেন—অভাবটা আরও বাড়ল। এটাও কোনো নিউজ নয় আপনাদের কাছে। স্বামীহারার দুঃখ নিয়ে লেখকরা আর কত গল্প লিখবেন—পাঠকদের কাছেও এ সব একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কী করি বলুন?

বাংলাদেশের শ্মশানঘাটগুলোর একটা স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স নিয়ে দেখবেন, প্রতিদিন কতগুলো বিবাহিত পুরুষের মৃতদেহ সেখানে সৎকার করা হচ্ছে—ঘাটবাবুদের সামনে সরকারীভাবে প্রতিদিন কত বিধবার সৃষ্টি হচ্ছে। কাপড়ের দোকানেও খবর নিতে পারেন—পাড়বিহীন থান-কাপড়ের বিক্রি কত হচ্ছে। তবে সেখান থেকে সবটা বুঝতে পারবেন না—কারণ আজকাল অনেক বিধবাই শাড়ি পরছে। আমিও প্রথমে থান কাপড় দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। একাদশীও করতাম। তারপর একাদশী ছেড়ে দিয়েছি, শাড়ির পাড়-চওড়া হয়েছে; আর এখন তো রঙীন কাপড় পরতেই হচ্ছে। মাছ, মাংস, কাঁকড়া ইত্যাদিও বাদ দিচ্ছি না।

নিঃসম্বল সদ্যবিধবাদের কী অবস্থা হয় তা তো আপনার ভালভাবেই জানা আছে। সাধারণত তাদের বাবা থাকেন না; তবু তারা ভাই-এর বাড়িতে যায় একবার। সেখানে তারা

জায়গা পায়না, তখন কোনো বস্তিতে এসে ওঠে—এইসব বিবরণও আপনার পাঠকদের নিশ্চয় ভাল লাগবে না।

যে বস্তিতে উঠেছিলাম, সেখানে আরও বিধবা ছিল। আমার পাশের ঘরেই একজনকে দেখেছি। আমারই বয়সী। বাচ্চা আছে—কিন্তু ছোটবেলা থেকে শিখেছেন চরিত্রের থেকে কিছুই বড় নেই। তাই ঝি-গিরি করে, ঠোঙা বেঁধে, মুড়ি ভেজে ছেলে মানুষ করছেন। মানুষ মানে তু'বেলা আধসেরি খোলে দেড় ছটাক খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে বড় করছেন।

আমিও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার পেটে কিছু লেখাপড়া ছিল; মনে কিছু দম্ভ ছিল—তাই খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। এই সময়েই হাবুল মিত্তিরের সঙ্গে আলাপ। হাবুল মিত্তির তখন এতো মোটা ছিলেন না। টেরিলিনের শার্ট ও স্যুট পরে ফিয়াট গাড়িতে তখন ঘুরে বেড়াতেন না। তবে লোকে তাকে যতই ভিলেন বলুক, আমি পারি না। আমার যা কিছু এখন হয়েছে তার গোড়াতে তিনি।

পয়সার ব্যাপারে হাবুল মিত্তির হয়তো আমাদের টাকার ভাগ নিয়েই বেঁচে থাকেন; কিন্তু বিপদগ্রস্ত মেয়েদের সাহায্য করবার বাসনা তাঁর মধ্যে চিরকাল ছিল। কাউকে সাহায্য করবার পর, তিনিও যদি তার মাধ্যমে ছুটো পয়সা রোজগার করেন বলবার কিছু থাকে না।

হাবুল মিত্তিরই প্রথম আমাকে বলেছিলেন, 'কিছু নেই কিছু নেই বলে কাঁদলে সংসারে কেউ চেয়ে দেখে না; যা আছে তাই ভাঙিয়ে খেতে হয়। পৃথিবী বলে—গিভ অ্যাণ্ড টেক।'

ওঁর কথাটা যে আমার মনে লেগেছে তা হাবুলবাবু বুঝেছিলেন। তাই বলেছিলেন 'ভদ্দরলোকের মেয়ে কেন আত্মীয়-কুটুমের লাথিঝাঁটা খেয়ে মরবেন? নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করুন। আমাদের অফিসে আসুন।'

অফিস মানে বুঝতেই পারছেন—'ম্যাসাজ-বাথ', বাংলায় যাকে ভদ্রভাষায় বলা হতো অঙ্গসংবাহনাগার। তখন আমি নরুণপাড় শাড়ি পরতাম। আমাদের সঙ্গে দু'একজন ছিলেন যাঁরা তখনও থান পরে আসতেন। হাবুল মিত্তির তখনও এত বড়লোক হননি, সামান্য ম্যানেজার—মালিক অন্যলোক। তিনি বললেন, 'এ হয় না। এখানে 'পেসেণ্ট' আসে আনন্দ করতে, শাদা কাপড় দেখলে তারা ঠিকরে পালিয়ে অন্য ক্লিনিকে গিয়ে উঠবে।'

আমার মনে আছে শেষ পর্যন্ত থান পরে ক্লিনিকে এসে, ওখানেই কাপড় পাল্টে শাড়ি পরে ডিউটি দিতাম। বেরিয়ে আসতাম আবার বিধবার সাজে। হাবুল মিত্তিরই আমাকে রোজ বাড়ি পৌঁছে দিতেন। আমার 'পেসেণ্ট'-দের কথা কীই বা বলবো—সবই তো জানেন। এঁদের নিয়ে বাংলায় লেখা অন্তত ডজনখানেক গল্প তো আমিই পড়েছি।

ভেবেছিলাম এইখানেই দিনগুলো কাটবে। কিন্তু কাগজ-ওয়ালাদের নজর পড়লো। তাঁরা এই সব 'দুর্নীতি কেন্দ্রে'র বিরুদ্ধে লিখে প্রথম দিকে আমাদের সুবিধে করে দিতেন। কাগজ থেকে খবর পেয়েই অনেক ছেলেছোকরা আমাদের 'পেসেণ্ট' হয়ে কলেজ এবং অফিস থেকে চলে আসতো। কিন্তু সম্পাদকদের তাড়নায় গভরমেণ্ট নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন, ফলে অঙ্গসংবাহনাগারের দরজায় তালা পড়লো।

হাবুলবাবু বলেছিলেন, 'চিন্তা কোরো না, নতুন ব্যবসা খুলছি!' তিনিই আমাকে বাড়ি থেকে হোটেলে নিয়ে যেতেন। (মালিক এবং ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর স্পেশাল ব্যবস্থা ছিল।) হোটেলে লাউঞ্জে আমাকে বসিয়ে রেখে তিনি ভিতরে চলে যেতেন। কোনো 'গেস্ট' পছন্দ করলে কাছে এসে বসতেন, না হয় রিসেপশনিস্টকে রুম নম্বর দিয়ে যেতেন। হাবুলবাবু না থাকলে না খেয়ে মরতে হতো।

কিন্তু হোটেলেও শান্তি পাওয়া গেল না। সাংবাদিকদের সন্ধানী আলো সেখানেও গিয়ে পড়ল! পুলিস কয়েকবার অতর্কিতে হাজির হয়ে ডজন-খানেক মেয়ে এবং কয়েকজন অতিথিকে ধরপাকড় করল।

আমিও দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। হয়তো বেশ বিপদেই পড়ে যেতাম। কিন্তু হাবুলবাবু সেবারেও রক্ষা করেছিলেন। উকিল দিয়েছিলেন এবং তাঁরই চেষ্টায় জামিনে খালাস পেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত মাননীয় মাজিস্ট্রেট কি ভেবে আমাদের সাবধান করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর রায়ে আমাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে যে মরমী মন্তব্য করেছিলেন তা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সম্পাদকীয় মন্তব্যে দেশের জনগণের দৃষ্টিও সেদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হয়।

ভাবছেন আমি দাগী আসামী? মোটেই নয়। পুলিসের বা আদালতের খাতার কোথাও আমার নাম নেই। হাবুলবাবু অনেকদিন আগেই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন—'ধরা পড়লে কখনও আসল নাম দেবে না।'

আমার নামের বদলে সেখানে ধীরা ঘোষালের নাম লিখিয়েছিলাম। ধীরা ঘোষাল নামটা একেবারেই কাল্পনিক ভাববেন না। ধীরা আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়তো। পড়াশোনায় খুবই বাজে মেয়ে ছিল, আমাদের থেকে অনেক খারাপ; কিন্তু চেহারাটা ছিল লাল টুকটুকে—ঠিক যেমনধারা মেয়েকে বিবাহযোগ্য সৎপাত্ররা এবং তাদের বাবা ও মায়েরা এক কথায় পছন্দ করেন।

আমরা যদিও ধীরাকে পলাশফুল বলতাম, তবুও ভাল বিয়ে হতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি। ধীরার বর বড় চাকরি করে, ওদের গাড়ি আছে, একটা ছেলে হয়েছে।

হোটেলেই একদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। ওদের বোধ হয় কোন পার্টি ছিল। আমি শিকারের আশায় লাউঞ্জে বসেছিলাম। আমাকে দেখে ধীরা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। 'তুই এখানে? কোথায় বিয়ে হয়েছে তোর? তুইও কি ফরেন কন্সালের পার্টিতে ইনভাইটেড হয়ে এসেছিস?'

কোনোরকমে সেদিন পালিয়ে এসেছিলাম। হাবুলবাবু, শিকার ধরে আমাকে খুঁজতে এসে না পেয়ে খুবই রেগে গিয়েছিলেন। পরে আমাকে যা-তা বলেছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষে সেদিন ওখানে বসে থাকা অসম্ভব ছিল। ধীরার রঙটা যেন আরও গোলাপী হয়েছে; আরও একটু মোটা হয়েছে সে; কিন্তু মন্দ দেখাচ্ছিল না। হয়তো এটা আমার নীচতা; হয়তো এটা আমার খুবই অন্যায়; কিন্তু ধরা পড়লেই পুলিসের কাছে আমি নিজের নামের বদলে ধীরার নামটাই দিই। আপনারা যতই উপদেশ দিন; ভবিষ্যতে আবার ধরা পড়লে আবার সেই একই নাম দেবো। (হ্যাঁ, একটা কথা, ধীরাকে আমি এখন আর হিংসে করি না। ওর স্বামীই কিছুক্ষণ আগে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। হাবুল মিত্তির ফোনে ব্যবস্থা করেছিলেন। ধীরা কেমন আছে খবর নেবার লোভ হয়েছিল: কিন্তু স্টুডেন্টদের লজ্জায় ফেলাটা আমাদের প্রফেশনের পক্ষে ক্ষতিকর।)

একটা নয়, গোটা কয়েক হোটেলেই আমি ঘুরেছি। কিন্তু আমাদের পক্ষে লাইনটা একেবারে নষ্টই হয়ে গেল। মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে যারা প্র্যাকটিশ করতে চায়, তারা ওখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে এই পুলিসী হামলার ভয়ে।

হাবুলবাবু অবশ্য হতাশ হননি। বলেছেন, 'এ-লাইনের মার নেই। দুদিন কষ্ট হবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার জন্য আমি বিশেষ ভাবছি, কারণ তোমাকে তো অন্য মেয়ের

মতো যেখানে-সেখানে ঠেলতে পারি না, তুমি হাজার হোক আমার জানা-শোনা ভদ্রঘরের মেয়ে।'

হাবুলবাবুই আমাকে একদিন হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেলুনের ব্যবসাটা খুবই ভাল ছিল। ভদ্রমহোদয়দের কেশচর্যার জায়গা বলে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা গুটিকয়েক মেয়ে ছিলাম। অতিথিদের বলা হতো কাস্টমার। কাস্টমাররা আমাদের সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করতেন; আমরাও আটটার মধ্যে সেলুন থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারতাম। কিন্তু সেলুনের খবরও কাগজে বার হলো। পুলিস রেড, থানা, জামিন, আদালত, জরিমানা ইত্যাদি কিছুই বাকি রইল না।

হাবুলবাবু সেই প্রথম একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। হাজার হোক অভিজাত পল্লীর অভিজাত সেলুনে তিনি অভিজাত কাস্টমার পাচ্ছিলেন; এঁরা ত্ব'চারটাকা নিয়ে মাথা ঘামান না। নির্ধারিত ফী ছাড়াও আমরা বাড়তি বখশিস পেতাম। আর একটা সুবিধে ত্ব'চারটা ভাল পার্টির সঙ্গে পরিচয় হতো। কল গার্ল পেশার পক্ষে সেটা খুবই লোভনীয়। কাস্টমার টেলিফোনে আগে থেকেই সময় ঠিক করে রাখতে পারেন; অন্য কোনো কাস্টমারকে টেলিফোনেই ইনট্রোডিউস করিয়ে দিতে পারেন। শহরে যাঁরা নতুন এসেছেন কয়েক-দিনের জন্যে তাঁদেরও চক্ষুলজ্জা থাকে না—চুল কাটবার জন্যে লোকের কাছে কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এবার হাবুলবাবু প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলেন; অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন। সেলুনের মালিক হিসেবে নিজের নাম রাখলে, তাঁকে শ্রীঘরদর্শন করে আসতে হতো।

পৃথিবীতে যা হয়, তা বোধ হয় ভালর জন্যেই হয়। না হলে আমাদের মাথায় এবার নতুন বুদ্ধি আসবে কেন? আমার

মধ্যে বড় হবার স্বপ্ন ছিল—তার জন্যে চেষ্টা করতে পরিশ্রম করতে তৈরি ছিলাম। আমিই হাবুলবাবুকে বলেছিলাম, নতুন দিনে নতুন পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। উঁচুতলায় উঠবার চেষ্টা না করলে কিছুই হবে না। কল গার্ল সিস্টেম এখন আমাদের এই শহরেও ভাল চলবে।

হাবুলবাবুর একটা গুণ, বুদ্ধি দিলে তিনি নিতে পারেন। অসুবিধে অনেক ছিল—ফ্ল্যাট জোগাড় করা, টেলিফোনের ব্যবস্থা করা। উচ্চপর্যায়ে সংযোগ রাখা। তা স্বীকার করতে হবে, হাবুলবাবুই ফোন জোগাড় করেছেন; ফাইনানসিয়ার ঠিক করেছেন। হাবুলবাবুর পুলিসের ভয় খুব। তিনি এখনও খাতায় কলমে থাকতে চান না। তাই দূরে দূরে আছেন। তিনি পাবলিক রিলেশনস এর কাজ করেন।

আমি দেখছি এ-লাইনে আরও কিছু আগে এলে ভাল হতো। এতোদিনে আরও উপরে উঠে যেতে পারতাম। আমরা ফোনেই কাজ করি। আমাদের ফ্লাটগুলোতেই আমরা অতিথি সৎকার করি; আবার প্রয়োজনে ডরোথি, শম্পা, চম্পা ইত্যাদিকে গাড়িতে বাইরে পাঠাই। ওরা মানুষকে কম্পানি দেয়—সান্নিধ্যদানের আর্টটা ওদের ভালভাবে শিখিয়েছি। জিনিসটার মধ্যে রুচি, সৌন্দর্য ও মাধুর্য না আনলে অতিথিরা সন্তুষ্ট হবেন কেন?

কারা আমাদের পৃষ্ঠপোষক? আপনার কল্পনাশক্তি যতদূর খুশি প্রসারিত করতে পারেন। আমি বলবো না। যদি কখনও আত্মজীবনী লিখি কাজে লাগবে। আমাদের বাইরের একটা রূপ আছে। সেটা আপনি জানেন--ডান্সিং স্কুল। আগে গা টেপা মাথা টেপা শিখেছিলাম, এখন কিছু কিছু নাচের বিবরণ জানতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে হাবুলবাবু বিজ্ঞাপন দেন: 'বল রুম ডান্স ট্রেনিং—অ্যাট্রাকটিভ পার্টনারস্ অ্যাভেলেবল।'

যাঁরা বোঝবার তাঁরা আমাদের ভাষা দেখে ঠিক ধরে ফেলেন। ফোনের নম্বর দেওয়া থাকে ; সংযোগের অসুবিধে হয় না।

আপনি তো হাবুলবাবুর সঙ্গে আমাদের ইস্কুল দেখেছেন। ভাবছেন এই দেশী শহরে বিদেশী নৃত্যের এতো শিক্ষার্থী কোথা থেকে আসে। এই শহরেই প্রকৃত উচ্চমানের সিরিয়াস পশ্চিমী নাচের ইস্কুল আছে, কিন্তু সে সব জায়গায় ভিড় নেই।

এই বিশিষ্ট পল্লীতে অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের স্কুল খোলা থাকে। সবটাই ফাঁকি দিয়ে চালানো সম্ভব নয়। সেই জন্যেই বুড়ো পিটার রোজারিওকে রাখা হয়েছে। বুড়ো রোজারিওর সঙ্গে যখন আপনার আলাপ হয়েছে বুঝেছি ওকে আপনি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করবেন। আপনার গল্পের অন্যতম চরিত্র হবেন তিনি। বুড়ো সত্যিই যত্ন করে নাচ শিখেছিলেন। একটা ভদ্র ইস্কুলেও কাজ করতেন আগে। কিন্তু সে ইস্কুলে চললো না, ছাত্র-ছাত্রী হয় না! তাই এখানে ঢুকেছেন। রোজারিওর কাছে আমিও অনেক শিখে ফেলেছি। বুড়ো বহু নাচ জানেন। বলেন, 'কী শিখবে ওয়ালস? ফক্সট্রট, ট্যাঙ্গো? রাম্বা, সাম্বা কঙ্গা, ম্যামবো? ইফ ইউ লাইক, তোমাকে ট্যাপ ডানসিংও শেখাতে পারি। সেই আদ্যিকালের ডান্স, কিন্তু স্টিল পপুলার। আর জ্যাজ তো আছেই। এমন কি এই মডার্ণ টুইস্ট।'

বুড়োর গল্প যদি আপনি মন দিয়ে শোনেন, তবে সে আপনাকে কন্টিনেন্টের কথাও বলবে। ফ্রান্সের কটিলোঁ নাচ, ভিয়েনা আর বুডাপেস্টের পোক মাজুরকা! জানি না রোজারিও সম্বন্ধে আরও কী কী খবর আপনি সংগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই ওর নাচ শেখাবার ভঙ্গীটা আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। পশ্চিমী নাচের গোড়ার কথা, যাকে ওঁরা 'সিক্স বেসিক স্টেপ' বলেন, তা আপনি নিশ্চয় দেখেছেন।

সায়েব কীভাবে ছেলেদের হাতেখড়ি দেন, ওয়াকিং স্টেপ শেখান তাও আপনার কাজে লাগতে পারে। সায়েব কেমন বিচিত্র ভঙ্গীতে স্টুডেন্টের হাত ধরে দেখান : 'প্রথমে একটা পা এইভাবে সামনে এগিয়ে দাও ; গোড়ালি যেন মেঝেতে না পড়ে ; আগে পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দাও ; তারপর আলতোভাবে গোড়ালি ছুঁইয়ে দাও। তোমার সঙ্গিনী ঠিক উল্টো করবে—পা যতদূর সম্ভব পিছনে বাড়িয়ে দেবে।'

এরপর 'সেকেণ্ড বিট,' বুড়োআঙুলে ভর করে স্প্রিং-এর মতো উপরে উঠতে হবে। কিন্তু হাঁটু জুড়বে না, কাঁপবে না।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাঠ—চেজ, ব্যালান্স, পিভট ও রানিং স্টেপগুলোও আপনার কাজে লাগবে।

নৃত্যসঙ্গিনীর সঙ্গে নৃত্যশিক্ষার্থীর প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা আপনি কেমনভাবে করবেন তা কল্পনা করে আমি এখন থেকেই শিউরে উঠেছি।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, রোজারিও তাঁর পুরনো ইস্কুলের মতো এখানেও স্টুডেন্টকে বলেন, 'পার্টনারকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরো না, এতে ডান্স হয় না। আর নিজের স্টেপের সঙ্গে তাকে টেনে হিঁচড়ে ডান্সের রিদম রাখা যায় না।

রোজারিওর উপদেশগুলো আপনার কাজে লাগতে পারে ; 'সঙ্গিনীকে একেবারে মুখোমুখি দাঁড় করাবে—পাশে নয়। মধ্যিখানে একটু ফাঁকা জায়গা থাকবে। ডানহাতটা সঙ্গিনীর পিঠের মাঝামাঝি রাখবে। বাঁহাতটা একটু তোলা থাকবে—কনুই-এর কাছে একটু মুড়ে সঙ্গিনীর হাত আলতোভাবে ধরবে।'

এরপর বুড়ো সাধারণত মেয়েদের দিকে তাকান, কিন্তু আমাদের আর ইন্সট্রাকশন দিতে হয় না। আমরা জানি আমাদের বাঁহাতটা রাখতে হবে স্টুডেন্টের কাঁধের পিছন দিকে আর ডানহাতটা তার হাতের উপর হালকা ভাবে থাকবে।

এই নৃত্যশিক্ষাপর্ব যে নিতান্তই বাইরেকার জিনিস; তা যখন প্রকাশিত হবে, তখন আপনি হয়তো দেশের মানুষদের প্রশংসা পাবেন। যে-সব প্রখ্যাতজনের পদধূলিতে আমাদের এই সামান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধন্য হয় তাঁরা হয়তো চিন্তিত হয়ে উঠবেন।

কী জানি কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি আমাদের এই ক্লেদাক্ত ঘৃণিত জীবনের সংবাদ সংগ্রহ করছেন। এতে মানুষের কী উপকার সাধিত হবে তাও জানি না।

কোথায় যেন আপনি লিখেছেন, পাঁকের পদ্মও দেবতার পুজোয় লাগে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পুজোর আগে সে পদ্মকে সাবধানে পঙ্কমুক্ত করতে হয়। আমি জানি আপনি হয়তো আমাদের উপর অবিচার করবেন না। আমরাও যে একদিন সাধারণ মেয়ে ছিলাম, অন্য সবার মতো আমাদেরও যে আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আহ্লাদ ছিল তা নিশ্চয় আপনি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেবেন।

সত্যি ভাগ্যের দোষে, অবস্থার তাড়নায় আমরা এইসব অপ্রীতিকর জায়গায় এসে পড়েছি। অনেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; আর যারা আমার মতো বুদ্ধিমতী তারা নিজেকে জলের দামে বিকিয়ে না দিয়ে, এখনও টিকে রয়েছে। হয়তো একটু সুখেও আছি বলতে পারেন।

ইচ্ছে থাকলে, আপনাদের এই শহরে আমরা সামাজিক মর্যাদাও আদায় করতে পারি। অন্য অন্য দেশে দেখছেন তো? কিন্তু কেন জানি না, কিছুতেই অমন ইচ্ছে হয় না। একটু সুখে আছি; গাড়ি করেছি; ফোন আছে; প্রতিপত্তিরও অভাব নেই তেমন। সত্যি কথা বলতে কি এই প্রতিপত্তি ব্যবহার (অপব্যবহারও বলতে পারেন) করেও টাকা পাই। যাঁরা আমাদের কাছে গেস্ট পাঠান, যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমাদের দিয়ে তাঁদের কনট্রাক্ট আদায় করেন, তাঁদের লাইসেন্সসমস্যা এবং অন্যান্য চিন্তা দূর করেন, তাঁরা জানেন

আমরা যা নিই তার থেকে ঢের বেশী দিই। পড়তায় লাভ হচ্ছে বলেই তাঁরা আমাদের টেলিফোনে খবর দিচ্ছেন, হোটেলের ঘর নিচ্ছেন, অথবা নাচের ইস্কুলে স্টুডেন্ট পাঠাচ্ছেন।

জানিনা আমাদের বিরুদ্ধে আপনি কতখানি লিখবেন। লেখা-পড়া বেশী শিখিনি। তবে শুনেছি—আমরা বহুদিন আছি। ওকা-লতি, ডাক্তারি, পুরুতগিরি সব পেশার জন্মের অনেকদিন আগে থেকে আমরা রয়েছি। ওলডেস্ট প্রফেশন অন আর্থ। তারপর ভাষার জন্ম ও বিকাশ হয়েছে ; সাহিত্য শুরু হয়েছে। সেই অতি প্রাচীন যুগ থেকে কতবারই তো আপনারা কলম ধরেছেন। কতবারই তো আমাদের ঘৃণিত জীবন সম্বন্ধে ঘৃণা উদ্রেকের চেষ্টা করলেন, কিন্তু কী হলো? এখন আপনারা আইন করে আমাদের বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন। সুযোগ পেলেই আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, থানায় পুরছেন, আদালতে হাজির করছেন, কাগজে নাম লেখাচ্ছেন, কিন্তু কী হলো?

কই যাদের জন্যে আমাদের এই যুগ যুগান্তের ব্যবসা শুধু টিকে নয়, সম্প্রসারিত হচ্ছে তাদের তো কিছু করেন না? শুধু যাঁরা আমাদের এখানে আসেন তাঁরা নন ; সংসারের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে আরও লাখ লাখ লোক পরমানন্দে ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে খবরের কাগজে আমাদের রসাল বর্ণনা পড়েন। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা আমাদের গালাগালি করেন, কিন্তু আবার নিজেরই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে রিপোর্ট থেকে আনন্দ পান।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা কেবল বাইরে ঘায়ের উপরে মলম লাগাচ্ছেন ; রক্তশুদ্ধির ইচ্ছে নেই আপনাদের। সমাজের মানুষদের সারাবার বা শাসন করবার চেষ্টা করছেন না কেন? যদি তা না করেন, আইন দিয়ে যতই আমাদের বন্ধ করবার তোড়জোড় করুন, পারবেন না।

আর তাই যদি না পারেন, তা হলে শুধু শুধু আর একখানা

বই লিখে কেন সময় ও শক্তির অপচয় করবেন? আপনাদের এই শহরে কল গার্ল, বিউটি সেলুন এবং ডানসিং স্কুল ছাড়াও তো আরও কত বিষয় পড়ে রয়েছে, আরও কত অদ্ভুত মানুষ রয়েছে—তাদের কথা লিখুন না কেন? ঠগের গাঁয়ের সবাইকে তীব্র আক্রমণ না করে যে দু' একজন সাধু কোনক্রমে আজও পৃথিবীতে টিকে রয়েছেন তাঁদের কথা লিখুন। আমরা তো পরিবেশ এবং প্রলোভনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছি; আমাদের কাছে যাঁরা কিছুক্ষণের আনন্দ পেতে আসেন তাঁদের কথাও বাদ দিলাম; কিন্তু এই শহরেই এমন অনেকে আছেন যাঁরা পরাজয় স্বীকার করেন নি। আমার সেই বস্তির প্রতিবেশিনীর কথাই ধরুন না কেন। একই সঙ্গে পথে বেরিয়েছিলাম। সেই ভদ্রমহিলার কাছে দেহের ও মনের পবিত্রতার দাম দেহের নিরাপত্তার থেকেও বেশী ছিল। দেহকে তিনি তাই যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছিলেন—বস্তিতে থেকেছেন, ঝি-গিরি করেছেন। এখনও তিনি বাড়িতে বাড়িতে বাটনা বাটেন, বাসন মাজেন, কাপড় কাচেন—দু'হাতে তাঁর হাজা। ইচ্ছে করলে তিনিও হয়তো আমার মতো সুখের মুখ দেখতে পারতেন।

আমাদের এই শহরে তাঁর মতো আরও অনেক মেয়েকে পাবেন। হয়তো আমার স্পর্ধা; কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ তাঁদের সম্বন্ধে বই বার করুন—আমার মতো কল গার্লদের সম্বন্ধে লিখে দেশের কোনো মঙ্গলই হবে না। আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

নমস্কারান্তে

স্বর্ণলতা সেন

বৈদেশিক

বৈদেশিক মানচিত্র মানে একজন ট্যুরিস্টের গল্প।

যুগ-যুগান্ত ধরে পৃথিবীর সেরা সাহিত্যস্রষ্টারা গল্পে, গানে, কাব্যে, নাটকে, এমন কি উপন্যাসের মধ্যমে ভ্রমণের জয়গান গাইছেন। তাঁরা বলছেন, বেরিয়ে পড়ো—পথকে তোমার ঘর করো, অন্তত কিছুদিনের জন্যে। নানা দেশের নানা বিচিত্র মানুষ তাদের বিচিত্রতর সভ্যতা নিয়ে তোমার সাক্ষাৎ অভিলাষী। দূর দূরান্তে দুর্গম তুষার-গিরি-পর্বত অসীম নিঃশব্দ নীলিমায় অশ্রুত কণ্ঠে তোমাকে বার বার নিমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করছে—তুমি এসো, তুমি দেখো, তুমি আনন্দিত হও।

আবার ঘরে বসেও ভ্রমণ সম্ভব। ভ্রমণ-বিলাসী হৃদয় চুপি চুপি নিজের সংকীর্ণ সীমানা অতিক্রম করে কত অজানা মানুষের অচেনা দেশে হাজির হয়। জনতার কোলাহল এবং ভীড় ছাড়িয়ে আমাদের মন প্রায়ই তো সুদূর আকাশে তারাদের দেশে পাড়ি দেয়। তাই তো বোধহয় আমরা সবাই ট্যুরিস্ট; আমাদের কাঁধে ক্যামেরা, পকেটে পাসপোর্ট এবং হাতে হোল্ড-অল না থাকলেও আমরা সবাই বিশ্ব-ভ্রমণে বেরিয়েছি।

আমার কর্মজীবনের এক অধ্যায়ে এই কলকাতায় বসে বসে আজ জার্মানী, কাল জাপান, পরশু আমেরিকা, পরের দিন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করেছি। কেমন করে? সে কথাই তো লিখতে বসেছি আজ।

কিন্তু তার আগে বলে রাখি, কিছুদিন আগে কলকাতার স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার ব্যক্তিগত কলমে একটা বিজ্ঞাপন হয়তো আপনাদের নজরে পড়ে থাকবে। 'ফিলিপাইনের টনি বীক, আপনি যেখানেই থাকুন, আপনার বর্তমান নাম যাই হোক, আপনি অবিলম্বে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে···নম্বর ফোনে

যোগাযোগ করুন। এতে আপনার লাভই হবে। দেরি করলে হয়তো আপনার কোনো উপকার হবে না।'

ব্যক্তিগত কলমের বিজ্ঞাপন অনেক পাঠক প্রথম পাতার দরকারি খবরের মতোই গভীর আগ্রহে পড়ে থাকেন। এই বিজ্ঞাপনটিও সে-সময় বহু সংবাদপত্র-পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিল। আমার এই বৈদেশিক মানচিত্রের সঙ্গে এর যে সংযোগ আছে তা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

আমার কর্মজীবনের এক অধ্যায়ে ট্যুরিস্টদের সঙ্গে প্রায়ই পরিচিত হবার সুযোগ ঘটতো। যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তখন সংযুক্ত ছিলাম তাঁদের বিশ্বজোড়া কাজ-কারবার। পৃথিবীর মানচিত্রে এমন একটা দেশ খুঁজে বার করা কঠিন, যেখানে এঁদের অফিস নেই। আর আছে নানা জাতের কর্মী—কত তাঁদের ভাষা, কত তাঁদের ধর্ম, গায়ের রঙই বা কত রকম। ইচ্ছে করলে আর একটা ইউনাইটেড নেশনস্ চালাতে পারেন এঁরা। তাই যাতায়াত লেগেই আছে। জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরম্ভ করে বলিভিয়া, ব্রাজিল, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, এল-সালভাডর, সুরিনাম, হাইতি কোথা থেকে না অতিথি আসতেন আমাদের ইণ্ডিয়া অফিসে।

অন্য অনেক কাজের সঙ্গে, মাঝে মাঝে এই সব বিদেশী অতিথি-সৎকারের দায়িত্ব পড়তো আমার উপর। নানা দেশের নানা মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার এই সুযোগ ভাগ্যের দেবতা আমার সামনে বারবার নানাভাবে উপস্থিত করেছেন; এর জন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। বাইরে না গিয়ে, ঘরে বসে পৃথিবী-ভ্রমণের লোভনীয় সুযোগ এই প্রতিষ্ঠানে বহুবার পেয়েছি।

সেদিনও বিকেলের দিকে ফাইল-ঘাঁটা কাজ করছিলাম। এমন সময়, আমাদের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার

হিউ গর্ডন ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকতেই গর্ডন বললেন, 'তোমার নতুন কাজ আছে। একজন অতিথি আসছেন।'

'কোথা থেকে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না ইউরোপ থেকে নয়, ইনি আসছেন দূরপ্রাচ্য থেকে,' গর্ডন সায়েব হেসে বললেন। নোট বুক বার করে, জানতে চাইলাম কোন্ হাওয়াই কোম্পানি কোন্ ফ্লাইটে আসছেন—বি-ও-এ-সি, কোয়ানটাস, এয়ার ইণ্ডিয়া, কে এল এম, লুফত্হানসা না জাপান এয়ারলাইনস্ অথবা ক্যাথে প্যাসিফিক কিংবা থাই এয়ারওয়েজ। ফ্লাইট নম্বর জানা থাকলে টাইমটেব্ল অনুযায়ী দমদম যাওয়া যেতে পারে। হোটেল বুকিং-এর দরকার আছে কিনা এবং রিটার্ন ফ্লাইট-এর কোনো চেকিং প্রয়োজন কিনা তাও জানতে চাইলাম।

মিস্টার গর্ডন তাঁর সামনের ফরেন এয়ার-লেটারটা আর একবার পড়লেন। একটু বিব্রত হয়ে বললেন, 'স্যরি একটু আনইউজুয়াল ট্যুরিস্ট। এরোপ্লেনে নয়, আসছেন জাহাজে।'

'তাহলে নিশ্চয় বোম্বাই, মাদ্রাজ কিংবা কলম্বোতে নেমেছেন, তারপর ট্রেনে আসছেন।'

গর্ডন বললেন, 'এটাও আশ্চর্য, জাহাজে চড়ে সোজা কলকাতায় আসছেন, তাও কারগো জাহাজে।'

গর্ডন কলকাতায় বদলি হয়ে আসবার আগে কিছুদিন দূর প্রাচ্যের দেশগুলোতে ছিলেন, তাই ভাবলাম হয়তো ওঁর চেনাশোনা কোনো ভদ্রলোক। কিন্তু এবারেও হতাশ হতে হলো। সায়েব বললেন, 'নামটা বিরাট—এডওয়ার্ড আর্থার উইলিয়ম হ্যারাল্ড বীক। কিন্তু এঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি। যিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন তিনি আমার বন্ধু—অনেকদিন মিস্টার বীকের আণ্ডারে কাজ করেছেন।'

বন্ধু লিখেছেন, 'এমন কাউকে ডেকে পাঠিও যে

ক্যালকাটাকে থরোলি চেনে; যদি সে লোকাল্ বয় হয় তাহলে আরও ভাল হয়। তোমাদের গাইড শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী বীক-এর সঙ্গে দেখা করলেই সব জানতে পারবে।'

চিঠিটার দিকে তাকিয়েই গর্ডন বললেন, 'ভদ্রলোক হেঁজি-পেঁজি কেউ নন—নিজের চেষ্টায় আমাদের ফিলিপাইন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছেন। অদ্ভুত লোক, জীবনে এই প্রথম নাকি লম্বা ছুটি নিয়েছেন—লীভ প্রিপারেটরি টু রিটায়ারমেণ্ট। বলতে পারো, চাকরি থেকে পেনসন নিয়েছেন।' মিঃ গর্ডনের তাড়া ছিল, টেলিফোনটা বাজছে, তাই চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—'সমস্ত পার্টিকুলার্স ওতে পাবে। যা দরকার কোরো।'

আমার পরিচিত মিস্টার আর মুখার্জী কলকাতার এক প্রখ্যাত জাহাজ-কোম্পানিতে কাজ করেন। তাঁর কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, এম ভি ড্রিমফ্লায়ার ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরের স্যাণ্ডহেডে এসে গিয়েছে। মহাসাগর, সাগর এবং উপসাগর পাড়ি দিয়ে 'স্বপ্ন পুষ্প' এখন পুণ্যবাহিনী ভাগীরথী সঙ্গমে ভাসমান। হুগলী পাইলট সার্ভিসের দক্ষ দিশারির নির্দেশে অবশিষ্ট পথটুকু পেরিয়ে কলকাতা বন্দরে উপস্থিত হতে তার আর মাত্র ঘণ্টা বারো সময় লাগা উচিত।

সুতরাং পরের দিন ভোরবেলাতেই কিং জর্জেস ডকে হাজির হয়েছি। এম ভি ড্রিমফ্লাওয়ার কারগো কাম প্যাসেঞ্জার শিপ। অর্থাৎ, এই জাহাজে মালও থাকে, আবার কিছু যাত্রীও থাকেন। কিন্তু মালের প্রাধান্য বেশী—মালের ভাড়া কম নয় অথচ মালকে খাওয়াতে পরাতে হয় না; একটার ঘাড়ে আর একটা চাপিয়ে রাখা যায়।

কারগোর সুবিধে অনুযায়ী জাহাজের দিনক্ষণ ঠিক হয়—সেই সুবিধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি কোনো প্যাসেঞ্জার

দূরদেশে যেতে চান—আপত্তি নেই। সময় হয়তো একটু বেশী লাগবে, কিন্তু ভাড়া কম। মালিকরা বলেন লাভ নেই—প্যাসেঞ্জার-ফেয়ারটা হয়তো পড়ে পাওয়া-চোদ্দ-আনা; কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়ে মেরে দেয়। চোদ্দদিনের জাহাজী পথ যদি মালের অজুহাতে পেরোতে বিয়াল্লিশ দিন লাগে, তবে এই ক'দিনের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, টি, ডিনার-এর গুনোগার তো কম লাগে না। আর যা দিন-কাল, দুনিয়ার যেখানে যাও—ওসাকা, টোকিও, হংকং, ম্যানিলা, কুয়ালালামপুর, রেঙ্গুন, কলকাতা, করাচি, পোর্টসৈয়দ, লণ্ডন, মার্সেলিস, হ্যানোভার, রটারডাম, আমস্টার্ডাম—সর্বত্র দেখবে দাম বাড়ছে; এক ডলারের জিনিস একশো পঁচিশ সেণ্ট হচ্ছে।

বার্থিং ডকে মোটর ভেসেল ড্রিমফ্লাওয়ারের কোনো পাত্তা নেই। নৈকস্যকুলীন দুখানা মালবাহী জার্মান জাহাজ সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাহলে মিস্টার মুখার্জী কি ভুল বললেন যে আজ রাত্রেই জাহাজ কে-জি-ডি পৌঁচচ্ছে?

একজন কুলীকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে রেগে উত্তর দিল, 'অতবড় দুটো জ্বলজ্যান্ত চোখ নিয়ে একটু ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পার না?' ওই যে দূরে 'মিড-স্ট্রিমে' অর্থাৎ গঙ্গার প্রায় মাঝামাঝি নোঙর গেড়ে বসে আছে এম ভি ড্রিমফ্লাওয়ার—ওই যে পত পত করে সুইডেনের পতাকা উড়ছে, কপালের কাছে মাতৃবন্দরের নাম লেখা গোটেবার্গ।

ভারি মুশকিলে ফেললে তো—মাঝদরিয়ায় জাহাজ থাকা আর না থাকা আমার কাছে দুই-ই সমান। ওর মধ্যেই আমাদের মিস্টার ই এ ডবলু এইচ বীক আছেন কিনা জানবো কী করে? ডকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এইটুকু যে ছাত্রাবস্থায় মাস্টারমশায় প্রায়ই মনে করিয়ে দিতেন লেখাপড়ায় মন না দিয়ে ভবিষ্যৎটি আমি ডকে তুলে দিচ্ছি।

জনৈক অপরিচিত ভদ্রলোক আমাকে উদ্ধার করলেন। বললেন, 'একটা ডিঙ্গি করে চলে যান।'

ডিঙ্গি ভাড়া করে মাঝিকে জাহাজটা দেখিয়ে দিলাম। ঘুম থেকে উঠে সূর্য এখনও বিছানাতেই পড়ে রয়েছেন। তাই রোদের তাপ বাড়েনি। ডিঙ্গি চড়ে জাহাজের দিকে যেতে যেতে ভাবছি—গঙ্গার জলে এত তেল কোথা থেকে এল। জলটা যে রকম বিষাক্ত হয়ে উঠেছে—ডিঙ্গি উল্টোলে রক্ষে নেই।

ডিঙ্গিওয়ালা যখন আমাকে নামতে বললে, তখন মনে হল কোনো পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁচেছি। সামনে একটা দড়ির ঝোলানো সিঁড়ি রয়েছে। দুর্গানাম জপ করতে করতে সার্কাসের লোকদের মতো উপরে উঠে গেলাম। ডেকের উপর হাতকাটা গেঞ্জি এবং হাফ-প্যাণ্ট পরা বিদেশী নাবিকদের কর্মচাঞ্চল্য দেখেই বুঝলাম—স্বপ্ন দেখা শেষ করে ড্রিমফ্লাওয়ার অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে।

'কার সঙ্গে দেখা করতে চান? আপনি কি এজেন্টের অফিস থেকে এসেছেন?' একজন নাবিক জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'আমি স্টিমার এজেন্টের লোক নই; ক্যাপটেনের সঙ্গেও আমার কাজ নেই; আমি মিস্টার এডওয়ার্ড বীক-এর খোঁজে এসেছি।' নাবিক ছোকরাটি আমাকে একটা দরজা দেখিয়ে দিল। 'ওইটা ধরে সোজা চলে যান; সামনে সিঁড়ি পাবেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার অ্যাবাউট টার্ন এবং বাঁদিকে চোখ ফেরাবেন—দেখবেন প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জ।'

নির্দেশ মান্য করে উপরে উঠে চক্ষুযুগলকে বামপন্থী করতেই লাউঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানকার সব ক'টা চেয়ারই খালি। ইতস্ততঃ করছি, এমন সময় প্যান্ট্রির এক ছোকরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বললে, বীক দম্পতি এখন ডাইনিং হল এ 'উপবাস-ভঙ্গ' করতে ব্যস্ত।

ছোকরার হাতেই আমার ভিজিটিং কার্ডখানা চালিয়ে দিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছোকরার পুনরাবির্ভাব। সঙ্গে কফির ট্রে। কাপ-ডিশগুলো নামিয়ে দিয়ে বললে, 'মিঃ বীক এখনই আসছেন—তাঁর ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি আপনাকে একটু কফি পান করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন।'

একটু পরে ঘরের মধ্যে যিনি ঢুকলেন তিনিই মিস্টার বীক। বেশ লম্বা ভদ্রলোক—ছ'ফুট তিন-চার ইঞ্চি হবেন; যদিও বয়সের ঝোঁকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। মাথার চুলগুলো কাঁচাপাকার মিশ্রণ—যেন চুলগুলো প্রথমে সবই সাদা ছিল; তারপর একটা স্প্রেয়ার দিয়ে কিছু কালো চাইনিজ কালি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব-এশিয়ার অকৃপণ সূর্য-কিরণে ভদ্রলোকের গৌর ইওরোপীয় দেহটা ভাজা-ভাজা হয়ে, ঝকঝকে ভাবটা একটু কমে গিয়েছে! চেহারাটা যেন স্টেনলেস স্টিলের গুণ সমন্বিত—হালকা, চকচকে, সহজে পরিষ্কার করে ফেলা যায়, অথচ শক্ত। ভদ্রলোকের নাকটা সূচ্যগ্র—একটা বুশ শার্ট এবং ট্রপিক্যাল ট্রাউজার পরেছেন। আমার ডান হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে, বসিয়ে রাখবার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

বললাম, 'মিস্টার বীক, আমাদের অফিসের তরফ থেকে আপনাকে ভারতবর্ষে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের মিস্টার গর্ডন আপনাকে তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন এবং বলেছেন আপনার সুবিধেমত তাঁর সঙ্গে দেখা করলে কৃতার্থ হবেন। ম্যানিলা থেকে আমরা যে চিঠি পেয়েছি, তাতে আপনি ক'দিন থাকবেন, হোটেলে বুকিং দরকার কিনা বুঝতে পারিনি। তবে আপনার যাতে কোনোরকম অসুবিধে না হয়, সে-জন্যে হোটেলে একটা প্রভিশনাল বুকিং রেখেছি।'

মিস্টার বীক যে বেশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক তা বোঝা গেল। আমার পাশে একটা সোফায় বসে পড়ে বললেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ। হোটেলের দরকার নেই—আমরা জাহাজেই থাকবো। বুকিং নাকচ করে দাও; আর ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, এর জন্যে কত খরচ হয়েছে যদি বলো…'

বললাম, 'খরচের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, আমরা আপনাকে আমাদের অতিথি হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম।'

'না, খরচ তোমাদের নিতেই হবে। এই সকালে তোমরা যে খোঁজখবর নিতে এসেছ এইটাই যথেষ্ট।'

বললাম, 'খরচ কিছুই হয়নি—প্রভিশনাল বুকিংয়ের জন্যে আমাদের কোনো ফি দিতে হয় না।'

মিস্টার বীক উত্তর দিলেন, 'কতদিন থাকবো সেটাও আমরা জানি না। কারগো জাহাজ—মাল খালাস এবং মাল তোলার উপর সব নির্ভর করছে। ক্যাপটেন বলছিলেন জাপান থেকে অনেক ইনসেক্টিসাইড এসেছে; সেগুলো নামিয়ে পাটের থলে তুলবেন। গানি ব্যাগ্‌স নিয়ে আবার জার্মানি। ইন এনি কেস্‌, আমাদেরও কোন তাড়াহুড়ো নেই।'

কথার মধ্যে দরজাটা আবার খুলে গেল এবং এবার যিনি প্রবেশ করলেন তিনিই যে বীক-গৃহিনী তা কর্তার সম্ভাষণ থেকেই বুঝলাম। কর্তা বললেন, 'তাই না হনি, আমাদের কোন তাড়াহুড়ো নেই।'

'মাই ডিয়ার ওল্ড বয়, সারাজীবন তোমার তাড়াহুড়োর অন্ত ছিল না; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাজ তোমার সামনে ঘড়ির রিভলভার উঁচিয়ে রেখেছিল, আর কেন?' মিস্টার বীক সায় দিলেন, 'আমার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন—উই উইল টেক ইট ইজি।'

এবার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। হাসতে

হাসতে বললেন, 'ওঁর যুবতীসুলভ মুখ-চোখ ও লাবণ্য দেখে যেন ভুল বুঝো না—উনি আমার থেকে মাত্র কয়েক বছরের ছোট।'

ভদ্রমহিলার দিকে তাকালাম এবার। সত্যি যৌবনটা এখনও মধুর সম্পর্কে দেহে বিরাজ করছে—কর্তা যা বয়েস্ বললেন তা যদি সত্যি হয়, তা হলে ইনি অনেক মহিলার ঈর্ষার এবং তাঁদের স্বামীদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারেন। লম্বায় স্বামীর থেকে কিন্তু অনেক ছোট তিনি। বেঁটেই বলা যায়। তবে কোন পণ্ডিত নাকি বলে গেছেন পৃথিবীর ডাকসাইটে ঐতিহাসিক সুন্দরীদের অধিকাংশই একটু ছোট!

ভদ্রমহিলা কি মিস্টার বীক-এর স্বদেশিনী? মনে হয় না। নাকে যেন একটু মঙ্গোলীয় প্রভাব আছে—গায়ের রঙেও রয়েছে সামান্য মালিন্য। বোধহয় কিছু মিশেল আছে। একটু আনন্দই হল। কর্তার তাহলে কিছুটা প্রাচ্যপ্রীতি থাকবে—অন্ততঃ নির্লজ্জভাবে বর্ণসচেতন হবেন না।

স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে মিস্টার বীক এবার ভিতরে চলে গেলেন। মিসেস বীককে বললাম, 'ইণ্ডিয়া আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।' তিনি ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু স্বামীর এই ধরনের বেয়াড়া ভ্রমণ-পরিকল্পনায় তাঁর যে বিশেষ সমর্থন নেই তা জানাতেও ভুললেন না।

স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে গম্ভীর মুখে বললেন, 'নিছক পাগলামো ছাড়া আর কী বলুন? কোথায় সোজা ইউরোপ চলে যাবো; কন্টিনেন্টটা ঢুঁড়ে বেড়িয়ে আবার ফিরে আসবো, তা নয়—জাহাজে যেতে হবে। যদি জাহাজে যেতেই হয় তাহলে পি অ্যাণ্ড ও, ওরিয়েণ্ট, লয়েডলাইন, লয়েড্ ট্রিস্টিনোর প্যাসেঞ্জার লাইনার রয়েছে। কিন্তু দেখে দেখে কারগো জাহাজ—তাও এক বেখাপ্পা রুটের।'

গভীর দুঃখের সঙ্গে মিসেস বীক একবার সাবধানে দরজার

দিকে দৃষ্টিপাত করলেন—স্বামী আসছেন কিনা। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'কেউ কি বিশ্বাস করবে এই বেয়াড়া রুটের জন্যে তিনি ভাল ভাল জাহাজ ছেড়ে দিয়ে তিন মাস অপেক্ষা করেছেন? অথচ এইটাই আমাদের প্রথম লম্বা ট্যুর।'

মিসেস বীক আমাকে প্রথম পরিচয়েই বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে, আর একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'জাহাজের লোকেরাও আমাদের পাগল ভাবে। আমরা দু'জন ছাড়া কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। আর কি অদ্ভুত পথে আসছি আমরা।'

সৌজন্যের খাতিরে আমাকে ঔৎসুক্য দেখাতে হলো। বীক-গৃহিণী বিবরণ দিতে শুরু করলেনঃ 'ম্যানিলা থেকে আমরা প্রথমে পিছিয়ে গেলাম অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড বন্দরে। সেখান থেকে ফ্রিম্যান্টল। তারপর সোজা জাপানের ইয়কোহামা। এদিকে জিজ্ঞেস করলেই বলে—বৃদ্ধ বয়সের সেন্টিমেণ্টাল জার্নি।'

মিসেস বীক বলে চললেন, 'অথচ লাইফে কোনোদিন জাপানে যান নি—তাহলে সেন্টিমেণ্টাল জার্নি কী করে হয় বলুন তো? এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা কি বলবো—ইয়কোহামায় গেলাম—কিন্তু এক পা দূরে টোকিওটা দেখা হলো না। কতবার রিকোয়েস্ট করলাম—কোনো উত্তর দিলেন না। হাতে সময় ছিল, ক্যাপ্টেন পর্যন্ত সাজেস্ট করলেন জাপানে এসে টোকিও না দেখার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু উনি ঘুরে ঘুরে কেবল পোর্টটা দেখলেন—পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গা থাকতে সীমেনদের রেস্ট-রুমে সময় কাটিয়ে কেবিনে ফিরে এলেন। বললেন, শরীর খারাপ। কিন্তু জাহাজ যেমনি ইয়কোহামা ছাড়লো, অমনি রোগ সেরে গেল!'

মিসেস বীক্-এর কাছে যা জানা গেল, পরের বন্দর কোবে। সেখানে ঘুরে বেড়ালেন খুব। 'তারপর হংকং—

সেখানে আমার এক বান্ধবী থাকে। তার ওখানে একদিন গেলাম—এডিকে যেতে বললাম, কিছুতেই রাজী হল না। আমি একাই গিয়েছিলাম—সুতরাং সে-সময় ও কী যে করেছে জানি না। হংকং থেকে সিঙ্গাপুর। সেখান থেকে পেনাং। পেনাং থেকে সোজা কলকাতা। এইটেই সবচেয়ে বড় স্টপেজ।' বীক-গৃহিণী হয়তো আরও বলতেন; কিন্তু নিজেই থমকে দাঁড়ালেন। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'কি গ্লোরিয়াস ভোরবেলা! তাই না?'

মিস্টার বীক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বললেন, 'সত্যি, অদ্ভুত সুন্দর দিন। ক্যালকাটা আমাদের এইভাবে অভ্যর্থনা জানাবে তা আশা করিনি।'

শ্রীমতী বীক বললেন, 'ম্যানিলাতেও শুনেছি ক্যালকাটা বড় আত্মকেন্দ্রিক—বাইরের কোনো আগন্তুককে তেমন পছন্দ করে না।'

ওঁর কথায় একটু যে বিরক্ত হইনি এমন নয়। বললাম, 'ইতিহাস লিখছে জন্মের প্রথম দিন থেকে কলকাতা বাইরের লোককে স্বাগত জানাচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এক বর্ষামুখর দিনে জোব চার্নক নামে ইংরেজ ভদ্রলোক এই কলকাতাতেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—সেইদিন থেকেই তো এই শহরের শুরু।' মনে মনে ভাবলাম, ঐ সালের পাঁজি পাওয়া গেলে একবার জন্মপত্রটা বিচার করে দেখা যেতো—এত করেও কলকাতা কেন অনেক অতিথির হৃদয় পায়নি।

মিসেস বীক ভদ্রতা রক্ষা করে উত্তর দিলেন, 'আই সি; ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

জাহাজের লাউঞ্জে আর সময় নষ্ট না করে সেদিন ভোর-বেলায় ওঁদের কলকাতা শহর ঘুরে দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

আর সে-সব কথা ভাবতে গেলে সত্যি এখনও বিস্ময় লাগে। মিস্টার বীককে আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, আমি তাঁকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলাম।

কাস্টমস বিভাগের গোলমাল চুকিয়ে আমরা যখন গেটের সামনে এলাম তখন সূর্যদেব একটু প্রখর হতে আরম্ভ করেছেন। অন্যান্য অজস্র টুরিস্টদের ক্ষেত্রে যা করে থাকি এঁদের ক্ষেত্রেও সেইভাবে শুরু করলাম।

গাড়ির পিছনের সীটে বসিয়েছি তাঁদের। আর সামনের সীট থেকে ওঁদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললাম: 'এর আগে এশিয়ার এই অন্যতম বৃহৎ নগরীতে আপনারা কখনও আসেননি মনে হয়। পঞ্চাশ লক্ষ বিচিত্র মানুষের এই বিচিত্র শহর আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এত মানুষ, এত গাড়ি, এত বাড়ি, এত কর্মব্যস্ততা টোকিও ছাড়া এশিয়ার আর কোথাও বোধহয় দেখতে পাবেন না।'

মিসেস বীক বললেন, 'টোকিও সম্বন্ধে কোনো কথা না তোলাই ভাল—হাতের গোড়ায় পেয়েও ওখানে যাওয়া হলো না। এত লোক পৃথিবীর আর কোনো শহরে থাকে না—অথচ শুনেছি কী সুন্দর; যেন ট্যুরিস্টদের রিসেপশন দেবার জন্যেই তৈরি। আমি গিনজা স্ট্রিটের ইম্পিরিয়াল হোটেলে চিঠিও লিখে রেখেছিলাম। পাঁচহাজার ইয়েনের মতো ডেলি ঘর ভাড়া, আর যেখানে খুশি খাও। রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি—স্থকিয়াকু খেলে নাকি ভোলাই যায় না।'

কর্তা বাধা দিয়ে বললেন, তুমি বোধহয় জান ডিয়ার, স্থকিয়াকু গোমাংসের স্ট্যু ছাড়া কিছু নয়—এবং তুমি এখন এমন দেশে বেড়াতে এসেছ যেখানকার বেশীরভাগ লোক গোমাংস খাওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।'

মিসেস বীক-এর উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে

সামলে নিলেন। 'টাটকা চিংড়িমাছ ভাজা, যাকে ওরা তেমপুরা বলে, তার সম্বন্ধে আলোচনা করতে বাধা নেই তো? ইনাগিকু বা তেন-আইচি রেস্তোরাঁর তেমপুরা নাকি ট্যুরিস্টদের পক্ষে মাস্ট। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার একবার জাপানে যাবার ইচ্ছে আছে।' কর্তা তবুও কোনো উত্তর দিলেন না। গৃহিণী এবার আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা আপনাদের এখানে রেস্তোরাঁ-থিয়েটার আছে?'

বললাম, 'দুঃখিত, ওরকম জিনিস কলকাতায় নেই।'

'অথচ ডিয়ার, টোকিওর মিকাডো রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে তুমি থিয়েটার দেখতে পারো।'

কর্তা এখনও কোনো উত্তর দিলেন না; শুধু একমনে রাস্তার নোংরা দোকানগুলোর দিকে তাকাতে লাগলেন। ড্রাইভারকে বলে দিয়েছি, গাড়ি খুব আস্তে আস্তে চালাতে।

গৃহিণীর মন এখনও কলকাতায় পৌঁছয়নি। টোকিও না দেখার বেদনা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তিনি প্রশ্ন করলেন: 'আপনাদের এখানে ফরাসী রেস্তোরাঁ আছে?'

'দুঃখিত, অমন কোনো রেস্তোরাঁ নেই।'

'জার্মান?'

'না।'

'হাঙ্গেরিয়ান?'

'না।'

'মঙ্গোলিয়ান?'

'না।'

'রাশিয়ান নিশ্চয়ই আছে—আপনাদের দেশে রাশিয়ানদের খুব কদর শুনেছি!'

আমার উত্তর শুনে হতাশ হয়ে বললেন, 'ক্রুশ্চভকে কলকাতায় আপনারা এমন রিসেপশন দিয়েছিলেন—পৃথিবীতে

কোনো বিদেশী কখনও তা পান নি ; অথচ রাশিয়ান রেস্তোরাঁ নেই ! কিন্তু আমি জানি, টোকিওতেই অন্ততঃ ছুটো রাশিয়ান খাবারের জায়গা আছে।'

কর্তা বোধহয় আমার অবস্থায় একটু বিব্রত হয়ে বললেন, 'মাই ডিয়ার, তুমি যেসব দেশের নাম করলে সেগুলো সব জড়ো করলেও ইণ্ডিয়ার থেকে ছোট। পঁয়তাল্লিশ কোটি লোক এখানে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় যা রান্না করে তার নাম—ইণ্ডিয়ান কুকিং। ওই দেখো---তারা কীভাবে খায়।'

গৃহিণী এবার খিদিরপুরের নোংরা রুটি-মাংসের দোকান-গুলোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন। 'প্রতিদিন ফর্টি-ফাইভ × টু, অর্থাৎ নব্বই কোটি ডিশ কি এইভাবে তৈরী হয় ?'

'মাই ডিয়ার, তোমার হিসেবের ভুল হয়ে গেল। অঙ্কটা অত সহজ নয়। এখানের অনেক লোকই ছু'বেলা খেতে পায় না। আবার অনেকে হাফ্-ডিশ খেয়ে কাটিয়ে দেয়।'

একটু যে বিব্রত বোধ করছিলাম না এমন নয়। তবে ভ্রাম্যমান বিদেশীদের সঙ্গে দেখা হলে এ-ধরনের প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই বললাম, 'কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়, মিসেস বীক। এই বিরাট দেশের, অগণিত মানুষের ছুর্দশার কথা আমরা লুকিয়ে রাখতে চাই না ; যদিও আমরা জানি একমাত্র আমরা নিজেরাই এর সমাধান করতে পারবো।'

ডক-এর গোলকধাঁধার মধ্যে পাক খেতে খেতে গাড়ি তখন রেমাউণ্ট রোডের দিকে চলেছে। আমি তাঁদের বললাম, 'ক্যালকাটা এখনও ভারতবর্ষের বৃহত্তম বন্দর। ছোট্ট নদী হলে কী হয়, এত সমুদ্রগামী জাহাজ পৃথিবীর খুব কম নদীর বুকেই একসঙ্গে ভাসবার সুযোগ পায়।'

বিদেশিনী তবু কিছু আমার কথা শুনছেন। কিন্তু মিস্টার বীক নিজের মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন—কলকাতা

শহরটাকে হ্যাংলা ছেলের মতো তিনি চোখ দিয়ে গিলে খাবার চেষ্টা করছেন।

ট্রাভেল এজেন্সি বা ট্যুরিস্ট ব্যুরোর গাইডদের সঙ্গে যদি পরিচয় থাকে, তাহলে প্রশ্ন করে দেখবেন কিছুদিন কাজের পরই তাঁরা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো হয়ে পড়েন। একই ইতিহাস, একই বিবরণ, একই মন্তব্য দিনের পর দিন বকে যেতে হয়।

আমার গ্রামোফোন রেকর্ডটাও বীক-দম্পতির উদ্দেশে চালিয়ে দিলাম: 'তেত্রিশ বর্গমাইলের এই শহরের বয়স মাত্র আড়াই শ বছর। ইংরেজরাই এখানে বসতি স্থাপন করেন। ফোর্ট তৈরি করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর রাজত্ব জয় করে ইংরেজরা এইখানেই রাজধানী স্থাপন করেন।'

মিসেস বীক বললেন, 'আই সী।'

আমি বকে চললাম: '১৯১১ সাল পর্যন্ত এইখানেই ক্যাপিটাল ছিল—তারপর দিল্লি।'

'ভেরি ইনটারেস্টিং, এটা জানতাম না তো।'

বললাম, 'এখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। ভারতবর্ষের দুটি বৃহৎ বাণিজ্য এবং শিল্পকেন্দ্রের একটি। ভারতবর্ষের বৃহত্তম রপ্তানি বন্দর আপনারা এখন দেখছেন—পৃথিবীর আর কোথাও এত পাটজাত জিনিস তৈরী হয় না। চা—আপনারা যে চা খেয়ে থাকেন—তাও এখান থেকেই জাহাজে ওঠে।'

দলে দলে লোক তখন রাস্তা দিয়ে চলেছে। গৃহিণী ও কর্তা দুজনেই তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি বলছি, 'এখানে এত বড় বড় বাড়ি আছে যে এক সময় প্রাসাদপুরির কলকাতা বলা হতো।'

'সিটি অফ প্যালেস না বলে, সিটি অফ হিউমান হেড্‌সও বলা যেতে পারে—এতো কালো মাথা আমি কখনও দেখিনি

—অ্যামেজিং; বিউইল্ডারিং অ্যাস্টাউণ্ডিং,' অনেকগুলো ইংরিজী বিশেষণ মিসেস বীক পরপর লাগিয়ে গেলেন।

গাড়ি এবার খিদিরপুর পোল পেরিয়ে গড়ের মাঠের দিকে চলেছে। মিস্টার বীক কিন্তু কোনো কথাই বলছেন না। নির্বাক তিনি নিজের মনে কী দেখছেন কে জানে? মিসেস বীক এবার নিজের মাথার টুপিটা ঠিক করে নিলেন। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়না বার করে মুখের প্রসাধন-অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করলেন—এই সামান্য সময়ের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আমি বললাম, 'ওই যে দেখছেন, ওইটাই আমাদের ঘোড়-দৌড়ের মাঠ। শনিবার দুপুরবেলায় জায়গাটা জনসমুদ্রে পরিণত হবে। অফিসের বড় সায়েব থেকে আরম্ভ করে বেয়ারা, চিত্রতারকা থেকে আরম্ভ করে গৃহবধূ, ভেজিটারিয়ান নন-ভেজিটারিয়ান, গরীব বড়লোক, ছেলে বুড়ো সব এখানে ভিড় করে।'

'হাউ নাইস্! কি সুন্দর দৃশ্য! গাড়িটা একবার দাঁড় করাও তো। ডার্লিং তোমার কী হয়েছে বলো তো? তুমি কি ওই রকম চুপচাপ আফিমখোরদের মতো বসে থাকবে? ক্যামেরাটা দাও। একটা স্ন্যাপ নিই।' গৃহিণী নিজের মনেই ক্যামেরাটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

আমি গাড়িতেই বসেছিলাম। মিস্টার বীক এবার ক্ষিপ্রগতিতে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন; তারপর এমন একটা প্রশ্ন করলেন যা কলকাতার প্রথম দর্শকের কাছে আশা করিনি। তিনি বললেন, 'কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনটা এখান থেকে কত দূর?'

বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এত জায়গা থাকতে কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন! নামটাই বা ভদ্রলোক জানলেন কী করে? বললাম, 'ওটা ভবানীপুরে। এখান থেকে মাইল দেড়েক—সাউথ ক্যালকাটা।'

সায়েব আমাকে বেশ চমকে দিলেন—'হাজরা রোডের কাছে তা আমি জানি। সামনেই একটা পার্ক আছে।'

সায়েবকে বললাম, 'ওখানে যেতে চান নাকি?'

তিনি একটু জড়সড় হয়ে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে দিলেন। 'আমার ওয়াইফকে কিছু বল না। আমি যা বলি তাতে তুমি হ্যাঁ দিয়ে যাবে।'

শ্রীমতী বীক ক্যামেরা ঝুলিয়ে ফিরে এসে দুঃখ করলেন। 'তুমি এনজয় করলে না এডি—এমন দৃশ্য পৃথিবীতে কমই দেখা যায়। এ-রকম খোলা জায়গা যে কোন শহরে থাকতে পারে তা ভাবাই যায় না।'

এডির নার্ভাসনেস্ তখনও কাটেনি, তিনি তাই বিনাদ্বিধায় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। আমি বললাম, 'এই গড়ের মাঠ আমাদের গর্ব। কলকাতার ফুসফুস বলা হয় একে। আমাদের ভাষাতেও এর স্থান হয়েছে। মানিব্যাগ একেবারে ফাঁকা থাকলে বলে—পকেট গড়ের মাঠ!'

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গাড়ি থামানো হল। বিদেশীর কলকাতা-ভ্রমণ তালিকায় এটি থাকবেই। এডিও এবার গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী বীক বললেন, 'এডি, তোমার শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

'না ডিয়ার, এই ওয়াণ্ডারফুল আবহাওয়ায় আমার বেশ ভাল লাগছে, লাঞ্চের পর অফিসের কাজও সেরে ফেলব কিছু। তুমি কী ইণ্ডিয়ান সাপখেলা দেখবে নাকি? কিংবা সাপ এবং বেজির লড়াই? বেজিটা সাপকে মেরে ফেলবে—সাপটার দাম তিন ডলার চাইছে।'

আইরীন বললেন, 'মারামারি কাটাকাটি ভাল লাগে না আমার। অবশ্য কাগজে পড়েছি আমি, ক্যালকাটায় প্রায়ই মারামারি কাটাকাটি হয়।'

'প্রায়ই নয়, কয়েকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে এখানে—এবং তার জন্যে আমাদের লজ্জার অবধি নেই। আমি উত্তর দিলাম।

'তবু তোমরা দাবি করো—শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে তোমরা বহু জনের পথিকৃৎ।

আমার হয়ে মিস্টার বীক এবার উত্তর দিলেন—'কয়েক-জনের অপরাধে সব মানুষকে অপরাধী করা যায় না, আইরীন। আমাদের জন্মকালে দেশে দু-দুবার যে যুদ্ধ হল—সেই অপরাধের কথা ভাবো একবার।'

এবার আমার দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—'আমরা যে-রকম খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করছি, তাতে তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো? কোন শহরের আতিথেয়তা গ্রহণ করে তার বিরূপ সমালোচনা করা উচিত নয়।'

আমি বললাম, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এতে একটুও বিরক্ত হচ্ছি না! কলকাতা যদি সত্যিই কোন অন্যায় করে থাকে, তবে তার জন্যে সমালোচনা সহ্য করবার মত উদারতা থাকা উচিত আমাদের।

আইরীন বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। তাছাড়া তোমরা এডির মধ্যে কলকাতার পক্ষে একজন বড় উকিল পেয়েছ। হংকং, টোকিও, সিঙ্গাপুর সব শহরকে অবজ্ঞা করে—শুধু কলকাতার কথাই ভাবে এডি।'

হাল্কা ভঙ্গীতে, মাথা নত করে এডি বললেন, 'হে সুন্দরী, তোমার অভিযোগের প্রতিবাদ করবার কোন প্রয়োজন দেখছি না।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে আইরীন বললেন, 'খুব পুরনো সৌধ নাকি?'

বললাম, 'মোটেই নয়। ১৯০৫ সালে তৈরি হয়েছে—

অনেকটা তাজমহলের অনুকরণে। ভিতরে মূল্যবান চিত্রশালা আছে।'

সেদিন ভোরবেলায় বীক-দম্পতীকে নিয়ে আরও অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম, তবে সম্পূর্ণ কলকাতা দেখা হয়নি। জাহাজ যখন আগামীকালই চলে যাচ্ছে না, তখন একদিনেই সব শেষ করে দিয়ে লাভ কী? মধ্যিখানে একবার দোকানে বসে কফি খেয়ে নেওয়া গিয়েছিল।

পার্ক স্ট্রীটের ঝলমলে পরিবেশ শ্রীমতী বীকের মনোহরণ করেছিল। ছেলেমেয়েদের কথা বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল। দোকানে ঢুকে কয়েকটা পিকচার-পোস্টকার্ড কিনে ফেললেন। শ্রীমতী বীক বললেন, 'ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে একটা করে কার্ড পাঠাই। একটা পাঠালে ওদের মন উঠবে না।'

মিসেস বীক দোকানে দাঁড়িয়েই কার্ডের পিছনে কয়েক লাইন লিখে ফেললেন। শ্রীযুক্ত বীক বললেন, 'এতেও গোলমাল হবে—কাকে ভাল কার্ড পাঠিয়েছ এই নিয়ে তর্ক হবে।'

মিসেস বীক হেসে ফেললেন। 'ওদের নিজেদের মধ্যে খুব ভাব—আবার ছেলেমানুষের মত ঝগড়াও করবে। আমার খুব ভাল লাগে। ইন ফ্যাক্ট, এডির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারছি ছেলেমেয়েদের জন্যে আমার ডার্লিং-এর মন কেমন করছে। ওরাও বাবা বলতে অজ্ঞান। আমার নিজের হিংসে হয়—হাজার হোক, ওদের পৃথিবীতে আনতে আমি নিশ্চয়ই অনেক বেশী কষ্ট এবং যন্ত্রণা সহ্য করেছি।'

নিজে লেখা শেষ করে, কার্ডগুলো কর্তার দিকে এগিয়ে দিয়ে শ্রীমতী বীক বললেন, 'স্যরি ডিয়ার, প্রায় সব জায়গা নিয়ে নিয়েছি—তুমি শুধু ওদের চুমু পাঠাও।'

মিস্টার বীক পকেট থেকে চশমা বার করে পরে নিলেন।

প্রত্যেক কার্ডেই কিছু কিছু লিখলেন। জাহাজে ফিরে যাবার পথে স্ত্রীর নির্দেশে একটা পোস্ট-অফিসে নেমে টিকিট লাগিয়ে চিঠিগুলো ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন।

আমাদের অফিসে যাবার কোন কথাই ওঠে নি, কিন্তু গাড়িতে বেশ গম্ভীর ভাবে স্ত্রীকে শোনাবার জন্যেই মিস্টার বীক আমাকে বললেন, 'তা হলে তুমি বলছ, আমার আজই লাঞ্চের পর অফিসে যাওয়া উচিত? আমার দুঃখ, বেচারা আইরীনকে একলা বসে থাকতে হবে। কিন্তু জানো, আইরীন কোনদিন আমাকে কাজে অবহেলা করতে দেয়নি।'

মিসেস বীক স্বামীর অভিনয় ধরতে পারলেন না। নিজে থেকেই বললেন, 'অফিসে যখন যেতেই হবে, তখন দুঃখ করে কোন লাভ নেই।'

মিস্টার বীক তখনও বোধহয় সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। তাই বললেন, 'সারা জীবন অফিসটা আমাকে সর্বত্র ছায়ার মত তাড়া করেছে।'

মিসেস বীক এবার মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে একটি তথ্য ফাঁস করে দিলেন। বললেন, 'অফিসকে গালাগালি করতে গিয়েও পারি না; এই অফিসেই তো আমাদের প্রথম পরিচয় হয়।'

মিস্টার বীক হেসে বললেন, 'সে এক বিরাট গল্প।'

আইরীন এবার লজ্জিত ভাবে বললেন, 'আঃ, সেই সব পচে-যাওয়া কথা খুঁড়ে বার করবার কী দরকার?'

'পচেনি, মাই ডার্লিং। স্মৃতির ডিপ-ফ্রিজে সেই অতীতকে বেশ যত্ন করেই রেখে দিয়েছ।

যে-ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে এমন মধুর রসিকতা করছিলেন, লাঞ্চের পর আমাকে একলা পেয়ে তিনি যে এমন পাল্টে যাবেন, তা কল্পনাতীত।

উনি বেশ উদ্বিগ্ন ভাবেই উত্তর দিলেন, 'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, অফিসে গিয়ে নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই। কত দিন, কত বছর ধরে আমি কলকাতায় আসবার জন্যে ছটফট করছি। কত বছর ধরে প্রতিদিন একটা বাক্সে আমি দশ সেণ্ট, কুড়ি সেণ্ট করে ফেলে যাচ্ছি জানো ?'

ভদ্রলোক যে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তিনি যে এবার আমার হাত চেপে ধরবেন তা আশা করিনি। দেখলাম, আমাদের ফিলিপাইন অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমাকে কিছু বলতে চাইছেন ; কিন্তু তাঁর মনের দ্বিধা এখনও কাটেনি। কত ছোট চাকরি করি আমি ; আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে আমার বিরুদ্ধে একটি কথা বলে তিনি আমার চাকরি খেতে পারেন ; তবু অমন সঙ্কোচের সঙ্গে ভদ্রলোক তাকাচ্ছেন কেন ?

এডওয়ার্ড বীক বললেন, 'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি তো ? তুমি বুঝতেই পারছ, অনেক চেষ্টা করে আমি স্ত্রীর হাত থেকে বেরিয়ে এসেছি !'

ভদ্রলোকের কি ফন্দী আছে বুঝতে পারছি না। বিদেশী অতিথিদের মনে কত রকম কুচিন্তার উদয় হয়। আমার পরিচিতা এক মহিলা, গাইডের কাজ করে থাকেন, তাঁর কাছে এ-সব বিষয়ে প্রায়ই বিবরণ শুনে থাকি। তার অনেক কিছুই প্রকাশ্যে আলোচনা করবার মত নয়। আমার পরিচিতা মহিলাটি এ-বিষয়ে প্রায়ই দুঃখ করে থাকেন। সঙ্গী-বিহীন বিদেশী পুরুষ সম্বন্ধে তাঁর মতামত এখন খুবই নীচু ; যদিও তাঁকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করি, যে-কারণে তিনি বিদেশী পুরুষ পরিব্রাজক সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ, আমাদের দেশীভাইদের অনেকে বিদেশ-ভ্রমণের সময় সেই একই কারণে সুরুচিসম্পন্না গাইডদের বিরক্তিভাজন হন !

বিদেশীদের পক্ষে গীতালির সঙ্গে জোরের সঙ্গে কত তর্ক করেছি—কিন্তু এখন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। অনেক চেষ্টা করে বললাম, 'মিস্টার বীক, কী আপনার মনের ইচ্ছা জানি না, তবে আপনি অবশ্যই আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আপনার অসাক্ষাতে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কোন বিষয়ই আমি আলোচনা করবো না।'

মিস্টার বীক বললেন, 'তোমার বাড়িতে টেলিফোন আছে?'

বললাম, 'না। তবে লিট্‌ল রাসেল স্ট্রীটে আমাদের অফিসের গেস্ট-হাউসে ফোন আছে।'

'এই ফোন-নম্বরটা আমি ব্যবহার করতে চাই। আর যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তোমার নামে এখানকার কাগজে আজই একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই। খুবই জরুরী।'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই খসখস করে তিনি একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া লিখে ফেললেন: 'ফিলিপাইনের টনি বীক, আপনি যেখানেই থাকুন, আপনার বর্তমান নাম যাই হোক, আপনি অবিলম্বে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে···নম্বর ফোনে যোগাযোগ করুন। এতে আপনার লাভ হবে। দেরি করলে হয়তো আপনার কোনো উপকার হবে না।'

বিজ্ঞাপনের কোন অর্থই বুঝতে পারছি না। কিন্তু সময় নষ্ট করলে কালকের ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন বার করা অসম্ভব হবে।

মিস্টার বীক বললেন, 'কে জানে হয়তো কাল ভোরবেলাতেই কাগজে বেরোবার পর তুমি টেলিফোন পেতে পারো। যদি পাও, তাহলে কিন্তু এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না। ওকে গেস্ট-হাউসে চলে আসতে বলবে এবং আমাকে তখনই একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিও, আমিও চলে আসবো।'

মিস্টার বীক বোধহয় আমার কাছে সব কিছু প্রকাশ

করতে চান না। কিন্তু আরও কিছু না জানলে সকালে বিপদে পড়তে পারি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিজ্ঞাপনটা পড়ে কোন ভদ্রলোক যদি ফোন করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন করবেন। আমি কি তাহলে বলবো আপনি কলকাতায় এসেছেন?'

মিস্টার বীক যেন কেমন লজ্জায় পড়ে গেলেন। বললেন, 'ভুলেও যেন তার কাছে আমার নাম করো না। শুধু জানিয়ে দিও টেলিফোনে সব কথা বলা যায় না। আপনি গেস্ট-হাউসে চলে এলেই সব জানতে পারবেন। তাকে একটু বসিয়ে রেখো, তারপর আমি এসে পড়লে তোমার আর কোন ভাবনা থাকবে না।'

মিস্টার বীকের মুখটা উত্তেজনায় কেমন হয়ে উঠেছে। নিজের উপরও যেন তাঁর তেমন বিশ্বাস নেই। বললেন, 'আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে হয়তো অমন নিষ্ঠুর হতে পারবে না।'

মিস্টার বীক তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জনসংযোগ-বিভাগের লোক হিসেবে খবরের কাগজে নিশ্চয় তোমার জানা-শোনা আছে। কালকে বিজ্ঞাপনটা যদি না বেরোয় হয়তো আমার সারাজীবনের সুযোগ নষ্ট হবে।'

ভদ্রলোকের এত উত্তেজিত হবার কারণ নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু সে বিষয়ে আমার কৌতূহলী হবার কোন অধিকার নেই। সুতরাং তাঁর ইচ্ছেমত আর সময় নষ্ট না করে সোজা স্টেট্‌স্‌ম্যান অফিসে গিয়েছিলাম।

আগামী কালের কাগজে বিজ্ঞাপনটা ঢুকিয়ে দেবার জন্যে সেদিন আমাকে বেশ চেষ্টা করতে হয়েছিল। যাঁকে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম, বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এত ব্যস্ত হবার কিছু তো দেখছি না। মৃত্যুর খবর হলে, আমারা পরের দিন বার করে দেবার চেষ্টা করি।'

সেই ভদ্রলোকের কাছে সেদিন অনেক অনুনয়-বিনয় করতে হয়েছিল। বলেছিলাম, 'আমি নিজে এখনও তেমন কিছু জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করুন, বিজ্ঞাপনটা খুবই জরুরী।'

কাগজ-অফিসের বাইরে মিস্টার বাঁক আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে অজস্র ধন্যবাদ দিলেন এবং সেই সঙ্গে সাবধান করে দিলেন আগামী কালের কাগজটা যেন মিসেস বাঁকের হাতে না পৌঁছয়। গেস্ট-হাউসের বেয়ারাকে ফোন আসবার কথাটা জানানো প্রয়োজন; সেদিকেই আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করল।

মিস্টার বাঁক নিজের ব্রীফকেসটা কোলের উপর তুলে নিয়ে কি যেন হাতড়াতে লাগলেন। লাল মলাটের একটা পুরনো ডায়রি বার করে তার পাতা উল্টোতে লাগলেন। তারপর সযত্নে ডায়রিটা আবার ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে বললেন, 'তার একটা বর্ণনা তোমাকে দিয়ে রাখা ভাল। যৌবনে তাকে অ্যাপোলোর মত দেখতে ছিল। সতেরো বছরের ছেলের কাঠামো দেখলে মনে হতো সাতাশ বছরের ছোকরা। তার মাথার চুল সোনালী, আর চোখ দুটো ক্যালকাটার নীল আকাশের মত স্বচ্ছ। সে দুটোর দিকে তাকালে তোমার মনে হতে পারে, তুমি তার ভিতরের সবকিছু দেখতে পাচ্ছ; তার সর্বস্ব যেন তোমার জানা হয়ে গিয়েছে। তার হাতগুলো ছিল ঠিক যেন ইস্পাতের স্প্রিং-এর তৈরি। তার মা বলতো, যে-মেয়ে এই ছেলের হাতে আংটি পরিয়ে দেবে, তাকে আমি হিংসে করি। হি হ্যাড এ ওয়াণ্ডারফুল ভয়েস—সুরেলা গলার জন্যে চার্চের সবাই তাকে ভালবাসতো।'

গেস্ট-হাউসের বেয়ারাকে ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝিয়ে

দিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার কোথায় যেতে চান ?'

মিস্টার বীক বললেন, 'এই অপরিচিত বিরাট শহরে আমাকে পথ দেখাবার জন্যে তুমি রয়েছ ; সে-বেচারার জন্যে কেউ ছিল না। সে ছিল সম্পূর্ণ একা।'

ডায়রিটা আবার দেখলেন তিনি। সেটা যে তিনি অনেকবার পড়েছেন তা দেখার ধরন থেকেই বোঝা যায়। সবই বোধহয় মুখস্থ হয়ে আছে তাঁর। বললেন, 'ডক থেকে বেরিয়েই সে একটা ট্যাক্সি করেছিল। চল, আমরাও গাড়িটা ছেড়ে দিই।'

আমি বললাম, 'গাড়ি থাকতে শুধু শুধু ট্যাক্সির হাঙ্গামায় যাবেন কেন ?'

মিস্টার বীক আমার কথা শুনলেন না। একটা পাঁচ টাকার নোট ড্রাইভারের হাতে দিয়ে তাকে চলে যেতে বললেন।

নিজেই তিনি একটি ট্যাক্সি ডাকলেন। বললেন, 'এ-লোকটারও দাড়ি আছে দেখছি—ভালই হয়েছে। তার ট্যাক্সিওয়ালারও মাথায় পাগড়ি এবং মুখে দাড়ি ছিল।'

সায়েব বললেন, 'আমরা প্রথমে যাবো কালিঘাটে।'

আমি বললাম, 'কালিঘাট অনেকেই দেখতে আসেন। হিন্দু গডেস কালী এখানে কয়েক শতাব্দী ধরে রয়েছেন।'

'আমি জানি। কালী-মন্দিরে পশু-বলি দেওয়া হয়।'

কালিঘাটে ট্যাক্সি থেকে নেমে সায়েব অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কয়েকটা ভিখিরী জড় হয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'সায়েব, ওয়ান রুপি চাই। গডেস কালি ব্লেস ইউ।'

ওদের সরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। সায়েব বারণ করলেন। 'জানো, তাকেও ওরা ঘিরে ধরেছিল। সে খুব মজা পেয়েছিল —ব্যাগ খুলে সে ভিক্ষে দিয়েছিল।

নিজের মনেই মিস্টার বীক এবার কী যেন ভাবলেন,

পকেট থেকে পয়সা বার করে ওদের দিলেন, তারপর বললেন, 'আমার ভয় হয়েছিল হয়তো আমি সব দেখতে পাবো না—হয়তো ইণ্ডিয়া এই ক' বছরে অনেক পাল্টে যাবে। কিন্তু ফরচুনেটলি সব ঠিকই আছে দেখছি।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'আমাদের এখানে শিক্ষিত মহলে একটা রসিকতা আছে—তাঁরা প্রায়ই বলেন, 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে!'

মিস্টার বীক ভিতরে যাবেন কিনা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সে ভিতরে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগে একটা গডেসের ছবি কিনেছিল।'

একটু বিরক্তি লাগছিল, মিস্টার বীক বোধহয় কিছুই করবেন না, শুধু সেই রহস্যময় ভদ্রলোকটির পদক্ষেপ অনুসরণ করবেন। ভাবছিলাম, তার কাণ্ডকারখানার এত বিবরণই বা ভদ্রলোক কোথায় পেলেন। খিদিরপুর থেকে যখন যাত্রা শুরু করেছিল তখন সে-ও নিশ্চয় জাহাজে এসেছিল। কী করতে এসেছিল কে জানে।

মিস্টার বীক একটা বাঁধানো কালির ছবি কিনলেন। তিনি তারপর আমার সঙ্গে ভিতরেও ঢুকলেন। ঠাকুর দেখে বেরিয়ে এসে বললেন, 'চল, এবার একটু ঘুরে বেড়ানো যাক।'

'এবার কোথায় যেতে চান?'

'সে-ও কিছু ঠিক করে উঠতে পারে নি। সেদিনের বিকেলটা বেশ সুন্দর ছিল, সে নিজের মনে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছিল। সুতরাং আমাদেরও ঘোরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাস্তার এই ভিড় দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত মানুষকে একসঙ্গে এইভাবে হাঁটতে দেখে সে ভেবেছিল একটা কবিতা লিখবে।'

'কবিতা ?

'হ্যাঁ, তার মনটা ছিল কবিদের মতই। সে ভাবছিল মানুষের এই ভীড়ের কবিতার নাম দেবে 'ঘন অরণ্য'। হয়তো সেই রাত্রেই জাহাজে ফিরে গিয়ে কবিতাটা লিখে ফেলতো। কিন্তু হাজরা রোডের মোড়ে একজন বাঙালী ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল টনির। টনিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ভেবেছিল হয়তো বিদেশী পথ হারিয়ে ফেলেছে। কাছে এসে তাই খোঁজ করেছিল সে কোন সাহায্য করতে পারে কিনা। টনি বলেছিল, সে দেশ এবং মানুষ দেখতে বেরিয়েছে। শুনে খুব আনন্দ হয়েছিল ছেলেটির। বলেছিল, তাহলে আসুন না আমাদের বাড়িতে, কাছেই।'

মিস্টার বীক এবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। 'না, বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। আজ আর দেরি করা চলবে না। আমার স্ত্রী হয়তো সন্দেহ করতে শুরু করবেন।'

একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়ে দিয়ে শুভরাত্রি জানালাম। তিনি বললেন, কাল যেন জাহাজে আবার দেখা করি।

সুতরাং ভোরবেলায় আবার জাহাজে দেখা করেছি। শ্রীমতী বাক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুপ্রভাত জানালেন। বললেন, 'কোন কথা শুনছি না, আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতেই হবে।'

ব্রেকফাস্ট-টেবিলে বললেন, 'কলকাতায় প্রথম রাত্রে ঠিক যেন মড়ার মত ঘুমিয়েছি।' স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন 'এডি, তোমার মুখ-চোখ দেখেও তাই মনে হচ্ছে।'

এডি রসিকতা করলেন, 'ঘুমের ওষুধ গুঁড়ো করে কলকাতার হাওয়াতে মিশিয়ে দেওয়া হয়।'

মিসেস বীক বললেন, 'আজকে আরও ভাল লাগছে, বাচ্চাদের চিঠি এসে পৌঁচেছে ম্যানিলা থেকে। গড যদি

কোন বিষয়ে আমাদের উপর দয়ালু হয়ে থাকেন—সে এই ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে। তাই না এডি?'

এডি সায় দিয়ে বললেন, 'বিলক্ষণ।'

'আমাদের বড়ছেলে ডিক—যেন এক টুকরো হীরে। এঞ্জিনীয়র হয়েছে, কারখানায় নাম খুব—কিন্তু এখনও ছেলেমানুষ। মা-অন্ত প্রাণ।'

মিস্টার বীক জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিক কিছু লিখেছে নাকি?'

'ও লিখেছে, আমাদের ছেড়ে থাকতে ওদের আর এক মুহূর্ত ভাল লাগছে না। ওরা সবাই মিলে একখানা চিঠি লিখেছে—বাবা-মার কাছে আবেদন জানিয়েছে, মাল-জাহাজ ছেড়ে দিয়ে সোজা প্লেনে লণ্ডন চলে যেতে এবং সেখানকার কাজ সেরে, একটুও দেরি না করে ম্যানিলা ফিরে আসতে। দেরি করলে ওরা আমাদের সঙ্গে আড়ি করে দেবে—কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলবে না।'

মিসেস বীক নিজেই হাসতে লাগলেন। 'আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি রকম হয়ে উঠছে দেখো! এরা বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে পর্যন্ত জোট পাকাচ্ছে! আমাদের বড় মেয়ে শীলা—হোম সায়ান্সে এম-এসসি পড়ে, ওকে একটু ভালমানুষ জানতাম—সে-ও দেখছি বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছে।'

মিস্টার বীক মৃদু হাসতে হাসতে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। আমি বললাম, 'আপনাদের সংসারটি সুখের।'

'সমস্ত প্রশংসা আমার এই স্বামীটির পাওনা। ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার জন্যে উনি পাগলের মত পরিশ্রম করে এসেছেন। তাদের কোন ইচ্ছেই তিনি অপূর্ণ রাখেন নি।'

মিস্টার বীক বললেন, 'সকাল বেলায় আমি দাম্পত্য কলহ বাধাতে চাই না। কিন্তু এ-কথা তোমাকে জোর করে বলতে পারি—আমার কৃতিত্ব কেবল এইটুকু যে, আমার ছেলে

মেয়েদের জন্যে আমি একটি ভাল মা নির্বাচন করেছিলাম। ববির কথাই ধরো না, আমাদের থার্ড চাইল্ড—ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র, একদিন কৃষি-বিজ্ঞানে হয়তো আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারে—সে মাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারে না।'

তাঁদের দুটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ের সুদীর্ঘ বিবরণ দিলেন শ্রীমতী বীক। এ-কথাও বললেন, 'আধুনিক মতে আমাদের সংসারটা হয়তো বড়। কিন্তু আমরা খুব সুখী, আমরা কখনও পরিবার-পরিকল্পনার কথা ভাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। ইন ফ্যাক্ট, আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এরা শুধু ভাল নয়, বেশ সুদর্শন স্বভাবে এবং সেদিক দিয়ে আমার এই সুপুরুষ স্বামীটির দান কম নয়। আমার ছবি তো দেখতেই পাচ্ছ।'

আমি হেসে উঠলাম এবং সেই হাসিতে শ্রীমতী বীক নিজেও যোগ দিলেন। মিস্টার বীক বললেন, আইরীন, সকাল বেলায় আর কতক্ষণ এইভাবে ঝগড়া করবে?'

গৃহিণী বললেন, 'আমি এবার তাহলে জামা পাল্টে আসি তুমি ততক্ষণ একে আমাদের ফ্যামিলি-ফটোগুলো দেখাও।'

ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই মিস্টার বীক পাল্টে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বেরিয়েছে?'

বিজ্ঞাপনের কাটিংটা পকেটেই ছিল। বললাম, 'হ্যাঁ, এই দেখুন না।'

মিস্টার বীক বললেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার স্ত্রী যেন এটা না জানতে পারেন।'

বললাম, 'না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'আই ওনলি হোপ, বিজ্ঞাপনটা তার নজরে পড়বে'—বৃদ্ধ মিস্টার বীক নিজের মনেই বললেন।

আমি বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, পূর্বভারতে

এমন কোন বিদেশী নেই যিনি এই কাগজ না পড়েন। যদি তিনি এই দিকে কোথাও থাকেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁর নজরে পড়বে।'

মিস্টার বীকের চিন্তা তবুও গেল না। বললেন, 'তুমি তো এখানে চলে এলে, ইতিমধ্যে যদি কেউ ফোন করে ?'

বললাম, 'আপনি চিন্তা করবেন না। টেলিফোন ধরবার জন্যে লোক আছে। তাকে সব বলা আছে; কেউ ফোন করলে লাঞ্চের সময় তাকে আসতে অনুরোধ করা হবে। সে-সময় আমি থাকবই।'

মিসেস বীক এবার ফিরে এলেন। আমরা আবার শহর-দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। চিড়িয়াখানায় গেলাম আমরা; লেকের ধারেও ঘুরে বেড়ানো হল কিছুক্ষণ। কর্তার অনেক ছবি তুললেন শ্রীমতী বীক। তাদের দুজনকে দাঁড় করিয়ে আমিও দু-একবার ক্যামেরার শাটার টিপে দিলাম।

শ্রীমতী বললেন, 'খুব ভাল লাগছে আমার। মনে হচ্ছে যেন—নতুন করে হনিমুনে বেরিয়েছি আমরা।' স্ত্রীর চোখের জিজ্ঞাসায় কর্তাও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

আনন্দ-উচ্ছল হাসিতে শ্রীমতী বীক বললেন, 'তুমি আমাদের ঘরের বন্ধুর মত হয়ে গিয়েছ। তোমাকে বলতে বাধা নেই—বিয়ের পর মাত্র তিনদিন আমরা মধুযামিনী যাপন করেছিলাম। তখন নাকি অফিসের অনেক কাজ। সারাজীবন আমি এডিকে এইজন্যে গঞ্জনা দিয়ে আসছি। আমার প্রত্যেক মেয়েকে বলে দিয়েছি, বর পছন্দ করবার সময় হনিমুনের কথাটা পাকাপাকি করে নিতে—এক মাসের একদিন কম হলে, আমি অন্ততঃ বিয়েতে মত দেব না।'

মিস্টার বীক একমনে লেকের জলের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছিলেন। শ্রীমতী বীক বললেন, 'কী গো কর্তা আমার, একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছ ?'

কর্তা ততক্ষণে একটা চুরুট ধরিয়েছেন। ধীরভাবে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এ-সব কোন্ সুদূর অতীতের কথা। আইনতঃ এখন আর অভিযোগ করা চলে না, তামাদি হয়ে গিয়েছে।'

'বটে! ম্যানিলায় ফিরি, তারপর তোমার মজা দেখাচ্ছি। আমাদের এই বিরোধটা ছেলেমেয়েদের আদালতে পেশ করবো—দেখি তারা কি রায় দেয়।'

মিস্টার বীক আর একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। 'কলকাতার লোকরা আমাদের ঝগড়াটে ভাববে, ডার্লিং'—মিস্টার বীক এমন ভাবে কথা বললেন যে, আমার মনে হল যেন অভিনয় দেখছি।

মিসেস বীক মধুর ভাবে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, 'জীবনে চাকরি ছাড়া আর কিছুই তো বুঝলে না। সারাক্ষণ তার মধ্যে ডুবে থাকলে।'

মিস্টার বীক যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন এবং ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন তা শ্রীমতী বীকের নজর এড়ালো না। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনও কি তুমি অফিসের কথা ভাবছ এডি? তুমিই না বলেছিলে, রিটায়ার করবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা সমুদ্রের জলে ফেলে দেবে! আমার ভয় হয় তোমার দেখাদেখি আমার ছেলেমেয়েগুলোও না ঘড়ির চাকর হয়ে ওঠে।'

মিস্টার বীক বললেন, 'সত্যি ডার্লিং, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আজও অফিসে একটা মিটিং আছে। এখানকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফিলিপাইন এবং ইণ্ডিয়া ব্রাঞ্চের মধ্যে আরও নিবিড় ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে বিশেষ আগ্রহী। তিনি আমাদের যথেষ্ট আতিথেয়তা করছেন, গেস্ট-হাউসে পর্যন্ত থাকবার অনুরোধ করেছেন, আমাদের এই বন্ধুকে সারাক্ষণের জন্যে দিয়েছেন—এইটুকু আমার দিক থেকে না করলে খারাপ দেখায়।'

মিসেস বীককে জাহাজে ফেলে রেখে আমাদের গাড়ি তীরবেগে শহরের দিকে এগিয়ে চলল।

মিস্টার বীক স্ত্রীকে বলে এসেছেন, লাঞ্চ খেতে জাহাজে ফিরবেন না, অফিসেই সেটা সেরে নেবেন। কাগজে যে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে সেটা তাঁকে আবার দেখালাম। কোন উত্তর এসেছে কিনা জানবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললাম, 'গেস্ট-হাউসে গেলে এখনই জানা যাবে।'

গেস্ট-হাউসে পৌঁছে খোঁজ করলাম আমরা। না, কোন ফোন আসে নি। মিস্টার টনি বীক তো দূরের কথা, সকাল থেকে একবারও গেস্ট-হাউসের টেলিফোন বেজে ওঠেনি। মিস্টার বীক যে সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন, তা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। লাউঞ্জে একটা সোফার উপর তিনি বসে পড়লেন।

বললাম, 'কোথায় আর এখন যাবেন, এখানেই লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যাক, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।'

মিস্টার বীক রাজী হয়ে গেলেন।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'চিন্তা করবার কিছু নেই—সবে তো বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, এখনো অনেক সময় আছে।'

মিস্টার বীক রুমালে মুখ মুছে, আর একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'এমনও তো হতে পারে যে সে আজ কাগজ পড়েনি।'

বললাম, 'তার জন্যে চিন্তা কী? যদি তেমন দরকার হয় তাহলে আগামীকালের কাগজে বিজ্ঞাপনটা আবার ছাপা যাবে। কিছু পয়সা অবশ্য নষ্ট হবে।'

'ভেরি গুড় আইডিয়া। তোমাকে এই ভাবে বিরক্ত করতে আমার লজ্জা হচ্ছে—কিন্তু কী করি বলো! যদি কখনও তুমি ফিলিপাইনে যাও তাহলে আমাকে খবর দিও। আমি তোমাকে এরোড্রোম থেকে নিয়ে যাব।'

'অবসর নিয়ে আপনি কি ফিলিপাইনেই থেকে যাবেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আর কোথায় যাবো? আমার নিজের দেশ আমার কাছে অনেকদিন পর হয়ে গিয়েছে। নিজের শিকড়টা ফিলিপাইনের মাটির ভিতরে অনেকখানি ঢুকে গিয়েছে। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করেছ, আইরীন আমার জাতের মেয়ে নয়—সি ইজ এ লোকাল গার্ল। ম্যানিলায় আমার এক ভারতীয় বন্ধু আছেন—তিনি রসিকতা করে আমাকে ঘর-জামাই বলেন। তাছাড়া, মিশ্র রক্তের আমার ছেলেরা আমার দেশে গিয়ে যথেষ্ট সমাদর পাবে না। তারা মাকে খুব ভালবাসে, মা বলতে তারা অজ্ঞান। শুধু শুধু কেন তাদের কষ্ট দিই?'

বেয়ারা এসে একটা বীয়ারের বোতল নামিয়ে দিয়ে গেল। সেইটা থেকে নিজের গ্লাসে বীয়ার ঢালতে ঢালতে মিস্টার বীক বললেন, 'আমি অতি খারাপ লোক। আমি প্রচুর সিগারেট খাই; মদে আমার অরুচি নেই। বরং একটু বেশী খেয়েই আনন্দ পেয়ে থাকি। সেও আমার মতো হতে পারতো। কিন্তু সে একেবারে ভিন্ন—আমি যদি উত্তর হই, সে দক্ষিণ। সে ছেলে ইচ্ছে করলে ইঞ্জিনীয়র হতে পারতো। সে জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারতো।'

আমাদের খাবার মধ্যেই ঘরের টেলিফোনটা একবার বেজে উঠলো। মিস্টার বীক চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন, 'আমি ফোন ধরবো?'

'আমি দেখছি' বলে ফোনটা ধরলাম। না বাইরের কেউ নয়, আমাদের অফিস থেকেই গেস্ট-হাউসের বেয়ারার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

মিস্টার বীক যেন এই একদিনেই বুড়িয়ে গিয়েছেন, কপালের বলীরেখা কালকের তুলনায় অনেক গভীর হয়ে

উঠেছে। হঠাৎ কাশতেও শুরু করলেন। কাশি সামলে আবার খাওয়ায় মনোযোগ দিলেন।

খাওয়া শেষ করে বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর যদি আমার বুকটা চিরে ফেল, দেখবে কলকাতার একটা ছবি সেখানে গভীরভাবে আঁকা রয়েছে। কত দিনের স্বপ্ন এখানে আসবো। কিন্তু সংসার এমনই জায়গা, তোমার অজান্তেই গ্রাম কেমন হয়ে যাও। তোমার বুড়েমি, তোমার অন্যায়, তোমার অপরাধ ঢাকবার জন্যে তুমি নিজেই হাজার রকম ছল সৃষ্টি করো। আমিও করেছিলাম।'

ডাইনিং-হল থেকে বেরিয়ে আমরা ড্রয়িং-রুমে গিয়ে বসলাম। মিস্টার বাকাকে এ-কথাও বললাম, এখানে অনেক ঘর খালি আছে, ইচ্ছে করলে তিনি কিছুক্ষণের জন্য মধ্যাহ্ন-ভোজনোত্তর নিদ্রা উপভোগ করতে পারেন।

কিন্তু তার মন অন্য কোথাও, অন্য কোন এক কলকাতায় পড়ে আছে। সেখান থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছেন না তিনি। বললেন, 'টনি যখন প্রথম তোমাদের এই শহরে এসেছিল, তখন লাঞ্চের পর কোনো বিশ্রামের জায়গা পায়নি। একটা সাংবা দোকানে খেয়ে, সে আবার হাটতে শুরু করেছিল। তখনও সে জানতো, সামান্য কিছুক্ষণের জন্যেই এখানে এসেছে সে।

ওঁর চোখ দুটো ঘুম চাইছে। তাই বিষয় পরিবর্তন করে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, টনির ফোন এলেই আপনাকে ডেকে দেবো, আপনি এখন একটু ঘুমিয়ে নিন।'

রাজী হলেন না তিনি। বরং আগামী কালের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাটা মনে করিয়ে দিলেন। কাগজের অফিসে যাওয়ার আগে নিজে বেয়ারাকে ফোনের ব্যাপারটা আবার বুঝিয়ে দিলেন -যদি কেউ ফোন করে তাকে যেন চলে আসতে বলা হয়, আমরা এখনই ফিরছি।

চৌরঙ্গী ধরে দক্ষিণ দিক থেকে এসপ্ল্যানেডে আসতে আসতে মিস্টার বীক বললেন, 'টনি এই পথ দিয়েই সন্ধ্যেবেলায় এসেছিল। আমি তোমাকে সব মুখস্থ বলে যেতে পারি। ওরা ট্রামে করে গিয়েছিল। আমি যে ওর ডায়রি এই এতদিন ধরে কত হাজার বার পড়েছি! বাড়িতে রাখিনি অবশ্য। ব্যাঙ্কের সেফ-ডিপোজিটে জমা থাকতো, কখনও বা অফিসের ড্রয়ারে।'

কাগজের অফিসে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে, গেস্ট-হাউসে ফিরে এসে আমরা আর একবার খোঁজ নিলাম। কিন্তু এবারও নিরাশ হতে হল, বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কেউ কোন খোঁজ করেনি।

মিস্টার বীক এবার কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর পক্ষে উচ্চারণ করাও শক্ত—প্যাট টুণ্ডি, প্যাট টুণ্ডি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলেন। বাড়ির নম্বরও দিলেন, সেখানে নাকি এক ইয়ংম্যান থাকে—অরুণ চ্যাটার্জি, তার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রথমে বারণ করেছিলাম। কলকাতার এই সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বিদেশীকে দেখাবার মত কিছু নেই। কিন্তু সায়ের নাছোড়বান্দা। ফলে কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের মধ্যেই ঢুকতে বল। গলির মোড়ে দু'-একটা ভিখিরী বসেছিল, সায়েব তাদের একটা করে টাকা দিলেন। বললেন, 'টনি ওদের একটা করে টাকা দিয়েছিল; তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল—পুরো একটা টাকা যে কেউ ভিক্ষে দিতে পারে তা তারা ভাবতে পারেনি।'

পতিতুণ্ডি লেনের দৃশ্যটা এখনও আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কলকাতার বাসা বাড়িতে কতজন আসে-যায়, কে খোঁজ রাখে? তার মধ্যে কোথাকার কোন অরুণ চ্যাটার্জিকে খুঁজে বার করতে পারবো এমন নিশ্চয়তা ছিল না।

একটা বাড়ির বাইরের ঘরে কয়েকজন ভদ্রলোক তাস

খেলছিলেন। মিস্টার বীক আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলেন, 'ঠিক মিলে যাচ্ছে। টনি যখন এসেছিল, তখনও এখানে তাস-খেলা চলছিল। কতদিন আগের ঘটনা---কিন্তু এখনও একটুও পরিবর্তন হয়নি।'

বাড়িতে কড়া নাড়তে একটি অবিবাহিত মেয়ে বেরিয়ে এল। তাদের বাড়ির সামনে যে কোন সায়েব দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন, তা তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। আমি বললাম, 'কিছু যদি মনে না করেন, এই বাড়িতে অরুণ চ্যাটার্জি থাকেন কি?'

মিস্টার বীক বললেন, 'আশুতোষ কলেজের ছাত্র।'

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। 'আশুতোষ কলেজে তো আমি পড়ি। আর তো কেউ কলেজে পড়েন না! তবে আমার বাবার নাম অরুণ চ্যাটার্জি।'

সায়েবকে বুঝিয়ে দিলাম। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'অরুণ চ্যাটার্জির মেয়ে! অথচ সেদিনও সে কলেজের ছোকরা ছিল। খোকা লিখছে, ওর বয়সী।'

অরুণ চ্যাটার্জি ততক্ষণ নীচে নেমে এসেছেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মাথাজোড়া টাক, সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরেছেন। দরজায় বিদেশী দেখে তিনিও বেশ অবাক হয়েছেন।

সায়েব বললেন, 'আপনাকে বিনা নোটিসে বিরক্ত করবার জন্যে আমি খুবই লজ্জিত মিস্টার চ্যাটার্জি। কিন্তু আপনার কাছে না এসে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করবেন।

অরুণ চ্যাটার্জি তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। সায়েব বললেন, 'আমি সামান্য সময়ের জন্যে কলকাতায় এসেছি —হয়তো এ-জীবনে আর কখনও এখানে আসতে পারবো না। তবে আমি আপনাকে চিনি। আপনি তো আশুতোষ কলেজে পড়তেন? আপনার মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল ছিল তখন।'

'সে কতদিন আগেকার কথা।' অরুণ চ্যাটার্জি বললেন।

'আপনার নামের এবং পোয়েট টেগোরের নামের অর্থ এক। দুটো নামেরই মানে স্বর্গ।' মিস্টার বীক যেন মুখস্থ বলে যাচ্ছেন। আর অরুণ চ্যাটার্জির মানসিক অবস্থা ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আপনারা ভিতরে এসে বসুন। আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার, বসবার তেমন কোন বন্দোবস্ত নেই—হয়তো অসুবিধে হবে।'

ঘরের মধ্যে গিয়ে মিস্টার বীক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পরম আগ্রহে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তীর্থযাত্রী যেন প্রাচীন কালের কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন পর্যবেক্ষণে এসেছেন। মিস্টার বীক অরুণ চ্যাটার্জির হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন, 'আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। টনি বীকের জন্যে আপনি যা করেছিলেন তার জন্যে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সে বড় আনন্দিত হয়েছিল। আপনার উপহারটি সে সযত্নে রেখে দিয়েছিল।'

বিব্রত অরুণ চ্যাটার্জি এবার সোজাসুজি বলেই ফেললেন, তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না।

একটু কেশে নিলেন মিস্টার বীক। 'মনে পড়ে কী, আপনি তখন কলেজের ছাত্র ছিলেন? হাজরা রোডের মোড়ে আপনার সমবয়সী একটি বিদেশী ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল? সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে কলকাতা দেখছিল—আপনি ভেবেছিলেন বেচারা হয়তো পথ হারিয়ে ফেলেছে! আপনি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে আপনাদের বাড়িতে এনেছিলেন—চা খাইয়েছিলেন। একটা ইংরিজী কবিতার বই—টেগোরের গীতাঞ্জলি উপহার দিয়েছিলেন। ছেলেটির কাছে তেমন পয়সা-কাড়ি ছিল না।

আপনি তার সঙ্গে ট্রামে করে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আপনার সম্বন্ধে তার ডায়রিতে সে অনেক কথা লিখে গিয়েছে।'

অরুণ চ্যাটার্জির জীবনে সেটা হয়তো এমন কিছু স্মরণীয় ঘটনা নয়। খানিকক্ষণ চিন্তা করে, স্মৃতির স্টোর-রুম থেকে যেন শেষপর্যন্ত সেই বহুদিনের পুরনো সামান্য ঘটনাটিকে তিনি খুঁজে পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। অনেকদিন আগে একটি বিদেশী ছেলেকে গীতাঞ্জলি দিয়েছিলাম বটে।

'আপনি তাকে বলেছিলেন, যখন তুমি স্বচ্ছন্দে একঘেয়ে স্বাভাবিক সুখের জীবন যাপন করছ, তখন হয়তো তোমার ভাল লাগবে না, কিন্তু যদি কোনদিন দুঃখের দেবতা তার রুক্ষ কঠিন হাত তোমার করমর্দনের জন্যে এগিয়ে দেন, তখন হয়তো এই গানগুলোর মধ্যে তুমি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবে।'

একবার অন্দরমহলে ঢুকে, অরুণবাবু চায়ের ব্যবস্থা করে এলেন। সায়েবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পরিচয়?'

'আমার কোন পরিচয় নেই। একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বহু বছর চাকরি করে আমি আমার চুল পাকিয়ে ফেলেছি। এবার আমার ছুটি মিলেছে। তাই বেরিয়েছি, আমার ছেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে—সেন্টিমেন্টাল জার্নি।'

'টনি আপনার ছেলে?' অরুণ চ্যাটার্জি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

অবাক হয়ে গিয়েছেন অরুণ চ্যাটার্জি। তবে বেশ আনন্দিতও বোধ করছিলেন তিনি। তার মেয়ে এবার চা নিয়ে ঢুকলো। সায়েবের দিকে কাপ এগিয়ে দিয়ে অরুণবাবু বললেন, 'আপনি দেখছি সব মনে রেখে দিয়েছেন। আপনার ছেলে আপনাকে সব চিঠিতে জানিয়েছিল বুঝি?'

মাথা নাড়ালেন মিস্টার বীক। 'চিঠি লেখেনি। বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার পর সে আমাকে একটাও চিঠি লেখেনি।'

'তাহলে ?'

এবার মিস্টার বীকের ভেঙে পড়বার অবস্থা হলো। তাঁর চোখ দুটো ছলছল করছে। ব্যাগ থেকে একটা ছেঁড়া গীতাঞ্জলি বার করলেন। বইটা এগিয়ে নিয়ে বললেন, 'চিনতে পারেন ? আপনার হাতের লেখা।'

'সত্যি তো,' অরুণ চ্যাটার্জি নিজেই যেন এবার সেই পুরোনো দিনটির গর্ভে ফিরে গেলেন।

মিস্টার বীকের ঠোঁটটা একটু কেঁপে উঠল। বললেন, 'সে আমার প্রথম সন্তান। অদ্ভুত মনটা ছিল তার। ঠিক যেন ফুলের কুঁড়ির মত। আমার প্রথমা স্ত্রীর এবং আমার সব স্বপ্ন তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছিল। কিন্তু বড় অভিমানী ছিল সে।

'আমি তার জন্য যে সুখের জীবনের আয়োজন করেছিলাম সে সব ত্যাগ করে এমন ভাবে নিজেকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবে তা কখনও ভাবতে পারিনি। আমাকে না জানিয়ে গোপনে জাহাজে সামান্য একটি চাকরি নিয়ে পালিয়ে গয়েছিল।

'বড় আয়েশী ছিল সে ; আর তেমনি শৌখিন। সমসময় কেতাদুরস্ত থাকতো। জামা-কাপড় পরতে ভালবাসতো। গানে শখ ছিল—কত গানের রেকর্ডই যে কিনতো। আর শখ ছিল গাড়ির—নিজে পছন্দ করে মোটর কিনলে—কিছুদিন পরে পছন্দ হলো না। আবার গাড়ি পাল্টাতে হলো। ওকে আমি তবু এক-আধবার বকতাম, কিন্তু ওর মা কিছুই বলতেন না। ছেলের গান শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন, তখনও প্রায়ই অপেক্ষা করতেন কখন টনি স্কুল থেকে ফিরবে—তাঁকে গান শোনাবে।

'সেই টনি যে জাহাজের খালাসী হয়ে কী করে কাজ করেছিল আমি আজও ভাবতে পারি না।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে একটা কাজ জোগাড় করে সে জাহাজে উঠেছিল। প্যান্ট্রি-তে ডিউটি পড়তো তার- ডিশ ধোয়া, টেবিল মোছা, কিচেন সাফ করা। যে ছেলে টেবিল-ক্লথে সামান্য একটা দাগ পড়লে রাগ করতো, এবং মা যতক্ষণ না টেবিল-ক্লথ পাল্টাতো ততক্ষণ খেতে বসতো না—সে অপরের এঁটো-কাঁটা ধুচ্ছে। জাস্ট থিংক অফ ইট!'

মিস্টার বীকের আজ যেন দুঃখের অবধি নেই। সেই অভিমানী সন্তানটির কথা অপরিচিত বিদেশীর কাছে বর্ণনা করে বোধহয় তিনি কিছুক্ষণের শান্তি পাচ্ছেন।

টনি কখন কী-ভাবে ম্যানিলাতে জাহাজে চাকরি জোগাড় করেছিল মিস্টার বীক জানতেন না। মালবাহী জাহাজ ম্যানিলা ছেড়ে প্রথমে গিয়েছিল অ্যাডিলেড বন্দরে।

'সেখানে খোকা কিন্তু একবারও জাহাজ থেকে নামে নি। জাহাজের ছোকরা সহকর্মীরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল। বলেছিল -কি হে বোকচন্দ্র, জীবনকে উপভোগ করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে না দিলে, জীবন তোমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে। সে কিন্তু কোনো কথায় কান দেয় নি। তার মন তখনও খুব বিষণ্ণ হয়ে ছিল।

'অ্যাডিলেড থেকে ফ্রি ম্যান্টল। তারপর জাপানের ইয়কোহামা। ওর বন্ধুরা টোকিও দেখবার জন্যে দল বেঁধে বেরিয়ে গিয়েছিল। খোকা কিন্তু কোথাও যায়নি। জাহাজ থেকে বেরিয়ে, শুধু কিছুক্ষণের জন্যে সী-মেনদের বিশ্রাম-ভবনে গিয়ে বসেছিল। কোবে বন্দরে এরপর জাহাজ থেমেছিল, সেখানে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সে কিছুটা ঘুরে বেড়িয়েছিল।'

মিস্টার বীক আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা ভাবছ, আমি এ-সব কী করে জানলাম? আমি সব জানি। টনি যে প্রতিদিন ঘুমোতে যাবার আগে জার্নাল

লিখতো। 'বড় সত্যবাদী ছেলে ছিল সে—কোনো পাপ সেই বয়সেও তাকে স্পর্শ করেনি। ওর বয়সে আমি অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিলাম, আমার স্বভাব পায়নি ভাগ্যে—ও হয়েছিল ঠিক ওর মায়ের মতন। সোনার মত খাঁটি।'

'হংকং-এ সে কিন্তু কিছুই করেনি। শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছিল। জ্বর-জ্বর ভাব—ঠাণ্ডা লেগেছিল। তাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু কবিতার বই পড়েছিল। কিসের কবিতা জানো? মৃত্যুর। একটা আঠারো বছরের জোয়ান ছেলে পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে মৃত্যু সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ-বিষয়ে আর আমি চিন্তা করতে চাই না, ভাবলেই মনটা ভেঙে পড়ে। সে বোধহয় মায়ের মৃত্যুবেদনা ভুলবার জন্যে কোনো অবলম্বন খুঁজছিল।'

আমাদের বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ধুরন্ধর পরিচালক মিস্টার এডওয়ার্ড বীক এবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 'আমার কাছে আজ তার ডায়রি, এই বইটা, আর তার স্মৃতিটুকু ছাড়া কিছুই নেই। তোমরা তাকে আপন করে কাছে টেনে নিয়ে আনন্দ দিতে পেরেছিলে। আমার সন্তানের জীবনের একটা দিন অন্ততঃ তোমাদের ভালবাসায় শ্যামল সরস হয়ে উঠেছিল— আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ।'

অরুণ চ্যাটার্জির মেয়েকে কাছে ডাকলেন মিস্টার বীক। তার হাতটা ধরে বৃদ্ধ আদর করতে লাগলেন। বললেন, 'এসব অনেকদিন আগে ঘটেছিল—তখনও তুমি জন্মাওনি।' নিজের পকেট হাতড়ে একটা দামী কলম বার করে তিনি বললেন, 'মাই গার্ল, তুমি আমার একটু উপকার করবে? বল, তুমি এই বুড়োকে কষ্ট দেবে না? তুমি আমার এই কলমটা নাও। আমার কাছে আর কোন প্রিয় জিনিস নেই। তুমি যখন মা হবে, এই কলমটা দিয়ে তখন তোমার ছেলেমেয়েদের অনেক চিঠি লিখো।'

মেয়েটি ইতস্ততঃ করছিল, কিন্তু তার বাবা বললেন, 'উনি ভালবেসে দিচ্ছেন, নাও।'

চোখ মুছতে মুছতে বৃদ্ধ আবার ব্যাগ খুললেন। ইটালিয়ান বনবন-এর একটা প্যাকেট বার করে বললেন, 'আমার কাছে আর কিছু নেই—আপনাকে একটা লজেন্স দিতে পারি কি?' লজেন্সটা নিয়ে অরুণ চ্যাটার্জি মুখে পুরে দিলেন।

সায়েব বললেন, 'এই কলকাতাতেই তার শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল।' এই খানেই তার ডায়রির শেষ পাতা লেখা হয়েছিল।' একটু কেশে মিস্টার বীক বললেন, 'জাহাজের ক্যাপটেন লোকটি ভাল ছিলেন। তিনি আমাকে শুধু তার জিনিসপত্রগুলো ডাকে পাঠিয়ে দেননি, সঙ্গে চিঠিও লিখেছিলেন। জাহাজটা কয়েকদিন কলকাতায় ছিল, রোজই সকালে শহর দেখতে বেরতো। শেষদিনে টনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছে বলে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাহাজ ছাড়বার সময়ের মধ্যে সে আর ফেরেনি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সে ফেরেনি।'

অরুণ চ্যাটার্জি এবং তাঁর মেয়ে সেদিন আমাদের গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনটাও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। কতদিন কত রকমের ট্যুরিস্ট নিয়েই তো ঘুরে বেড়াই—কিন্তু তাঁদের সবাই এডওয়ার্ড আর্থার উইলিয়াম হ্যারাল্ড বীকের মত দুর্ভাগা নন।

মনে মনে কতকগুলো শূন্য স্থান পূরণ করবার চেষ্টা করছিলাম। যে-শ্রীমতী বীককে আমি জাহাজে দেখেছি তিনি তাহলে দ্বিতীয় পক্ষ?

গাড়িতে বসে মিস্টার বীক বললেন, 'আমার প্রথমা স্ত্রী—সি ওয়াজ এ রিমার্কেব্‌ল্ হিউম্যান বিইং। আমার প্রকৃতির ঠিক

উল্টো ছিলেন—ঈশ্বরে এবং ধর্মে বিশ্বাস করতেন। আমি চিরকালই বেপরোয়া—মদ খেতে বসলে আমার খেয়াল থাকে না। জীবনের সব আনন্দ একসঙ্গে উপভোগ করবার লোভ আমার প্রবল। আর তিনি ছিলেন আদর্শবাদী—কোনো কিছুতেই তাঁর আসক্তি ছিল না, দুর্বলতা ছিল না। আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, তবু তাঁর কাছে বহুবার প্রার্থনা করেছি—আমার সন্তান যেন আমার মত না হয়ে তার মায়ের মত হয়। মায়ের ধারাই পেয়েছিল সে।'

আমি ভাবছিলাম, ছেলেরা বাবা-মাকে কত কষ্টই দিতে পারে, নিজের খেয়াল খুশি মত বাড়ি থেকে পালিয়ে টনি এই বৃদ্ধ লোকটির জীবন বিষময় করে তুলেছে। আমি বললাম, 'আমার মা বলেন, ছেলের বাবা না হওয়া পর্যন্ত মা-বাবার দুঃখ তোমরা বুঝবে না।'

মিস্টার বীক কোনো উত্তরই দিলেন না। বললাম, 'এবার সোজা জাহাজে ফেরা যাক—মিসেস বীক হয়তো চিন্তিত হয়ে পড়বেন।'

মিস্টার বীক এবারও কোনো উত্তর দিলেন না। তবে তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম, অনেকদিন অনেক বছর পরে তিনি যেন কিছুক্ষণের জন্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছেন—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামী একদিনের জন্যে বাড়ি ফেরার অনুমতি পেয়েছে। জাহাজের দিকে যাবার জন্যে গাড়ি মোড় ফিরছিল, তিনি বললেন, 'একবার গেস্ট-হাউস ঘুরে যাবে না?'

গেস্ট-হাউসে আমাদের জন্যে কোনো সংবাদই অপেক্ষা করছিল না। মিস্টার বীক জিজ্ঞেস করলেন 'তোমাদের স্টাফ সবসময় টেলিফোন ধরে তো?'

আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম; কিন্তু তবু যেন তাঁর মন ভরছে না। সম্ভব হলে তিনি নিজেই গেস্ট-হাউসে টেলিফোন পাহারা

দেবার জন্যে থেকে যেতেন। আমি সেই প্রস্তাবও দিয়েছিলাম, 'আপনি এবং মিসেস বীক স্বচ্ছন্দে এখানে এসে থাকতে পারেন।'

মিস্টার বীক রাজী হলেন না। একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন, 'না, সে যদি আসে আমি তার সঙ্গে একা দেখা করতে চাই।'

মিস্টার বীককে এরপর আবার যখন দেখেছি তখন শ্রীমতী বীক সঙ্গে ছিলেন। এ যেন অন্য আব এক বীক সাহেব—আমুদে হাসি-খুশি ট্যুরিস্ট, যেমন আমি প্রায়ই দেখে থাকি। মিসেস বীক অভিযোগ করলেন, 'আপনারা আমার স্বামীকে খুব খাটিয়ে নিচ্ছেন। কোথায় দু'জনে মিলে হৈ চৈ করবো, ঘুরে বেড়াবো—তা নয় অফিসের কাজ আমার স্বামীকে এই কলকাতা শহরে পর্যন্ত তাড়া করল।'

মিস্টার বীক মৃদু হাসতে হাসতে সিগারের ধোঁয়া ছাড়লেন। একটা সিগারেট বার করে গৃহিণী স্বামীকে বললেন আগুন ধরিয়ে দিতে। স্বামী আজ্ঞা পালন করলেন।

মিসেস বীক কলকাতায় তোলা তাঁর ছবি দেখালেন। বললেন, 'ভিক্টোরিয়া মেমোবিয়ালের সামনে আমাদের দুজনের ছবিটা কি সুন্দর এসেছে, দেখো। বুড়ো-বুড়ির এই ছবিটা আজই ম্যানিলায় পাঠিয়ে দিচ্ছি; এটা দেখে ছেলেমেয়েরা যে কীরকম হৈ চৈ লাগাবে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমরা দুজনে যদি লুকিয়ে সেখানে হাজির থাকতে পারতাম মন্দ হত না।'

মিসেস বীককে নিয়ে সেদিনও একটু ঘোরাঘুরি করতে হল। আনইউজুয়াল ক্যালকাটা দেখবার বাসনা হয়েছিল তাঁর। তাই চায়না-টাউন, চিৎপুর, নিমতলা, কাশীমিত্তিরের ঘাট পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। কুমোরটুলির কুমোরদের ঠাকুর গড়া, চাকে মাটির খুরি তৈরি করা এবং গণেশ ঠাকুরের

মূর্তি ট্যুরিস্টদের মত আগ্রহ নিয়েই দেখেছিলেন তাঁরা। মিসেস বীক অনেক ছবিও তুলতে লাগলেন এবং সেই ফাঁকে কর্তাকে বলছিলাম, 'আজকের কাগজেও বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে।'

মিসেস বীক কাছে এসে বললেন, 'তোমরা কী সব বিজ্ঞাপনের কথা বলছ?'

কর্তা প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও সামলে নিলেন। 'না, আমার বন্ধুকে বলছিলাম, ইণ্ডিয়ার এই সব শিল্প-কর্ম ঠিকমত বিজ্ঞাপন দিলে বিদেশে প্রচুর বিক্রি হতে পারে। এমন সুন্দর একটা গণেশের মূর্তি যে কী করে মাত্র পঁচিশ পয়সায় বিক্রি হতে পারে, ভাবা যায় না।'

মিসেস বীক বললেন, 'শুনলাম এই এলিফ্যাণ্ট-গড হচ্ছেন সাফল্যের দেবতা। একটা কিনে নিয়ে গেলে কেমন হয়? কেউ রাগ করবে না তো?'

দোকানদার বললে, 'রাগের কিছু নেই, শুধু সিদ্ধিদাতাকে অসম্মান করবেন না, তাহলেই হল।'

'না না, আমরা এঁকে ড্রইং-রুমে সম্মানের সঙ্গে রেখে দেব,' এই কথা বলে মিসেস বীক একটা মূর্তি কিনে নিলেন।

আমাকে খুশি করবার জন্যে বললেন, 'তোমাকে গাইড পেয়ে আমাদের যা সুবিধে হয়েছে! আমরা যেখানে যেখানে যাবো, সর্বত্র তোমার মত একজন লোকাল ফ্রেণ্ড পেলে চিন্তা করবার কিছু থাকতো না।'

মিস্টার বীকের মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন সৌজন্যসূচক প্রতিবাদ করেও আমি সময় নষ্ট করি নি।

সেদিনও অফিসের প্রসঙ্গ তুলে লাঞ্চের আগে শ্রীমতী বীককে আমরা জাহাজে ফিরত পাঠিয়েছিলাম। শ্রীমতী বীকের ক্ষেদোক্তির উত্তরে স্বামী বলেছিলেন, 'কলকাতার এই কয়েকটা দিন কোনরকমে সহ্য করে নাও, তারপর অবশিষ্ট

জীবনের সমস্ত লাঞ্চ তো আমরা একসঙ্গে একই টেবিলে বসে সারবো।'

আমরা আবার গেস্ট-হাউসে ফিরে এসেছি। না, বৃথাই বোধহয় আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, এখনও পর্যন্ত কোন খবর নেই। মিস্টার বীকও বেশ অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। বললেন, 'আমার যাবার সময় তো ঘনিয়ে এল।'

মিস্টার বীক আরও বললেন, 'ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আজ থেকে বাকি দু একদিন তুমি গেস্ট-হাউসে রাত্রি কাটাতে পারো? এই বৃদ্ধের সব আশীর্বাদ তোমার উপর ঝরে পড়বে। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমরা যখন কেউ এখানে থাকবো না, তখন সে আসবে।'

গেস্ট-হাউস বাইরের অতিথিদের জন্যে; আমার থাকবার নিয়ম নেই। কিন্তু মিস্টার বীক ফোনে মিস্টার গর্ডনের সঙ্গে কথা বলে আমার থাকবার অনুমতি করিয়ে দিলেন।

মিস্টার বীক বললেন, 'এতদিন ধরে টনির ডায়রিতে যা পড়েছি, স্বচক্ষে সে সব দেখে গেলাম, এইটুকু সান্ত্বনা রইল আমার।'

রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমিও আশা করেছি, এই বোধহয় টেলিফোন বেজে উঠবে। এই হয়তো ফোনের ওধার থেকে কোন অপরিচিত ইউরোপীয় কণ্ঠ বলে উঠবে, 'আমার নাম টনি বীক। আপনার বিজ্ঞাপন পড়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তাই ফোন করছি।'

আমি বলব, 'আপনি এখনই চলে আসুন। আপনার বাবা—এই দীর্ঘদিন ধরে যাঁর সঙ্গে আপনি কোন সংযোগ রাখেননি—তিনি আপনাকে অন্ততঃ একবার দেখতে চান।'

এর পরই আমি গাড়ি নিয়ে ডকে ছুটবো, বৃদ্ধ মিস্টার বীককে কোন একটা ছুতো দেখিয়ে ডেকে নিয়ে আসবো।

আমার চোখের সামনে পিতা-পুত্রের মিলন হবে। কিন্তু কই? টেলিফোনটা যেন মরে পড়ে রয়েছে—ওটা বোধহয় আর কোনদিনই বাজবে না। কিন্তু টেলিফোনটা তুলে কানে দিয়ে দেখলাম, ঠিকই আছে, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

নানা চিন্তায় ঘুম আসতে চাইছিল না। এম ভি ড্রিম-ফ্লাওয়ারের প্যাসেঞ্জার কেবিনে একজন বৃদ্ধ টুরিস্টও তখন হয়তো তাঁর ঘুমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নানা চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন। কিংবা হয়তো এই স্ত্রীর মুখেব ওপর বহুদিন পূর্বে মৃতা আর একটি নারীর মুখচ্ছবি দেখতে তিনি পাচ্ছেন। ভুলেই তো ছিলেন--এতদিন, এত কাজের মধ্যে, সংসারের কোলাহলে, অন্য সন্তানদের সান্নিধ্যে পুরনো দিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে বেশ তো ছিলেন। হঠাৎ এমন ভাবে কারগো জাহাজে কলকাতায় আসবার খেয়াল হল কেন? আর যদি বা সেই ইচ্ছা হল, এতদিন পরে কেন?

নিরুদ্দেশ সন্তানের খোঁজে অনেক আগেই তো কলকাতায় আসতে পারতেন একবার। তখন বোধহয় সাহস হয়নি; কিংবা হয়তো তখন নতুন পারিবারিক পরিবেশে সেই অপ্রীতিকর স্মৃতিটুকু ভুলে থাকতে সফল হয়েছিলেন।

পরের দিন গেস্ট-হাউসে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে আমারই সামনে বসেছিলেন মিস্টার বীক। স্নায়ুগুলো এই ক'দিনের উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বলছিলেন, 'সে আসবে না। বিজ্ঞাপন নজরে পড়লেও সে আসবে না।'

আমি বললাম, 'তিনি যে এখানেই আছেন, তা জানলেন কী করে? এখানে তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল এই পর্যন্ত। তখনই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিনা কে জানে?'

মিস্টার বীকের হুইস্কির গেলাস-ধরা হাতটা সামান্য কেঁপে

উঠল। গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'এই কলকাতাতেই শেষ যেদিন সে বেড়াতে বেরিয়েছিল সেদিন তার পকেট মারা যায়। কারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল। জাহাজের এজেন্টদের কাছে যেতে পারতো সে। তাঁরা তাকে পরের বন্দর এডেনে জাহাজ ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু সে কিছুই করেনি। না খেয়ে না দেয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে সে স্যালভেসন হোমে রাত্রি কাটিয়েছিল। জাহাজের কাজে ফিরে যাবার ইচ্ছেও তার ছিল না।'

'যখন ওর টাকাকড়ি চুরি যায়, তখন কি সে মত্ত অবস্থায় ছিল? কলকাতার নোংরা বারে সস্তা গণিকার সান্নিধ্যে ফুর্তি করতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছে, এমন অনেক নাবিককে দেখেছি।' আমি বললাম।

কিন্তু মিস্টার বীক যা উত্তর দিলেন, তা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। হয়তো নেশা ধরেছে, তাই বললেন, 'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, আই উইশ ইট ওয়াজ সো, সে যদি মদ খেতো, নগদ মূল্যে নারীর সাহচর্য ক্রয় করতো, তার দেহ উপভোগ করে আমার উপর প্রতিশোধ নিত তাহলে আমার কিছুই বলবার থাকতো না। সত্যি বলছি, আমি তাহলে খুব খুশি হতাম।'

আমি চমকে উঠেছিলাম। এসব কী বলছেন আমাদের ম্যানিলা অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর? তিনিও বোধহয় হঠাৎ হুঁশ ফিরে পেলেন। সোজা হয়ে উঠে হুইস্কির গেলাসটা একটু দূরে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু এমন কিছু ড্রিংক করেননি তিনি—মাত্র তিন গেলাস।

মিস্টার বীক আমার মুখের দিকে নিজের মনেই তাকিয়ে রইলেন। তারপর টেলিফোনটা কাছে টেনে নিয়ে, পকেট থেকে রুমাল বার করে ওটাকে পরিষ্কার করে আদর করতে লাগলেন—যেন ছোট একটা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছেন,

যেন পরম মূল্যবান বস্তু—যার মাধ্যমে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সংবাদ এখনই হাজির হবে।

আমাকে বললেন, 'আমার এক সহকর্মী, এখন মধ্যপ্রাচ্যে বড় বড় গভর্নমেণ্ট অর্ডার ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়, সে টনিকে চিনতো। সে-ই তাকে দেখেছিল—পাদ্রির বেশে জেরুজালেমের পথে। একা একা চলেছিল তীর্থযাত্রায়। আর তখনই সে খবর পেয়েছিল, টনি কলকাতার কাছে কোথায় যেন প্রভুর সেবায় নিজেকে উৎসর্গিত করেছে। কলকাতার স্যালভেসন হোমে কার সঙ্গে টনির দেখা হয়েছিল —তখনই সে পেয়েছিল নতুন পথের সন্ধান।'

একটু থামলেন মিস্টার বীক। তারপর বললেন, 'কিন্তু সে কখনও আমাকে একটা লাইনও লেখেনি। কতদিন আমি ভেবেছি, আজকের ডাকে হয়তো তার চিঠি আসবে। কিন্তু কোথায় চিঠি?

'আপনি নিজে কোনো খোঁজ করেন নি?'

'করেছি বইকি। জানাশোনা লোকদের কত চিঠি লিখেছি—একবার এখানকার কাগজেও একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। কিন্তু সে উত্তর দেয়নি।'

মিস্টার বীকের চোখ ছল ছল করছে। বললেন, 'আমি জানি সে আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়।'

একি, মিস্টার বীক কাঁদছেন! কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'হি ওয়াজ এ স্টাইলিশ বয়—নতুন নতুন স্যুট পরতে ভালবাসতো। ছ' জোড়া জুতো ছিল তার, তবু সে খুঁতখুঁত করতো। প্রতিমাসে সে ঘড়ির ব্যাণ্ড পাল্টাতো। আর দামী দামী রেস্তোরাঁয় খেতে ভালবাসতো। ডিউই বুলেভার্ডএর ওপর কাফে ইন্দোনেশিয়াতে প্রায়ই যেতো সে, আর যেতো বুলাকেনা রেস্তোরাঁয় রোস্টেড সাকলিং পিগ খেতে, যাকে ওরা বলে লেচঁ।'

আমার ডান হাতটা ধরে মিস্টার বীক বললেন, 'ডু ইউ

নো, আমার বন্ধু যখন তাকে দেখে তখন তার জুতোয় তিনটে তালি ছিল। তার ট্রাউজারের পায়ের কাছটা ফেটে সুতোর ঝুরি নেমেছিল। আমার বন্ধু তাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে যাচ্ছিল—সে রাজী হয়নি। বলেছিল পৃথিবীতে আরও অনেক জরুরী কাজের জন্য পয়সার প্রয়োজন রয়েছে।

'আমার বন্ধু বলেছিল, "টনি, আমি তোমার বাবার বন্ধু, তোমার জন্মের দিনেও আমি নার্সিং-হোমে গিয়েছিলাম। তুমি যদি কিছু মনে না করো, তোমাকে একজোড়া জুতো কিনে দিতে চাই আমি।"

রাজী হয়নি টনি। জিজ্ঞেস করেছিল, জুতোর দাম কত। পিতৃবন্ধু বলেছিলেন, তা ছ' দীনার হবে

'অর্থাৎ ৬ পাউণ্ড! ওই টাকায় ওষুধ কিনে দুটো মৃত্যুপথযাত্রীকে আমি বাঁচাতে পারি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, টাকাটা আমায় দিতে পারেন।'

জুতোর বদলে তিনি টনির হাতে অগত্যা টাকাই দিয়েছিলেন। টাকা পকেটে পুরতে পুরতে টনি বলেছিল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ। পৃথিবীতে টাকার অনেক দরকার রয়েছে। এই যে জোর্ডান এবং বেথ্‌লহেমে এসেছি, এতেও আমার স্বার্থ রয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন একজন দানশীল নিঃসন্তান বৃদ্ধ; আমাকে একটা ছোট্ট হাসপাতাল করে দেবেন আশা দিয়েছেন।'

ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন বন্ধু। টনি দেয়নি। 'আমার খবরও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি'—মিস্টার বীক রুমালে নিজের কপালটা মুছতে মুছতে বললেন।

কোথায় ইওরোপ, কোথায় ম্যানিলা, আর কোথায় জেরুজালেম। ট্যুরিস্ট গাইড আমি নিজের অজ্ঞাতেই কখন যেন বীক-পরিবারের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি।

ক-টা দিন কেমনভাবে যেন কেটে গেল। মোটর ভেসেল ড্রীমফ্লাওয়ারের বন্দরের কাল এবার সমাপ্তপ্রায়। অথচ আমাদের প্রতীক্ষা শেষ হলো না। আমরা এখনও টনি বীকের আবির্ভাবের আশায় টেলিফোন ধরে বসে আছি।

কিন্তু আগামী কাল ভোরে সূর্য ওঠার আগেই ভাগীরথীর বুক থেকে ড্রীমফ্লাওয়ারের নোঙর উঠে যাবে। পাইলটের প্রদর্শিত পথে, উদীয়মান সূর্যের ক্ষীণ আলোকে যে জাহাজটা মন্থর গতিতে লোহিত সাগরের উদ্দেশে পাড়ি দেবে, তারই একটি কেবিনে তখনও হয়তো নিদ্রাহীন সজল চোখে শুয়ে থাকবেন শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড বীক।

কে জানে, আশার শেষ নেই। তাই এতদিন টেলিফোনকে কেন্দ্র করে নিষ্ফল প্রতীক্ষায় থেকেও এখনও সম্পূর্ণ হতোদ্যম হইনি আমি। কে জানে, আমাদের এই পূর্ব ভারতের কোনো অখ্যাত পল্লীর কোনো এক অখ্যাত সেবাসদনে কুষ্ঠরোগীর সেবারত কোনো অভিমানী খ্রীষ্ট-সেবক হয়তো শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করবেন। নিজের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে, সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপনে আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি হয়তো আমাদের সঙ্গে সংযোগ করবেন।

এই ক'দিন যেন নেশার মধ্য দিয়ে কেটে গিয়েছে আমার! এতটা না করলেও কেউ কিছু হয়তো বলত না আমাকে। কিন্তু আমি কখন যেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি।

মিস্টার বীক আজও গেস্ট-হাউসে বসেছিলেন। বলছিলেন, 'আমার স্ত্রী বোধহয় সন্দেহ করছেন। আমার অবস্থা দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কলকাতার আত্মা আমার বুকের উপর ভর করে বসে আছে, আমার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।'

আজও মিস্টার বীক ড্রিংক করতে শুরু করলেন। চার পেগ স্কচ হুইস্কি সোডা ছাড়াই দ্রুত গলা দিয়ে নামিয়ে দিলেন।

এদিকে কলকাতার বুকে সন্ধ্যা নেমেছে। মিস্টার বীক গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। হুইস্কির গেলাসটা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কাল এমন সময় আমরা বঙ্গোপসাগরের বুকে।'

ওঁর চোখ দুটো যে ছল ছল করছে তা বোঝা যাচ্ছে। গেলাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, 'আমি তার সঙ্গে একবার কেবল দেখা করতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস কর, আমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমি তো কিছু টাকা পাচ্ছি রিটায়ার করে। তাছাড়া টনির মায়েরও কিছু ছিল। আমি তার হাতে আমার সামর্থ্যমত কিছু দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আর আমি টনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ওর হাত দুটো চেপে ধরে একবার ক্ষমা প্রার্থনা…'আরও কি যেন বলতে গিয়ে মিস্টার বীক থেমে গেলেন।

আমি তখনও সব বুঝতে পারছি না। অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া সন্তানের জন্যে বৃদ্ধ পিতার মানসিক বেদনা বুঝি, কিন্তু তিনি নিজে কী এমন দোষ করেছেন যে ক্ষমা চাইতে হবে?

এখনও আমাদের প্রতীক্ষার শেষ হয়নি। হয়তো টেলিফোনটা এবার বেজে উঠবে। কিন্তু কই? ঘড়িতে রাত দশটা বাজল।

মিস্টার বীককে বললাম, 'আর ড্রিংক না করাই ভাল। বরং সামান্য কিছু খাবার খেয়ে নিন।'

'লাস্ট সাপার ইন ক্যালকাটা', মিস্টার বীক একটু অপ্রকৃতিস্থভাবেই বললেন।

তখন প্রায় এগারোটা। জাহাজে ফিরতে আরও দেরি করলে মুশকিল হবে। পোর্ট এরিয়ায় প্রহরারা গোলমাল পাকাতে পারে। বললাম, 'এবার উঠতে হয়।'

মিস্টার বীক যেন তাঁর মনোবল সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন—সম্মোহিত রোগীর মত আমার কথাতে রাজী হয়ে গেলেন।

একটা ট্যাক্সি ধরা গেল। কোনরকমে গাড়ির মধ্যে টেনে তুললাম তাঁকে, ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছে! তখন নিজের খেয়ালে মিস্টার বীক জিজ্ঞেস করলেন, 'না গেলে কেমন হতো? আমার ছেলে যেমন বোট মিস করেছিল, তেমন করলে কী খারাপ হতো?'

বললাম, 'আবার আসবেন। কলকাতায় আপনাদের সর্ব সময়ের জন্যে আমন্ত্রণ রইল।'

'না না, আর আসবো না। কেন আসবো? সে আমাকে একবার সাক্ষাতের সুযোগ দিল না।' সায়েব যে কাঁদছেন তা ট্যাক্সির সর্দারজীও বুঝতে পেরে গিয়েছে। রসিকতা করে সর্দারজী জানতে চাইলে, 'দারুর মাত্রা যাদা হয়ে গিয়েছে বুঝি!'

সর্দারজী আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবলে তাতে আমাদের কিছুই এসে যায় না। বেচারা মিস্টার বীককে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আপনি অযথা টনিকে দোষ দিচ্ছেন। তিনি সত্যিই হয়তো বিজ্ঞাপনটা দেখেন নি।'

'আই অ্যাম নট এ ফুল। আমি এতদিন ধরে একটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলাম—আমার মাথায় সামান্য একটু ঘিলু আছে নিশ্চয়'—মিস্টার বীক বারবার বলতে লাগলেন। খিদিরপুরের ডকের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছি। আমারও পোর্টকমিশনারের পাস ছিল। এতরাত্রে কোনোদিন যে ডকের ভিতরের রূপ দেখবার সুযোগ হবে ভাবিনি। এ-যেন আর এক জগৎ। একটু যে ভয় ভয় করছিল না এমন নয়। হয়তো আর কোনদিন এমন অবস্থায় মত্ত নাবিকদের বিচিত্র জগৎ নিজের চোখে দেখবার সুযোগ পাবো না।

দূরে একটা জাহাজ দেখতে পাচ্ছি—যেন কোনো বিষণ্ণ গৃহবধূ-স্তিমিত আলোর তলায় দাঁড়িয়ে বিপথগামী স্বামীর গৃহপ্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করছে। এখানে বোধহয় কখনও

গভীর রাত্রির আহ্বানে নিঃশব্দচারিনী ঘুমের পরীরা নির্ভয়ে নেমে আসে না—সমস্ত রাত ধরে নির্লজ্জ সমাজ-ছাড়া মানুষদের যাতায়াত চলে এখানে।

তবু বেশ ভাল লাগছে—বেশ একটা নতুন অনুভূতির শিহরণ অনুভব করছি সর্বদেহে। আকাশেরও আজ ঘুম নেই—দুরন্ত পৃথিবীশিশুর নিদ্রার সুযোগ নিয়ে নক্ষত্রমাতারা যেন আকাশে গল্পের আসর পেতেছেন। শুধু আমি নয়, মস্ত মিস্টার বীকও থমকে দাঁড়িয়ে, অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিস্টার বীক পাথরের মত নিশ্চল হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী ভাবছেন তিনি? কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্ররা হঠাৎ এমন ভাবে তাঁর মনের কাছে হাজির হল কেন? যেন তাঁর কত নিকটজন।

মিস্টার বীক এবার হঠাৎ আমার হাতদুটো সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি কি এবার সম্পূর্ণ উন্মত্ত হয়ে উঠলেন? না, ভয় পেয়েছেন তিনি? কোম্পানির ট্যুরিস্ট গাইড হতে গিয়ে এই রাত্রে বেশ ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। আমার বাড়ির লোকরাও নিশ্চয় এতক্ষণে ভাবতে শুরু করেছে।

আমার হাতদুটো এবার আরও জোরে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে মিস্টার বীক বললেন, 'আই অ্যাম এ লায়ার, পৃথিবীতে আমার থেকে বড় মিথ্যাবাদীর এখনও জন্ম হয়নি—আমি তোমাকে এতদিন কিছুই বলিনি। কেবল নিজে যাতে তোমার চোখে ছোট না হই তার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেন আমার খোকা, তার মায়ের নয়নের মনি, আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তা তোমরা জাননা।'

আমি কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের দুটো হাত আমার কাঁধের উপর রেখে

বললেন, 'আমি মানুষ নই, আমাকে একটা পশু বলতে পারো। আমার মত ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জন্তুর ঔরসে কেমন করে টনির মত সন্তান হল, বলতে পারো ?'

আমি তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মাঝদরিয়ার জাহাজগুলো দেখছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটা অতিকায় ডাইনোসেরাস যেন রাত্রের অন্ধকারে ঘুমোচ্ছে। নেশার ঘোর কাটিয়ে মিস্টার এডওয়ার্ড আর্থার বীক কাঁদতে কাঁদতে তখন কলকাতার কাছে শেষ বিদায় নিচ্ছেন, বলছেন 'আই মাস্ট কনফেস্—কারও কাছে আমার পাপের স্বীকারোক্তি না করলে, আমি শান্তি পাবো না।'

কত লোক আমাকে প্রশ্ন করেছে, টনি কেন বাড়ি থেকে পালালো। আমি কত মিথ্যে কথা বলেছি—তার নামে কত অপবাদ দিয়েছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য জানে তু'জন—সে এবং আমি। আর একজন—সে-ও হয়তো জানতে পারতো—সে আইরীন, যাকে তুমি জাহাজে দেখেছ। কিন্তু সে তখন নেশার ঘোরে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে আমার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সে খেয়াল করেনি ; কিন্তু আমি টনিকে দেখতে পেয়েছিলাম—জানলাটা বন্ধ করবারও খেয়াল হয়নি, আর সেইখানে দাঁড়িয়ে নিজের চোখ তুটোকেও সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।'

মিস্টার বীক এবার বেশ হাঁপাতে লাগলেন। এবং সেই অবস্থায় বলতে লাগলেন, 'টনি বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তার বাবা একটা পশু। আমি অবশ্য সব সময় জানতাম, টনির মা-ও বোধহয় তার কিছুটা জানতো। তারই মৃত্যুশয্যায় টনি দেখেছিল আমি তার হাতটা ধরে ঝরঝর করে কাঁদছি। বলছি, আমারও পৃথিবীর আলো যে নিভে আসছে। টনির মা বলেছিল, টনিকে দেখো।'

'এবং টনি ও তার মা আমাকে বিশ্বাস করেছিল। আইরিনকে দেখেছ তো, ফিলিপাইনের লোকাল মেয়ে, মিশ্রিত রক্ত—আমাদের অফিসের টাইপিস্ট ছিল। আমি ছিলাম একটা পশু—আমার কামনা সংযত করবার কোনো ব্রেক ছিল না। আমার দুঃসাহস এবং স্পর্ধাও সব সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর পর টনি হোস্টেলে ফিরে গিয়েছিল। এবং শনিবারের দুপুরে আইরীনকে আমি অফিস থেকে সোজা বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। আমার মাথায় এইটুকু বুদ্ধিও আসেনি যে, টনি সেদিন বাড়ি ফিরতে পারে।' ...মিস্টার বীক এবার যেন কোনো তিতো ওষুধ খাচ্ছেন।

মুখবিকৃত করে বললেন, 'টনি সেদিন আমাকে ও আইরীনকে এক বিছানায় দেখেছিল—তার মায়ের মৃত্যুর পর তখনও দু'সপ্তাহ কাটেনি।'

মিস্টার বীক আর কিছু বলতে পারছেন না। তাঁর মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে; কিন্তু তাঁর অনুতাপদগ্ধ দেহটা যে চরম আত্মগ্লানিতে বার বার কেঁপে উঠছে তা বুঝতে পারলাম। তিনি বললেন, 'আমি তার চোখজোড়া দেখতে পেয়েছিলাম, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক শকে যেন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ধরতে পারিনি। সেই যে বাড়ি থেকে সে একবস্ত্রে চলে গিয়েছিল আর ফেরেনি।'

নিজের জামার হাতা দিয়ে মিস্টার বীক বার বার চোখ মুছতে লাগলেন। বললেন, 'আমার পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমি ভেবেছিলাম, সে হয়তো রাগ করেছে, দুঃখ পেয়েছে—হয়তো সে হোস্টেলেই ফিরে গিয়েছে। কিন্তু সব ভুল।'

'আইরীন এসবের কিছুই জানে না। কেউ যে আমার

ঘরে উঁকি মেরেছিল তা সে আমার ব্যস্ততা দেখে বুঝেছিল, কিন্তু সে যে কে, তা সে আজও জানে না।

চোখটা আবার মুছতে মুছতে বৃদ্ধ মিস্টার বীক বললেন, 'তারপর এই এতদিন ধরে নিজেকে আমি সংশোধন করবার চেষ্টা করে আসছি। আমার পাপের ক্ষমা নেই আমি জানি ; তবু দোষ-স্খালনের জন্যে আমি আইরীনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আইরীন নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিল—আজও সে তার জন্যে আমার কাছে কৃতজ্ঞ ; আমার সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উঁচু ; কিন্তু আসল কারণ সে জানে না।'

'এই এতদিন ধরে প্রতিদিন আমি সব ভুলে যাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কই, পারলাম কই ? নিজের সামনে নিজে একলা দাঁড়াবার সাহস পর্যন্ত হয় না।'

বিস্মিত আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁর মুখটা আর একবার দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পরম লজ্জায় মিস্টার বীক তাঁর মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। সেই ভাবেই তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং বিদায় নেবার আগে বললেন, 'যদি কোনোদিন টনির সঙ্গে তোমার কোথাও দেখা হয়ে যায়, তাকে বলো তার বাবা তার ক্ষমাপ্রার্থী ; সে যেন আমাকে ক্ষমা করে।'

টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে হঠাৎ। আকাশের অনেক তারাও এরই মধ্যে মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মাথার টুপিটা কপাল পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে, নিঃসঙ্গ অনুতপ্ত বৃদ্ধ বিদেশী টুরিস্ট এডওয়ার্ড আর্থার উইলিয়ম হ্যারান্ড বীক ক্লান্ত পদক্ষেপে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বৈবাহিক

উচ্চ সরকারী কর্মচারী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, প্রখ্যাত শিল্পপতি, গণ্যমান্য নাগরিক, দেশ-বিদেশের কূটনৈতিক সদস্য এবং প্রভাবশালী সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিকেল চারটে বেজে তিন মিনিটের সময় শুভশঙ্খনিনাদ এবং বিপুল করতালির মধ্যে রাজ্যের মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী যখন শহরের কেন্দ্রস্থলে শুভবিবাহ প্রাইভেট লিমিটেডের প্রস্তাবিত গগনচুম্বি 'প্রজাপতিভবন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন, তখন ইনভ্যালিড চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রী প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর স্বহস্তলিখিত শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করলেন। শরীরিক অসুস্থতার ফলে এই পরম আনন্দময় মুহূর্তে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকতে পারার জন্যে তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর বক্তৃতার পূর্বে প্রাচ্যবিদ্যা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর পণ্ডিত শম্ভুচরণ সেনশাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহোদয় যখন পবিত্র মাঙ্গলিক স্তোত্র পাঠ করে প্রজাপতি ঋষির শুভাশীর্বাদ কামনা করলেন তখন চন্দ্র-নাথের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হচ্ছিল।

মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বললেন, স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যবসায়িক প্রতিভার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে শুভবিবাহ প্রাইভেট লিমিটেডের অগ্রগতি আমাদের কর্মোদ্যমের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কন্যাদায় ও পুত্রদায়গ্রস্ত পিতামাতাদের মধ্যে সংযোগসাধনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণের যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে এই প্রস্তাবিত ভবনে ভাবীকালের বহু সার্থক, সফল এবং সুখময় বিবাহবন্ধনের ভিত্তি স্থাপিত হবে এবং শুভবিবাহ প্রাইভেট লিমিটেডের কার্যক্রম কালক্রমে এমন বিস্তারিত হবে যে এই দেশের কোনো বাবা-মাকে অতঃপর কন্যার জন্য সুপাত্র সন্ধানে বিচলিত হতে হবে না।

নরোত্তম তাঁকে ডায়াসে তুলতে চেয়েছিল, অন্তত দু' মিনিটের জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনের ইতিহাস বর্ণনা করতে বলেছিল। চন্দ্রনাথেরও ইচ্ছে হয়েছিল, একবার উঠে দাঁড়িয়ে এতো লোকের সামনে ছেলেকে আশীর্বাদ করেন, বলেন এ-সব তাঁর ছেলেই নিজের হাতে তৈরী করেছে। কিন্তু হার্টের যা অবস্থা তাতে সাহস হয়নি; সভার মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেলে খোকার কষ্টের অবধি থাকবে না। এই আনন্দের দিনে তিনি খোকাকে যতখানি সাধ্য শক্তি যোগাতে চান।

এই বৃহৎ ব্যবসার কী বোঝেন চন্দ্রনাথ? তবু খোকা তাঁকে সব কিছু জানিয়ে রাখে। শ্রীজনসমুদ্রম-এর কথাও বলেছিল। এই মাগ্নি-গণ্ডার দিনে শুধু শুধু জায়গা নষ্ট করার কী দরকার চন্দ্রনাথ বোঝেননি। কিন্তু খোকা যখন বুদ্ধিটা করেছে, নিশ্চয় এর দরকার ছিল। এই প্রচারের বিষয়টা খোকা খুব ভাল জানে। এটা সে তার বাবার দিক থেকে পায়নি, অন্যদিক থেকে এসেছে।

শ্রী এ জনসমুদ্রম পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার আঞ্চলিক মুখ্য উপনির্দেশক। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি এবার আশা প্রকাশ করলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বিবাহিত নবদম্পতিগণ দেশের শোচনীয় জনসমস্যা সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকবেন। প্রস্তাবিত ভবনে নামমাত্র ভাড়ায় একটি পরিবার-

পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ নিয়ে শুভবিবাহ প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এন ঘটক যে গভীর দেশপ্রীতি এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তিনি তারও প্রশংসা করলেন।

খোকার কীর্তি শেষ পর্যন্ত বসে দেখবার মতো বল থাকবে এই ভরসা ছিল না। প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবেন এই ঠিক ছিল। কিন্তু চন্দ্রনাথ আজ কোনো দুর্বলতাই বোধ করছেন না। যা দেখছেন এবং শুনছেন তা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি।

খোকা তার বক্তৃতায় বললে, 'অতিসামান্য অবস্থার মধ্যে যে দুজন এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহাদের একজন এখানে উপস্থিত রয়েছেন।'

অতিসামান্য ব্যাপারকে খোকা কি সুন্দর গুছিয়ে বলে। খোকা জানাল যে দেশের বৃহত্তম এই বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিকে পাবলিক লিমিটেডে পরিণত করবার একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। সরকারের অনুমতি মিললে প্রসপেকটাসের মাধ্যমে দশ লক্ষ টাকার ইকুয়িটি শেয়ার এবং সমমূল্যের ৯·৫% শোধযোগ্য কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার (যার থেকে কর বাদ যাবে জনসাধারণের কাছে ছাড়া হবে।

খোকা বললে, সামান্য অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে তার পিছনে রয়েছে তার বাবা ও মায়ের নীরব সাধনা! চন্দ্রনাথের চোখ দুটো প্রকাশ্য সভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—সে শুনলে খুশী হতো। তাঁদের দু'জনের একমাত্র কৃতিত্ব, নরোত্তমের মতো সন্তানকে তাঁরা পৃথিবীতে এনেছেন।

না পুরনো কথা ভাববার সময় নেই এখন। সবাই বক্তৃতা

শুনছে। নরোত্তম বলছে—পাত্র সন্ধানের জন্যে মেয়ের বাবাদের কাছে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ টাকা আদায় করবার জন্যে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়নি ! সাধ্যমত তাঁরা মানুষের উপকার করবেন। আজকাল দেশে-বিদেশে যেসব নতুন টেকনিক আবিষ্কৃত হয়েছে ধীরে ধীরে সেগুলি দেশে প্রবর্তন করবার চেষ্টা করবেন এই কোম্পানি।

সভার শেষে ছিল সাংবাদিক সম্মেলন। খোকা এর মধ্যেই খোঁজ করেছিল চন্দ্রনাথ বাড়ি যাবেন কিনা। না, আজ তিনি যতক্ষণ সম্ভব থাকবেন।

দৈনিক ইকনমিক এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি খোকাকে প্রশ্ন করলেন, 'এটা কি সত্য যে আপনারা ফরেন কোলাবরেশনের চেষ্টা করছেন ?'

সে জানালে, 'কথাটা মিথ্যে নয়। আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানীর কয়েকটি বিবাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে উচ্চস্তরে আলাপ-আলোচনা চলছে।'

দৈনিক আনন্দহাট-এর সংবাদদাতা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'এ-দেশের হলো কি ! জুতোর পালিস, দাঁতের মাজনের এবং পেনের কালির জন্যে বৈদেশিক কারিগরী সহযোগিতার প্রয়োজন হতো ! এবার বিয়ের ঘটকালীর জন্যেও ফরেন নো-হাউ।'

চন্দ্রনাথ এবার একটু ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরোত্তম হেসে বললে, 'ব্যাপারটা আপনাদের বুঝিয়ে বলি। আমাদের দেশে বিবাহ সমস্যা কিরকম ঘোরতর আকার ধারণ করছে তা সব সময় আমরা অবহিত থাকি না। গত আদমসুমারিতে দেখা যাচ্ছে আমাদের মোট লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি ৮৩ লক্ষ। এর মধ্যে ১৩ কোটি ৪ লক্ষের বয়স দশ বছরের কম। দেশের শতকরা ২১ ভাগ স্ত্রী-পুরুষের বয়স ১০ থেকে ১৯ এর মধ্যে। আরও শতকরা ১৬ ভাগ অর্থাৎ ৭ কোটি

যুবক-যুবতী রয়েছে ২০ থেকে ২৯ এর মধ্যে। ২৯ বছরের মধ্যেই আজকাল সকলের বিবাহ বন্ধন ঘটছে না। ৩০ থেকে ৩১-এর মধ্যে রয়েছে আরও শতকরা ১৩ ভাগ, অর্থাৎ আরও পৌনে ছ কোটি।'

নরোত্তম এবার একটু কেশে নিয়ে বললে, 'দুর্ভাগ্যটা কোথায় দেখুন। আমাদের দেশে কোটি কোটি ছেলেও রয়েছে, কোটি কোটি মেয়েও রয়েছে। অথচ বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতাদের রাত্রে ঘুম নেই। আবার কোয়ালিফায়েড পুত্রদের পিতারাও বলছেন, যোগ্যা পাত্রীর অস্বাভাবিক ঘাটতি। তাঁদের অভিযোগ -সচ্ছল সংসারের সুন্দরী, শিক্ষিতা, সুলক্ষণা, স্বাস্থ্যবতী, সঙ্গীতজ্ঞা, সুরুচিসম্পন্ন বালিকারা আজকাল কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়েই নিজেদের পতিনির্বাচন করছেন।'

'যাই হোক আমাদের কোম্পানি প্রথম চেষ্টা করছেন দেশের সমস্ত যোগ্য পাত্র এবং পাত্রীদের একটি নর্ভরযোগ্য তালিকা প্রস্তুত করার। এই 'জাতীয় সম্ভাব্য বিবাহ তালিকা' প্রণয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। আমরা বর্তমানে এই তালিকা বড় বড় 'লুজ-লিফ' রেজিস্টারে রাখছি। তাতে অসুবিধার শেষ নেই। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো একটি আধুনিক ইলেকট্রনিক কমপিউটর যন্ত্র।'

নরোত্তম বলে চললো, 'এই কমপিউটর যন্ত্র বিদেশে অসাধ্য সাধন করছে। দেশের প্রতিটি সুপাত্রের বিবরণ 'প্রজাপতি' নামক এই কমপিউটরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে—কী চাকরি করে, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র, সি এ, আই-এ-এস না বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কভেনেন্টেড অফিসার; কত মাইনে পায়; কলকাতায় নিজস্ব বাটি আছে কনা; পূর্ব না পশ্চিমবঙ্গ;

ভঙ্গ না নৈকষ্য কুলীন, বয়স, বর্ণ, গণ, গোত্র, মেল, কোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিবরণ; কী ধরনের পাত্রী চাই দীর্ঘাঙ্গী না মধ্যমাকৃতি; স্বাস্থ্যবতী না দীঘল দীঘল গঠন; সঙ্গীতজ্ঞা না রন্ধন পারদর্শিনী না নৃত্যপটীয়সী; যৌতুক পছন্দে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে আপত্তি আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে-কোনো পাত্রীর সম্পূর্ণ বিবরণ এবং পাত্রপক্ষের আকাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর একটি কার্ড পাঞ্চ করে যন্ত্রে ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দিলেই তিন সেকেণ্ডের মধ্যে ওই ধরনের পাত্রের কার্ডগুলি অন্যদিক থেকে বেরিয়ে আসবে। এই কার্ডে শুধু পাত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ নয়, রাশিচক্র এবং একটি পাশপোর্ট আকারের ছবিও পাওয়া যাবে। ধরুন দশখানা কার্ড বেরিয়ে এল; এবার পাত্রীর পিতা-মাতা সহজেই নিজেদের নির্বাচন সম্পন্ন করে পাত্রপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন।”

বিস্মিত চন্দ্রনাথ নরোত্তমের ব্যাখ্যা শুনছেন: ‘আপনারা বলবেন সাধারণ ঘটকরাও তো অনেক পাত্রের নাম ঠিকানা দয়ে দেয়। কিন্তু সেখানে তাঁরা ঠিকানা দিয়েই খালাস— পাত্ররা কী চান কিংবা পাত্রীপক্ষ কী চান তা যাচাই করা হয় না। ফলে পাত্রীপক্ষের প্রায়ই হয়রানি সার হয়। কিন্তু প্রজাপতি কমপিউটর থেকে শুধু সেই কার্ডগুলি বেরিয়ে আসবে যেখানে পছন্দ হবার সম্ভাবনা অন্তত শতকরা নব্বুই।’

উপস্থিত সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে নরোত্তম বললেন, ‘অতএব বুঝতে পারছেন এই একটি যন্ত্রে দেশের বিবাহ জগতে কি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। কিন্তু এই মেশিনের দাম অনেক, সেই জন্যে আমরা চেষ্টা করছি কোনো বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানীর কিছু শেয়ার দিয়ে তার পরিবর্তে এই যন্ত্র আমদানী করার।’

আনন্দহাটের প্রতিনিধি ব্যঙ্গ করে বললেন, ‘বিলেত

আমেরিকাতে তো ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই ভালবেসে বিয়ে করে জানতাম। সেখানে আবার ঘটক পাবেন কোথা থেকে?'

একটা কাগজ হাতে নিয়ে নরোত্তম উত্তর দিলেন, 'বলেন কি? জার্মানীতে অন্তত আড়াইশ ঘটক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা আমাদের জানা আছে। এঁদের ইনট্রোডাকসন ফি প্রায় দুশো টাকা। তার উপর আছে—সাক্‌শেস ফি, অর্থাৎ শুভকার্য সম্পন্ন হলে আরও তিনশো টাকা।'

আনন্দহাটের প্রতিনিধি এবার সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'খুবই ইনটারেস্টিং। সরকারকে এই বৈদেশিক সহযোগিতা অনুমোদন করবার জন্যে আমরা লিখবো।'

জোড়হাত করে নরোত্তম বললেন, 'আপনাদের শুভেচ্ছাই আমাদের ভরসা।' চন্দ্রনাথ এবার দুর্বল বোধ করছেন নাড়িটা বেশ দ্রুত হয়েছে, কিন্তু খোকার দিকে তিনি বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। নিজের ছেলে বলে যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না।

একটা প্রশ্নের উত্তরে খোকা বললে, 'প্রজাপতি ভবনের মতো বাড়ি এ-দেশে এখনও পর্যন্ত তৈরি হয় নি। এখানে বিয়ের হলঘর ভাড়া পাওয়া যাবে। বিবাহের যাবতীয় সরঞ্জাম বেনারসী থেকে বাসন, খাট-বিছানা আলমারি থেকে আতপচাল, ঘড়ি-আংটি-বোতাম থেকে বঁটি পর্যন্ত এখানকার বিভাগীয় বিপনিতে পাওয়া যাবে। নেমন্তন্নের কার্ড এবং বিয়ের পদ্য ছাপাবার জন্যে মুদ্রাযন্ত্রও থাকবে। পদ্যরচনার জন্যে একজন কবিকেও মাইনে দিয়ে রাখা হবে। পুরোহিত, নাপিত এবং হালুইকর অবশ্যই কোম্পানি সরবরাহ করবেন। এমনকি বিয়ের ছবি তোলবার জন্যে ফটোগ্রাফারও পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বিবাহ-কেন্দ্রিক সবগুলি শিল্পক্ষেত্রেই শুভবিবাহ প্রাইভেট লিমিটেডের অনুপ্রবেশ ঘটবে।'

চন্দ্রনাথ এবার হাঁপাতে আরম্ভ করলেন। উত্তেজনায়

বোধ হয়। এসব কিছুই তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না, তিনি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছেন। খোকার আরও দেরি হবে নিশ্চয়। তাঁর ইঙ্গিতে বেয়ারা ইনভ্যালিড চেয়ারের চাকা ঠেলে তাঁকে গাড়িতে তুলে দিল

বিরাট গাড়িটা যখন দক্ষিণাঞ্চলের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় ঢুকলো তখন শরীরটা সত্যি খারাপ লাগছিল। কিন্তু আজ তাঁর বড় আনন্দের দিন আজ অসুস্থ বোধ করলে চলবে কেন?

একটু পরে নরোত্তমেরও গাড়ি এল। অটোমেটিক লিফটে চড়ে নরোত্তম তিন তলায় এলেন। বেয়ারা সেলাম করলো। জুতোটা খুলে রেখে নরোত্তম এবার পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ঘরের আলোটা নেভানো ছিল।

'কে খোকা এলি?' বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ আলোটা জ্বেলে দিলেন।

'কেমন আছেন বাবা? এখন ভাল বোধ করছেন তো?' নরোত্তম প্রশ্ন করলেন।

কাশতে কাশতে বাবা বললেন, 'ভালই আছি।'

'কিন্তু, একি ঘামে আপনার জামা ভিজে গিয়েছে। বেয়ারাকে ডেকে এয়ার-কুলারটা চালিয়ে দিতে বলেন নি কেন?' ব্যস্ত হয়ে নরোত্তম নিজেই মেশিনটা চালিয়ে দিল।

বাবাকে একটু মৃদু ভর্ৎসনাও করলে নরোত্তম: 'হাতের গোড়ায় বেল রয়েছে—টিপলেই বেয়ারা চলে এসে ঘরটা ঠাণ্ডা করে দিয়ে যায়। যা বিশ্রী গরম পড়েছে তা কখনও আপনার সহ্য হয়?'

চন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলেন, তাঁর বয়সের কত লোক তো বস্তিতে পড়ে রয়েছে। এয়ারকুলার, ফ্যান তো দূরের কথা, ঘরে একটা জানালা নেই; হাতপাখা কিনতে পারে না।

বিছানার চাদরটা টেনে সোজা করে নরোত্তম বললে, 'আপনার আপেলের রস খাওয়ার কথা, বেয়ারা দেয়নি?'

'ওর কোনো দোষ নেই। ও এসেছিল, আমি খাইনি। চাট্টি মুড়ি পেলে বরং চিবিয়ে খেতাম।'

'মুড়ি খান আপত্তি নেই। কিন্তু আপেলের রস, ছানা, আঙুর, ছুটো কাজু বাদাম, এক গ্লাস প্রোটিনেক্স এসব আপনাকে খেতেই হবে বাবা।'

বাবা মনে মনে বললেন, 'তোর মা যখন সন্তানসম্ভবা, তখন ডাক্তারও ও-সব খাওয়াতে বলেছিল।'

বাবার পাশে বসে পড়লো নরোত্তম। গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'আমি কত কাজে ব্যস্ত থাকি—সব সময় আমার পক্ষে দেখাশোনা করা সম্ভব হয় না। বরং একটা নার্স রেখে দিই।'

'আমার কি শ্বাস উঠেছে? না অপারেশন হয়েছে যে, নার্স রাখবি?' বৃদ্ধ কেশে উত্তর দিলেন। তারপর একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'নার্সের কত মাইনে?'

'মাইনে যাই হোক, আপনার যদি সুবিধে হয়।' নরোত্তম বলতে গেল, কিন্তু বাবা চটে উঠলেন। 'যা শুধোচ্ছি তার উত্তর দে না।'

'এমন কিছু না বাবা! চব্বিশ টাকা করে একজন—বারো ঘণ্টা ডিউটি—তার মানে দিনে আটচল্লিশ টাকা আর খাওয়া। কিন্তু ওসব নিয়ে চিন্তা করছেন কেন বাবা?'

মুখে কিছুই বললেন না চাঁদু ঘটক। খক খক করে কাশলেন আর একবার, মনে পড়ে গেল মাসে চব্বিশ টাকা রোজগারের কথা এক সময় তিনি ভাবতে পারতেন না। ছেলেকে বললেন, 'লক্ষ্মীকে অপমান করতে নেই বাবা। তিনি এসেছেন বলে, তাঁর যত্নের ত্রুটি না হয় যেন। টাকাটা এত সস্তা নয়। আমি বেশ আছি।'

ছেলে কোনো উত্তর দিলে না। শুধু বললে 'একটু হরলিকস করে দিতে বলি? গরম গরম ভাল লাগবে।'

'তুইও খাবি তো?'

'বেশ খাবো।'

'তা হলে বল। চিনি না দিয়ে—কাগজে পড়ছিলাম আবার চিনি পাওয়া যাচ্ছে না।'

'বাড়িতে অনেক চিনি আছে বাবা। তা ছাড়া সুগার মার্চেন্ট নরেন সাধুখাঁ রোজ আমার কাছে আসছে মেয়ের বিয়ের জন্যে। সাপ্লাই মিনিস্টারও এখন আমাদের ক্লায়েন্ট।'

নরোত্তমকে একটু আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে—তার মা বেঁচে থাকলে ছেলেকে যেমনভাবে করতেন। ছেলের গায়ে হাত দিতে আস্তে আস্তে তিনি বলবেন, তাঁর দুঃখ-দিনের কথা। ওর মায়ের কথাও এসে পড়বে। কিন্তু কথা বলা হলো না, টেলিফোন বাজছে।

মিস্টার জাস্টিস চ্যাটার্জি ফোন করছেন। তাঁর মেয়ে এম এস-সি পাশ করেছে, বিলেতে যাবার ব্যবস্থা পাকা। কিন্তু বাবা-মা চান বিলেত যাবার আগে বিয়ে হয়ে যাক। নরোত্তম বললে, 'চিন্তা করবেন না—উপরে ঈশ্বর রয়েছেন।' জাস্টিস চ্যাটার্জি বললেন, 'আমরা চাই এমন একটি ছেলে যে নিজেও বিলেত যাচ্ছে। ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট।'

'ডাক্তার হলেই ভালো হয়, কী বলেন' নরোত্তম জানতে চাই।

'না না, ডাক্তারদের রোজগারপাতি আজকাল ভাল নয়। আপনি ইঞ্জিনীয়র বা কভেনেন্টেড অফিসার দেখুন। তবে আমাদের একটু কুষ্ঠির উপর বিশ্বাস আছে। যদিও আমার মেয়ে বৈজ্ঞানিক—তবু কি দরকার অযথা ঝুঁকি নিয়ে।'

নরোত্তম বললেন' 'মেয়ের ছবি একখানা পাঠিয়ে দেবেন।'

জ্যাস্টিস চ্যাটার্জি বললেন, তা দিচ্ছি—কিন্তু যাকে তাকে দেখাবেন না।'

'না না, মোটেই নয়—কি যে বলেন।'

জাস্টিস চ্যাটার্জি জানালেন, 'আমার মেয়ের সমস্ত গুণই আছে—শুধু রঙটা একটু চাপা।'

'তাতে কিছু এসে যায় না,' নরোত্তম সান্ত্বনা দেন। 'এই গরম দেশে সবাই রাঙা টুকটুকে কী করে হয় বলুন?'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে নরোত্তম আবার বাবার কাছে এসে বসলো। বাবা বললেন, 'মিনিস্টারের সঙ্গে তোর খুব ভাব দেখলাম। তোর পিঠে হাত রেখে কথা বলছিলেন।'

'বলবেন না মানে? ওঁর নিজের মেয়েটির চোখ ট্যারা—নাকে ছুটো আঁচিল আছে। অথচ বিলেতফেরত পাত্র চান। মিনিস্টার লোক—গভরমেণ্ট গেজেটেড অফিসার সহজেই পাওয়া যেতো। কিন্তু মেয়ের মায়ের মত নেই। গেজেটেড অফিসারদের আজকাল নাকি মাইনে খুব কম। তিনি কভেনেণ্টেড অফিসার চান।'

চন্দ্রনাথ ছেলের মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। ছেলে বলছে, 'বাবা সমস্ত প্যাণ্ডেল শহরের বাছা বাছা লোকে ভরে গিয়েছিল। দেখলে তো, নন-বেঙ্গলীরাও অনেক এসেছিলেন—আমরা তো শুধু বাঙালীদের মধ্যে কাজ করছি না এখন। মাড়ওয়ারি, পাঞ্জাবি, উত্তরপ্রদেশী অফিসার রেখেছি এইজন্যে। ওদের মধ্যে বিয়ে লাগাতে পারলে ভাল কমিশন পাওয়া যায়।'

বাবা বললেন, 'এরা সবাই শুধু তোর জন্যে এসেছিলেন?' যেন কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

নরোত্তম বললে, 'রেডিওতে স্থানীয় সংবাদ শুনো, আর রাত্রে সংবাদ-বিচিত্রা। রেডিওর লোকরা অনেক কথা রেকর্ড করে নিয়ে গিয়েছে।'

ছেলের সঙ্গে ছু'দণ্ড শান্তিতে কথা বলবার উপায় নেই।

আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। এককালের বিখ্যাত চিত্রতারকা ও বর্তমানে বিখ্যাত প্রযোজিকা সুস্মিতা দেবী ফোন করছেন। তিনিও মেয়ের জন্যে পাত্র চান। তাঁর মেয়ে অসামান্যা সুন্দরী, কনভেন্টে শিক্ষাপ্রাপ্তা। 'ফিল্ম লাইনে কারও সঙ্গে...' নরোত্তম বলতে যাচ্ছিলেন। তীব্র প্রতিবাদ করলেন সুস্মিতা দেবী। 'মরে গেলেও না। আমার মেয়েকে তার থেকে দড়ি-কলসি কিনে দেবো।'

'চিন্তা করবেন না। সবই হয়ে যাবে। উপরে ঈশ্বর রয়েছেন। জন্ম দিয়েছেন তিনি, অন্ন দিচ্ছেন তিনি; স্বামীর সন্ধানও তিনি নিশ্চয় করে দেবেন।'

'আমার মেয়েকে একবার দেখলে পছন্দ না হয়ে উপায় নেই। এমন কিছু আকাশের চাঁদ চাইছি না—সামান্য ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কভেনেণ্টেড অফিসার। তবু আমার ভাগ্যে কিছুই জুটছে না—তার কারণ বোধ হয় আমি নিজেই—অভিনেত্রীর সন্তান!'

নরোত্তম বললে, 'আহা, তা নয় তা নয়। ধৈর্য ধরুন।'

চন্দ্রনাথ কেবল অবাক হয়ে তাঁর ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে—তার উপর চোখ দিয়ে জল ঝরছে। নরোত্তমকে তাই পুরো দেখতে পাচ্ছেন না। যেন একটা অস্পষ্ট চলচ্চিত্র—ধনী নায়ক যেন তার প্রাসাদ থেকে টেলিফোনে কথা বলছে। ছবি অস্পষ্ট হলেও, সব কথা স্পষ্ট কানে ভেসে আসছে।

কোনো সুন্দরী পাত্রীর প্রতিষ্ঠাপন্ন পিতা নরোত্তমের সঙ্গে দেখা করতে আসতে চাইছেন। নরোত্তম ডায়রী দেখে বলছে, 'না, আগামী দু'দিনেব মধ্যে কিছুতেই সম্ভব নয়। আগে থেকে অন্য অনেকের সঙ্গে ঠিক হয়ে রয়েছে।'

নরোত্তমের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রনাথের মনে হচ্ছে সত্যিই

তিনি সিনেমা দেখছেন। নরোত্তম কেমন গম্ভীর হয়ে বলছে, 'আমি বুঝেছি, দু'দিন পরেই আপনি ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের কাজে আমেরিকা যাচ্ছেন, তিন সপ্তাহের আগে ফিরবেন না। আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন কোনো উপায় নেই।'

চন্দ্রনাথের চোখের সামনে তার পুরনো দিনগুলোর ছবি ভেসে উঠছে। নরোত্তমের কাছে কত লোক আসে—আর চাঁদু ঘটক লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতো। মেয়ের বাপের সঙ্গে দেখা করে বলতো, 'মা লক্ষ্মীর জন্যে সুপাত্র দেখি না? কিচ্ছু ভয় নেই—এমন কিছু চাইবো না যা দিতে আপনার কষ্ট হয়। যদি পাত্র পছন্দ হয়, তবে চার হাত এক করে দিয়ে, নেমন্তন্ন খেয়ে ঘটকবিদায়ের কথা তুলবো।'

কতরকমভাবে অনুনয় বিনয় করতেন চন্দ্রনাথ। তবু কত লোক সোজা বলে দিতো—চন্দ্রনাথকে দিয়ে তাঁদের কোনো কাজ হবে না। আবার কত লোক ভদ্রভাবে বলতেন, 'আচ্ছা জানা রইল। প্রয়োজন হলে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবো।'

আর নরোত্তম—তাঁর নিজেরই সন্তান যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে তার মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে। কত লোকের সঙ্গে তার জানাশোনা। কত তার প্রতিপত্তি। কত ঘরের সঙ্গে তার কাজ। যেন একটা ময়দানব তার ছেলের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দিচ্ছে। তাকে দিয়েই যেন লেকের ধারে এই বিরাট বাড়িটা তুলিয়েছে নরোত্তম। ওই অফিসপাড়ায় রাস্তার ওপর যে বিরাট বাড়িটার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো সেটাও যেন তাঁর ছেলের অনুগত দানবটা হুস করে শেষ করে দেবে।

এই বাড়িটা দেখে যেতে পারবেন তো চন্দ্রনাথ? তাঁর ছেলের এই সাফল্য নিজের চোখে দেখে যাবার জন্যে বিধাতার কাছে সামান্য একটু সময় প্রার্থনা করছেন চন্দ্রনাথ। আর

কোনো কিছুর জন্যেই তাঁর বাঁচবার লোভ নেই। বরং ওপারে যাবার আকর্ষণই এখন তাঁর বেশী। বড় বেশী একলা হয়ে পড়েছেন এপারে—সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এপারে যে একদিন সঙ্গ দিতো সে যেন ওপার থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

টেলিফোনের কথাগুলো আবার কানে ভেসে আসছে। আমেরিকা গমনোদ্যত ভদ্রলোকটি মেয়ের বিবাহ-সমস্যাকে বেশ জরুরী-পর্যায়ে ফেলেছেন। কোনো সময় না পেয়ে তিনি এখনই চলে আসতে চাইছেন।

নরোত্তম আবার বাবার কাছে এসে বললে 'ভেবেছিলাম, আজ কেবল বসে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করবো।'

'আবার কাউকে আসতে বললি নাকি? না না, ওভাবে খাটিস না। তোর শরীরটা এতো ধকল সহ্য করবে ক করে? ছোট বেলায় তুই যা রোগা ছিলি—তোর মা তো ভেবেই সারা। কত ঠাকুরের কাছে মানত করতো। একবার তো তারকেশ্বর নিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে তোর চুল দিয়ে এলাম। তখন কি তোর কান্না '

নরোত্তম বাবার মুখের দিকে ছোট ছেলের মতো তাকিয়ে আছে। ওর মায়ের ছবি রয়েছে ওর মুখে। কেমন সরল বোকা বোকা চাউনি। একে দেখে এখন কে বলবে, এতো তার বুদ্ধি; এমন বিশাল ব্যবসা নিজের হাতে গড়ে তুলেছে সে নিজের পরিশ্রমে।

চন্দ্রনাথ ছেলের হাতটা স্পর্শ করে বললেন, 'শুনলাম, আজ ভোর চারটের সময় উঠেছিস। শরীর খারাপ হয়ে পড়ে থাকলে কে দেখবে?'

নরোত্তম বললে, 'কোনো উপায় নেই। ভদ্রলোক খুবই প্রভাবশালী। আমাদের কোম্পানির ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যাপারে হয়তো সাহায্য করতে পারেন।'

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়ে কেমন ?'

'ইংরিজীতে এম-এ পাশ করেছে—কিন্তু রঙ ময়লা। সামনের দাঁত তিনটে বেশ উঁচু। অথচ অর্ডিনারী পাত্রের হাতে তো মেয়ে তুলে দিতে পারেন না। তাছাড়া মেয়েরও একটা মতামত আছে—কনভেণ্টে মানুষ হয়েছে, বাবার সঙ্গে কয়েকবার কন্টিনেন্ট এবং স্টেট্স ঘুরে এসেছে। সুইমিং ক্লাবের মেম্বার। টেনিস খেলে; অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের মোটর রেসে প্রাইজ পেয়েছে। রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় দিল্লীকে রিপ্রেজেন্ট করেছে।'

'দিল্লী কেন ?' চন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন।

'আগে দিল্লীতেই থাকতো ওরা।'

'তাই বুঝি ? কী নাম বল্ তো ?' চন্দ্রনাথের কৌতূহল বাড়ছে।

'ভদ্রলোকের নাম বি ডি চ্যাটার্জী—রাষ্ট্রীয় ফিনানসিয়াল কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আগে ফিনান্স মিনিস্ট্রিতে ছিলেন, পদ্মশ্রী পেয়েছেন।'

'বেনুধন চ্যাটার্জী নাকি ? বাপের নাম অনন্ত চাটুজ্যে—পঞ্চাননতলায় লক্ষ্মণ দাস লেনে থাকতো তো ওর বাবা ?'

'তুমি জান নাকি ওদের ?' নরোত্তম প্রশ্ন করলে।

'চিনি না মানে ? হাড়ে হাড়ে চিনি।'

আরও হয়তো বলতেন, কিন্তু ছেলেকে এবার নিচে নেমে যেতে হলে—বি ডি চ্যাটার্জী তাঁর স্ত্রীকে নিয়েই হাজির হয়েছেন।

বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘরের নীল আলোটা জ্বেলে দিলেন চন্দ্রনাথ। তাঁর খাটের গায়েই সুইচ আছে অনেকগুলো। এই বুড়ো বয়সে মাঝে মাঝে ছোট ছেলের মতো সুইচগুলো নিয়ে খেলা করেন চন্দ্রনাথ। কখনও

সবগুলো আলো নিভিয়ে দেন; কখনও সব কটা একসঙ্গে জ্বেলে দেন; আবার কখনও নীলের সঙ্গে একশো পাওয়ারের আর্জেন্টা; কিংবা সবুজের সঙ্গে সাদা ফ্লুওরেসেন্ট বাতি জ্বেলে ফলাফল দেখেন; কি আশ্চর্য, বোতাম টিপলেই আলো নিভে যায়; আবার বোতাম টিপলেই আলো জ্বলে ওঠে। যে ঘরটায় তাঁরা থাকতেন সেখানে কেরোসিনের হ্যারিকেন লণ্ঠন ছিল একটা—জ্বালানোও যেমন হাঙ্গামা, নেভানোও তেমন শক্ত। পলতেটা কিছুতেই নামতে চাইতো না। অনেক সময় সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চন্দ্রনাথ দেখেছেন লণ্ঠনটা ভিতরে ভিতরে তখনও জ্বলছে—সব তেল পুড়ে গিয়েছে। অথচ এখন বোতাম টিপলেই আলো।

সব আলো নিভিয়ে দিলেন চন্দ্রনাথ। নিচের ঘরে পদ্মশ্রী বেনুধন চ্যাটার্জী তাঁর মেয়ের জন্যে পাত্র সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছেন, তাঁর ছেলেকে অনুরোধ করছেন। অথচ একদিন···

একদিন এই বেনুধন চ্যাটার্জীর বিবাহ সম্বন্ধ করবার জন্যে চাঁদু ঘটক জুতোর গোড়ালি ক্ষইয়ে ফেলেছেন। মুখুজ্যে বাড়ীর মেয়ে কল্যাণী—রূপে যেন মালক্ষ্মী, আহা কি শ্রীময়ী রূপ, চাঁদু ঘটক আজও যেন মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছেন।

কল্যাণীর বাবা বলেছিলেন, 'দেখো যদি ওই ছেলের সঙ্গে লাগাতে পারো, তা হলে যা চাইবে তাই দেবো।'

কত চেষ্টা করে ছিলেন চন্দ্রনাথ; অনন্ত চাটুজ্যের মনও গলেছিল একটু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত···মেয়েটার কী যেন নাম? পদ্মশ্রী বেনুধন চ্যাটার্জীর যিনি সহধর্মিণী হলেন তার ডাক নাম রাণু। টাকার লোভে অনন্ত চাটুজ্যে অমন গুণের ছেলের জন্যে কালো, দাঁত-উঁচু রাণুকেই পছন্দ করলেন।

চন্দ্রনাথ তখনই বলেছিলেন, 'ভাল করলেন না। নগদ টাকা আর শহরে ভূসম্পত্তির লোভে অমন হতকুচ্ছিত মেয়েকে

ঘরে ঢোকাচ্ছেন। বিশেষ করে ছেলে যখন নিজেই টাকা ও বাড়ি করবার শক্তি রাখে।'

বেজায় চটে গিয়ে লোভী অনন্ত চাটুজ্যে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। বেরোবার সময় চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ঠিক হ্যায়, পরে বুঝবেন।'

এতদিন পরে এই বৃদ্ধবয়সে চন্দ্রনাথের হাসি আসছে। অনন্ত চাটুজ্যের ছেলে অন্তত এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে! বেনুধন দেখতে খারাপ ছিল না; আর কল্যাণীর সঙ্গে বিয়ে হলে কেমন ফুটফুটে মেয়ে হতো! সামান্য কয়েকটা টাকার লোভে!

চন্দ্রনাথ সেদিনের ব্যর্থতা এখনও ভোলেননি। ঘটকগিরি করতে গিয়ে এমন ব্যর্থতা তো প্রতিদিনই আসে—এসব মনে রাখবার কথা নয়। মনে যে রেখেছেন তার অন্য একটা কারণ আছে। ঘটক-বিদায় পাননি বলে? তাও না। সুধা—লোকে বলতো সুধা ঘটকী।

সুধার কী সুন্দর রঙ ছিল তখন। সারা দিন রোদে রোদে ঘুরে বেড়াতো—বালী, বেলুড়, উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, ভদ্রকালী, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, কোন্নগর, শ্রীরামপুর। তবু রোদে পুড়ে পুড়েও সুধার যা রঙ ছিল। রাণুর সঙ্গে বেনুধনের সম্বন্ধ সুধা ঘটকীই করেছিল। আর সে কি ঝগড়া! কালীবাবুর বাজারের কাছে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

বাস ধরবার জন্যে চন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছিলেন। সুধা কাছে এসে বলেছিল, 'শুনুন। আপনার নামই চাঁদু ঘটক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী ধরনের ঘটক আপনি? অন্য ঘটকের সম্বন্ধে ভাঙচি দেন?'

'ভাঙচি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পাত্রীর সঙ্গে দেনাপাওনা নিয়ে

গোলমাল হয়েছে ঢুকে গেল। আপনি তখন ছেলের বাপকে আমার পাত্রীর নামে ষোলকলা করে লাগিয়েছেন ; শুধু তাই নয়, ছেলেরও কান ভাঙাবার চেষ্টা করেছেন।'

বেজায় চটে উঠেছিলেন চন্দ্রনাথ। 'আমাদের কল্যাণীর সঙ্গে তা বলে টাকার তবিল ওই হরিসাধনের মেয়ে রাণুর তুলনা চলে না। ওদের ভালর জন্যেই বলেছিলাম—ভাঙচি কোন্ দুঃখে দিতে যাবো ?'

এবার অপ্রস্তুত হবার পালা। আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে ছল-ছল চোখে সুধা বলেছিল, 'তাই বলে কেউ পাত্তরকে বলে একটা কালো মেয়ের সঙ্গে বাপ তোমার বে'র কথা পাকা করছে।'

আর কোনো উত্তর দেবার সুযোগ দেয়নি সুধা। হন হন করে বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

ঘড়িতে বোধহয় সাড়ে আটটা বাজলো। বেয়ারা এবার প্রোটিনেক্সের গেলাশ হাতে ঘরে ঢুকে পড়েছে। 'সাব্।'

বেয়ারাগুলো সব সময় সাদা ইউনিফর্ম প'রে থাকে। নরোত্তমের হুকুম। খেতে ইচ্ছে করছে না চন্দ্রনাথের। বললেন, 'এখন খাবো না।'

বেয়ারা মাথা নেড়ে বললে, 'হুজুর, খেতেই হবে। না হলে সায়েবকে খবর দেবার হুকুম রয়েছে।'

'সায়েবকে তোমরা এই সব সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে কখনো জ্বালাতন করবে না। জেনে রাখবে আমি এখনো হেড্ অফ্ দি ফ্যামিলি। সারাদিন খেটে খেটে সায়েবের শরীরে কিছুই নেই। তাছাড়া সায়েব এখন মস্ত বড় লোকের সঙ্গে জরুরী আলোচনা করছেন।'

'আমাদের দোষ দেবেন না হুঁজুর। সায়েবকে না জানালে

তিনি রেগে যাবেন। আপনি না খেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানাতে বলেছেন।'

অগত্যা গেলাশটা হাতে নিলেন চন্দ্রনাথ। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই দুধের সঙ্গে মেশানো প্রোটিনেক্স খেয়ে ফেললেন। এমন একদিন ছিল যখন খুব খেতে ইচ্ছে করতো। কালীবাবুর বাজারের সামনে দুলাল ঘোষের খাবারের দোকানে গরম দুধ খাবার জন্যে চন্দ্রনাথের মনটা ছটফট করতো। দুধের ওপর মোটা সর ভাসতো। সেটার উপর খুব লোভ ছিল চন্দ্রনাথের। আজ দুধের সর দেখলে ভয় লাগে চন্দ্রনাথের। দুধ, সন্দেশ,, আপেল, আঙুর, বেদানা, লেবু, কিসমিস, কাজু বাদাম এগুলোকে অত্যাচার বলে মনে হয়।

খোকা এতক্ষণ কী করছে? বোধ হয় পদ্মশ্রী বেনু চ্যাটার্জীর স্ত্রীর ফিরিস্তি শুনছে, কেমন ছেলে চাই। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মিটিঙে আগামী সপ্তাহে যখন বেনু চ্যাটার্জী বক্তৃতা করবেন, তখন তাঁর মন কিন্তু পড়ে থাকবে এই শহরে—হয়তো ভাববেন, শুভবিবাহ প্রাইভেট লিমিটেড তার দাঁত উঁচু মেয়ের জন্যে সুন্দর সুপাত্র জোগাড় করছে।

কল্যাণীর ছেলের খবরও নরোত্তমের কাছে আছে। ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে কল্যাণীর ঘটকালী করেছিলেন চন্দ্রনাথ। ওদের ছেলে কিন্তু ইকনমিক্‌সে ডক্টরেট। বেনু চ্যাটার্জীকে কল্যাণীর কাছে পাঠাবার জন্যে নরোত্তমকে বললে কেমন হয়? ভারি সুন্দর একটা গল্প হয়ে যায়। কিন্তু বিলেত-ফেরত ছেলের জন্যে অমন মেয়ে নিতে কল্যাণীই বা রাজী হবে কেন?

একটু কাশলের চন্দ্রনাথ। নাঃ, দাঁত উঁচু তো কী হয়েছে? নিজেকে একটু ভর্ৎসনা করলেন চন্দ্রনাথ। এই দীর্ঘ ঘটক-জীবনে কত অসুন্দর মেয়ের সুন্দর বর জোগাড় করে দিয়েছেন তিনি। তারা কেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে ছেলেপুলে, নাতিনাতনী

নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঘরসংসার করছে। দাঁত উঁচু, রঙ কালো তো কী হয়েছে? এতে তো মানুষের কোনো হাত নেই। আর এই বা কেমন কথা—জন্মগত চেহারা দিয়ে জীবনের সব সুখ ও আনন্দের পরিমাপ ঠিক হবে?

তাঁর নরোত্তমও তো দেখতে ভাল নয়। তাঁর যে মেয়েটা হয়েছিল, তারও তো চোখটা ট্যারা ছিল—রঙটা কালো, নাকটা চ্যাপ্টা। বাঁচলো না তাই—বেঁচে থাকলে তিনিও তো সৎপাত্রের চেষ্টা করতেন। চরিত্রবান, উপার্জনশীল, শিক্ষিত, সুশ্রী যুবক কি তিনিও বেনুধন চ্যাটার্জী এবং তাঁর স্ত্রীর মতো চাইতেন না?

আর শুধু চাওয়া কেন? পাচ্ছেও তো কতজন। সেই কতদিন আগে থেকে—যখন থেকে ঘটকগিরি আরম্ভ করে-ছিলেন, তখন থেকেই শুনছেন পণপ্রথা উঠে যাবে। টাকা দিয়ে আর ছেলে কিনতে হবে না। সর্বস্ব খুইয়ে, বাঁধা দিয়ে, ধার করে আর কন্যাদান করতে হবে না—সব এমনি হয়ে যাবে। ভয় পেয়ে যেতেন চন্দ্রনাথ—তখন হয়তো ঘটকও লাগবে না আর। ছেলেমেয়েরা নিজেরা পছন্দ করে নিজেদের ঘটকালী করবে।

চন্দ্রনাথ ভাবতেন, তখন তাঁহাদের সংসার চলবে কী করে? কিন্তু সুধা ঘটকী ওসব কিছুই ভাবতো না। সুধা বলতো, 'ওসব অনাসৃষ্টির কথা! যতদিন চন্দ্রসূর্য উঠছে—ততদিন লোকের ছেলেমেয়ে হবে; এবং তাদের বে'ও দিতে হবে। এবং সমর্থমেয়ে ঘরে থাকলে এই সুধাকে চা-পান খাইয়ে, গাড়ি ভাড়া দিয়ে বনগাঁ, বারাসত, হৃদয়পুর পদ্মপুকুর, গোবরডাঙা কিংবা বর্ধমান, জৌগ্রাম, বৈঁচিতে পাঠাতে হবে। সাধে কি আর মুনি ঋষিরা বলে গিয়েছেন, লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না।'

চন্দ্রনাথ ভাবতেন, টাকা না লাগলে সুন্দরী মেয়ের গরীব

বাপের হয়তো সুবিধে হবে। কিন্তু কালো মেয়েদের বাপেরা যে অথৈ জলে পড়ে যাবে। এখন না হয় টাকার জোরে মেয়েদের ভালো স্বামীর ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। পয়সা যদি না পায়, তাহলে ছেলের বাপেরা তখন কেন রঙ ময়লা মেয়ে ঘরে আনবে? আর এই অভাগা দেশে রঙ ময়লা মেয়ের সংখ্যাই বেশী। ঘরে ঘরে তখন সমথ-আইবুড়ো মেয়ে পড়ে থাকবে, টাকা পয়সা জমিয়েও বাপমায়ের ঘুম হবে না। আর ঘটকরাও ঘটকবিদায় না পেয়ে বাড়িতে হরিমটর চিবোবে।

আজ কেবল পুরনো দিনের কথাই ভাবতে ভাল লাগছে চন্দ্রনাথের। খাটের লাগোয়া আর একটা বোতাম টিপে দিলেন তিনি। সামনে বিরাট কাচের জানলার পর্দাটা এবার আস্তে আস্তে সরে গেল। আকাশটা বিছানা থেকে শুয়ে শুয়ে সুন্দর দেখা যায়। আজ যেন আকাশটা খুব চকচকে নীল দেখাচ্ছে—মেয়ে দেখতে আসবে বলে যেন আকাশ-ঘরের মেঝেটা বিশেষ করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে।

আকাশের তারাগুলোর দিকেও চন্দ্রনাথের দৃষ্টি গেল। আগে কখনও চন্দ্রনাথ ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন না। দিন এনে দিন খেতে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, ভবিষ্যৎ বা অতীত কোনোটা নিয়েই মাথা ঘামাতে পারতেন না। সকাল দুপুর সন্ধ্যা কাটিয়ে আজ চন্দ্রনাথের জীবনে রাত্রি এসেছে। ভাগ্য দেবতার সপ্রসন্ন দৃষ্টি অবশেষে চন্দ্রনাথের ওপর পতিত হয়েছে। চন্দ্রনাথ আজ নিঃসঙ্গ; তাঁর দেহ জরাজীর্ণ তবু বিধাতার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাঁর সব আশা, আকাঙ্ক্ষা তাঁর সন্তানের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। এমন সময় সে নেই— থাকলে সেও সুখী হতো। তার নিশ্চয় আরও আনন্দ হতো।

এই যে অসাধারণ বুদ্ধি পেয়েছে নরোত্তম; এই যে সামান্য দরিদ্র ঘটকের ছেলে নিজের পরিশ্রমে বিরাট প্রতিষ্ঠান

গড়ে তুলেছে—এই প্রতিভা কোথা থেকে এল? তাঁর এতে কোনো দান নেই।

নরোত্তম কাগজওয়ালাদের বললে, 'আমাদের এ ব্যবসা পারিবারিক। আমি কেবল প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিক করেছি। আমার বাবা আজও এই কোম্পানির চেয়ারম্যান। তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়ে আমি সকালে কাজ আরম্ভ করি না।' কিন্তু নরোত্তমের মায়ের বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রনাথ কখনও পেরে উঠতেন না।

আকাশের তারাগুলো হঠাৎ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুদূর অতীতের এক একটা প্রতিনিধি হয়ে তারা আজ চন্দ্রনাথকে কত হারিয়ে-যাওয়া কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। চন্দ্রনাথ যেন পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছেন।

সেই সব দিন, যখন লোকে তাঁকে সামনে চাঁডুঘটক এবং আড়ালে চটপটি চাটুজ্যে বলে ডাকতো। একটু রোগাই ছিলেন চন্দ্রনাথ; আর বগলে ছাতা এবং মাথায় গামছা জড়িয়ে একটু জোরে জোরেই হাঁটতেন তিনি। চটপট না হেঁটে উপায় কি ছিল? কত জায়গায় যেতে হতো। ঘটকের সঙ্গে কথা বলতে লোকে যে অযথা বেশী সময় নেয়।

বগলে খেরো বাঁধানো খাতা নিয়ে চন্দ্রনাথকে কত দূর দূর জায়গায় যেতে হতো। পাত্রের বাবা-মায়ের দম্ভ কতো; ঘটক এসেছে শুনলেই দেখা করতে বেরিয়ে আসেন না তাঁরা। কতক্ষণ চুপচাপ বৈঠকখানায় বসে থাকতে হয়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে হয়তো কর্তা বেরিয়ে এসে বললেন, 'বড় অসময়ে এসেছেন—আমি একটু কাজে বেরোচ্ছি। পরে আসবেন।' অনেকে আবার সোজা বলেই দেন, ঘটকের সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছে নেই তাঁদের।

শ্রীবাস দত্ত সেকেণ্ড বাই লেনের টালির ঘরটার সামনে

সকালবেলায় চন্দ্রনাথ একটা ডেস্ক পেতে বসে থাকতেন। খালি গায়ে না থেকে ফতুয়াটা পরে ফেলতেন—যদি কোনো পার্টি এসে যায়, তারা যেন না ভাবে সস্তা ঘটকের কাছে এসেছে। দরজায় একটা আমকাঠের লেটার-বক্সও বসাতে হয়েছিল—কোন্ দিন হয়তো পাত্র বা পাত্রীর বাবা পোস্টকার্ড লিখে বসবেন।

নটা পর্যন্ত খেরোখাতা নিয়েই বসে থাকতেন চন্দ্রনাথ—সময় কাটাবার জন্যে হলদে রঙের কুষ্ঠির কাগজে একমনে আঁচড় কেটে যেতেন। লোকে ভাবতো চাঁতুঘটক কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখছে। কুষ্ঠির কাগজটা চন্দ্রনাথ নিজে খুব বুঝতেন না, ভালও বাসতেন না তেমন। কিন্তু মাঝে মাঝে উটকো খদ্দের এসে যায়। মেয়ে বড় হচ্ছে—ছক তৈরি না থাকলে আর চলে না। অনেকে সোজাসুজি বলতো—একটু ঠিকঠাক করে দেবেন।

'মানে?'

'মানে, শুনেছি মেয়ের রাক্ষসগণ—ওতে বিয়ের অসুবিধে।'

'রাক্ষসগণ যে খারাপ একথা কে বললে?'

'নরগণের সঙ্গে তাহলে বিয়ে দেওয়া চলবে না, তাতে মেয়ে বিধবা হবে। রাক্ষসে রাক্ষসে বিয়ে হলে সারাজন্ম ঝগড়াঝাটি। কেবল দেবগণ। কিন্তু দেবগণ ছেলে কোন্ দুঃখে রাক্ষসগণ মেয়ে বিয়ে করবে বলুন?'

প্রথম প্রথম রেগে উঠতেন চন্দ্রনাথ। 'যে বিষয়ে কিছু জানেন না, সেখানে মাথা গলাতে চেষ্টা করেন কেন? রাশিচক্রের র' পর্যন্ত বোঝেন না।'

পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন চন্দ্রনাথ। রাগ করে পৃথিবীতে চিরকাল ক্ষতিই হয়ে এসেছে, কখনও লাভ হয়নি। রাশিচক্র করতে এসেই যদি খদ্দের পালায়, তাহলে বিয়ের সম্বন্ধ কোথা থেকে আসবে? তাই মেয়ের বাবাদের ফরমাস

মতো রাশিচক্র করেছেন। আবার সুযোগ বুঝে কাউকে কাউকে সাবধান করে দিয়েছেন—'এটা কি ভাল হচ্ছে মুখুজ্যে মশায়? ভগবান না করুন নকল কুষ্ঠি মিলিয়ে এমন জায়গায় মেয়ের বিয়ে হলো যেখানে হয়তো বৈধব্যযোগ রয়েছে!'

মুখুজ্যে মশায় তখন আঁতকে উঠেছেন। 'কী বলছো তুমি? তাহলে উপায়?'

'আমি বলি কি, নিজের খুশী মতো কুষ্ঠি করান—কিন্তু কোথাও কাজ পাকা করবার আগে আসল কুষ্ঠির সঙ্গে ছেলের কুষ্ঠিটা মিলিয়ে দেখবেন।'

'এটা খুবই বিবেচকের মতো কথা বলেছো ঘটকমশায়। বয়স কম হলে কী হয়, বুদ্ধিটি বেশ খাশা। তা একটা সৎপাত্র দেখো না কেন, আমার মেয়ের জন্যে।'

চন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে খাতা খুলে ফেলেছেন। 'কেমন পাত্র চাই?'

'আমরা কুলীন—তবে তেমন পাত্র পেলে কুল ভাঙতেও রাজী আছি। চাকরি-বাকরি করে, বাড়ি ঘরদোর রয়েছে; দেশে ধানচাল আছে কিছু। আর···'

'আর কী? ইতস্তত করছেন কেন বলুন?'

'দেখো, কথায় বলে ছেলের গুণ আর মেয়ের রূপ। বেটা-ছেলের রূপ নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়? মাকাল ফলকেও বা কে মেয়ে দিচ্ছে? তবুও কিনা মেয়ের মায়ের ইচ্ছে—ছেলের রঙ যেন একটু পরিষ্কার হয়। আর যেন লোমশমুনি না হয়।'

'বুঝেছি, বুঝেছি', চন্দ্রনাথ বিজ্ঞের মতো বলেন। 'এই লাইনে করে খাচ্ছি, আর আপনার কথা থেকে কী চান বুঝতে পারবো না! তা মালক্ষ্মীকে একটু দেখে আসতে হয় তাহলে একদিন। পাত্তর বাড়ি গিয়ে সব কথা বলতে হয় তো। আর আজকাল এমন হয়েছে পাত্তরের বাপ-জ্যাঠা, খুড়ি-পিসি থেকে

আরম্ভ করে বোন, বন্ধু সবাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করতে শুরু করে—কত লম্বা, চুল কত, চোখ কেমন, নাক কী রকম।'

কর্তা বলেন, 'সে তো তাঁরা দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে পারেন।'

'আজ্ঞে, সে তো বটেই, সে তো বটেই। তবে কি জানেন, আগে কর্ণ সন্তুষ্টি হোক, তারপর তো চোখ।'

'ঠিক আছে, দেখো ভাই কী করতে পারো,' বলে মুখুজ্যে এবার উঠতে যান।

কিন্তু চন্দ্রনাথ তখন সোজাসুজি বলেই ফেলেন, 'ঘটক-এর পাওনা-গণ্ডা ?'

'সে তো একশোবার। ঘটক বিদায় না করে কে কবে মেয়ের বে দিয়েছে ?'

'আজ্ঞে সে তো পরের কথা। তার আগেও তো খরচ আছে কিছু। কাজ আরম্ভ করার সময় আমরা কিছু পেয়ে থাকি। তাছাড়া রাহাখরচ।'

'রাহাখরচ !' মুখুজ্যে আঁতকে ওঠেন।

'আজ্ঞে, ছেলে তো সব এই শ্রীবাস দত্ত লেনের খোয়াড়ে বেঁধে রাখিনি। কত দূর দূর জায়গায় যেতে হয়। বর্ধমান, আসানসোল, মুর্শিদাবাদ। তেমন তেমন ক্ষেত্রে ভাগলপুর, পাটনা, মুঙ্গের, দ্বারভাঙা—এমনকি কাশী, গয়া, বৃন্দাবন পর্যন্ত।'

'না বাপু, মেয়েকে আমি অতদূরে পাঠাতে পারবোনি—আগে কাছ বরাবর দেখো।'

'আজ্ঞে, শ্যামবাজার বা মাণিকতলায় যেতে গেলেও' তো কয়েক গণ্ডা পয়সা লাগে। একবার গেলেই কিছু কাজ হাসিল হয় না। তাছাড়া জলখাবার আছে। সামান্য কিছু প্রথমে সবাই দিয়ে থাকেন। বৌদির বাবা তো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন—বৌদিকেই জিজ্ঞেস করে দেখবেন।'

ভদ্রলোকও অতো সহজে গলবার পাত্র নন। বলেন, 'যখন বলছই, তখন তোমার বৌদির সঙ্গেই কথা বলে দেখি। একদিন সময় করে বাড়িতে এসো না। আর যদি কোনো পাত্রের খবর থাকে নিয়ে এসো—সব কিছু খুঁটিয়ে না দেখে হটকরে কারুর বাড়ি ঘটক পাঠানোও কিছু ভাল কাজ নয়। কী বলো?'

জীবনসংগ্রামের সেই কঠিন দিনগুলো চন্দ্রনাথের বেশ মনে পড়ে যাচ্ছে। কাজ জোগাড় করা যে কি কঠিন ছিল। পৃথিবীতে কত লোকেরই তো বিয়ে হয়—কিন্তু তাদের সবার যেন আগে থেকেই ঘটক ঠিক হয়ে রয়েছে। চন্দ্রনাথের বয়সটাও নিজের বিপক্ষে ছিল। বয়স্ক লোকরা ছোকরা ঘটক পছন্দ করেন না—বিশ্বাস করতে বাধে তাঁদের। তাঁরা ভাবেন এসব দায়িত্বপূর্ণ সমস্যা, ছেলে-ছোকরার কাজ নয়।

তবু আশা ছাড়েননি চন্দ্রনাথ। এইভাবে ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে থাকতেই একদিন নাম হয়ে যাবে। তখন আপনা থেকেই লোকেরা চাঁদুঘটকের কাছে ছুটে আসবে।

আপাতত একবার মুখুজ্যের বাড়িতে যাওয়া দরকার। কর্তা-গিন্নির সঙ্গে কথা বলে যদি কিছু রাহা খরচ জোগাড় করা যায়। পাত্রর একটা খোঁজ আছে হাতে—ভদ্রকালী, শখেরবাজার লেনে, মার্চেন্ট আপিসে কাজ করে। পরে আরও উন্নতি হবে। কিন্তু ওই একটি পাত্র দেখিয়ে পাঁচজনের কাছে রাহাখরচ জোগাড় করেছেন চন্দ্রনাথ। কুমীরের ঘরে সেই শিয়ালছানার মতো—একটাকেই একুশবার দেখানো।

মুখুজ্যে বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো। গায়ে চাদর জড়িয়ে অমন লক্ষ্মী প্রতিমার মতো কে বেরিয়ে আসছে? ওই তো রণেন ঘটকের মেয়ে সুধা। রণেন অসুখ হয়ে শয্যাশায়ী হবার পর সুধা নিজেই ঘটকী

হয়েছে। বাপের কাজগুলো এখন সুধা নিজেই দেখছে। না হলে সব যজমান হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর যা রোগ হয়েছে বাপের তা একদিনে সারবার কথাও নয়।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল চন্দ্রনাথ। কর্তা বললেন, 'তোমাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলুম। তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে—মেয়েটার বোধ হয় একটা হিল্লে হয়ে গেল।'

'কোথায় ?'

বুদ্ধিমান মুখুজ্যে হেসে ফেললেন, 'তা ভাই, পৃথিবীতে এমন বোকা কে আছে যে সে খবর আগে থেকে গেয়ে বেড়াবে ? সব কথা পাকা হোক, বিয়ের দিনস্থির হোক, তখন সব জানতে পারবে। তখন এসে একপাত খেয়ে মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করে যেও।'

মনে মনে রাগ হলেও, বাইরে খুশীর ভাব দেখাতে হলো চন্দ্রনাথকে। 'তা বেশ, বেশ। একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ—কোথায় কার ভাগ্যে কি জুটে যায়।'

'ভাগ্য নয় গো শুধু—গতরও আছে। সুধা ঘটকী না হলে এ-বিয়ে কি আর হতো ? কদিন ছেলের বাড়িতে হত্যে দিয়ে পড়ে ছিল। ছেলের দাদু তো বেঁকে বসেছিল—সুধাই হাতে-পায়ে ধরে রাজী করালে। শাড়ি, চাদর, টাকা ছাড়াও আমি মিনেকরা আঙটি দিয়ে ঘটকী বিদেয় করবো।'

'আজ্ঞে, সে তো খুবই ভালো কথা,' চন্দ্রনাথ সায় দিয়েছিলেন।

মুখুজ্যে বলেছিলেন, 'ওইটুকু মেয়ে হলে কী হয়, সুধার কি মিষ্টি কথাবার্তা—ওর বাপের থেকে ঢের কাজের মেয়ে। কালে কালে খুব নাম করবে দেখে নিও।'

ওখান থেকে চলে আসবার পরও মুখুজ্যের কথাগুলো চন্দ্রনাথের কানের মধ্যে বিকট শব্দ করে বাজছিল—যেন কেউ

পর্দা ফাটিয়ে দেবার জন্যে খুব কাছ থেকে ঘণ্টা নাড়ছে। আহা, সুধা বলতে সব যেন অজ্ঞান—এতো আদিখ্যেতা সহ্য হলে হয়।

সুধার সঙ্গে চন্দ্রনাথের কয়েকবার পথে দেখা হয়েছে। অনেক সময় একই বাসে হাওড়ায় গিয়েছে। দু'জনে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। কিন্তু কেউ কথা বলেনি। সুধা মুখ বুজেই থাকে। অথচ যজমানের বাড়ি গিয়ে এই মেয়েরই মুখ দিয়ে নাকি খই ফোটে।

যাক, এ সব নিয়ে মাথা না ঘামানই ভাল। চন্দ্রনাথের হাতেও যে কাজ নেই এমন নয়। কয়েকটা পাত্রী তো রয়েছে—শুধু কপালঠুকে পাত্র জোগাড় করে ফেললেই হলো। আর চলেও যাচ্ছে তো। এ পাড়ার কম মেয়ে তো চাঁতুঘটকের হাত দিয়ে পার হলো না। আসলে কখন কোথা দিয়ে যে সম্বন্ধ এসে যায় স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না। কাউকে অবহেলা করতে নেই। লোকের সঙ্গে ধীরে-সুস্থে কথা বলাও চাই—সব সময় ধড়ফড় করলেও চলবে না।

এই তো সেদিন শ্রীরামপুর স্টেশনে নেমে চাতরার দিকে যাচ্ছিলেন চন্দ্রনাথ। রোদ্দুরের জন্যে মাথায় গামছা চাপা দিয়েছিলেন। এমন সময় চকচকে মোটর এসে থামলো। পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছিল। পাশে স্ত্রী।

প্রথমে চিনতেই পারেননি চন্দ্রনাথ। ছোকরাই তাঁকে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে তুলে নিল। 'আরে ঘটকমশায়, কেমন আছেন? এদিকে কোথায়?'

মেয়েটি দামী শাড়ি পরেছে, আর অনেক গয়না। সে বললে, 'চিনতে পারছেন? আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন?'

সব মনে পড়ে যাচ্ছে চন্দ্রনাথের। 'চিনতে বিলক্ষণ পারছি মা। তোমার বাবা তো মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে ভেবে শরীরই খারাপ করে ফেলেছিলেন। আমি বলেছিলাম, খুব ভাল কুষ্ঠি—ফুল ফুটলেই বিয়ে হয়ে যাবে। তা তোমরা সুখী হয়েছো?'

ওরা দু'জনে কোনো উত্তর না দিলেও ওদের মিষ্টি হাসিতেই সব বোঝা যাচ্ছে। মেয়েটির কোলে সাদা টার্কিশ তোয়ালে জড়ানো বাচ্চা রয়েছে। 'খোকা না খুকু?' চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন।

'খোকা।' মেয়েটি বলে, 'এগারো মাস হলো।'

বেশ লাগছে চন্দ্রনাথের। এই তো সেদিন সন্ধ্যার বিয়ের জন্যে কত জায়গায় ছোটাছুটি করছিলেন তিনি। তারপর এই তো সেদিন পাকা-দেখা হলো, আষাঢ় মাসে বিয়ের ঠিক হলো—জ্যৈষ্ঠতেই হতো, যদি না জ্যেষ্ঠ ছেলে হতো। সন্ধ্যার বাবা বলেছিলেন, আমরা ওসব মানিনে; কিন্তু ছেলের মা ওসব মানেন। তারপর এরই মধ্যে কত ঘটনা ঘটে গিয়েছে —সেই সন্ধ্যার ছেলেও হয়ে গেল। সন্ধ্যা অনেক মোটাও হয়েছে। ফিক করে হেসে ফেললেন চন্দ্রনাথ 'হাসছেন কেন?' স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতেই শ্যামল জিজ্ঞেস করলে।

'দেখলে তো বাবাজী, তখন এই চাতুঘটক ঠিক কথাই বলেছিল। মেয়ে রোগা বলে তোমার দিদিমার সে কি চিন্তা —নাকি চাল ভাজার মত চেহারা। তখন আমি বলেছিলাম —চাল ভাজা নয় চিঁড়ে। বিয়ের জল পড়লেই ডবল হয়ে যাবে। গয়নাগাটি, জামা সব তখন পালটাতে হবে।'

ওরা দু'জনেই খুব মজা পাচ্ছিল। এক সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল। সন্ধ্যা এবার ছেলেকে চুমু খেল। বললে, 'আমার এই ছেলের জন্যে এখন থেকে বলে রাখলাম। খুব ভাল একটি পাত্রী জোগাড় করে দেবেন—আমার মতন কেলে-কুশ্রী না হয় যেন, প্রকৃত সুন্দরী হওয়া চাই।'

'ইস, মার মতো এমন লক্ষ্মীশ্রী কোথায় পাওয়া যায়? তাই না বাবাজী?'

বাবাজী যে একমত তা তার মুখের ভাব দেখেই বোঝা

গেল। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললে, 'আপাতত এই রকম মেয়ে আর একটি জোগাড় করে দিন। আমার ভাই-এর জন্যে—সবে বিলেত থেকে ফিরেছে। ভাল মাইনে পায়।'

হাতে স্বর্গ পেলেন যেন চন্দ্রনাথ। দিন-দুপুরে নিজে থেকে এমন পাত্রের খবর পাওয়া! নরেন রায় মশায় এমন পাত্রের খবর পেলে ঘটককে সত্যিই খুশী করে দেবেন। তাছাড়া নরেন রায় তাঁর বাড়িওয়ালা—হয়তো বিনাভাড়ায় থাকতে দেবেন।

মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে, চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তা তোমরা রূপ চাও না গুণ চাও?'

সন্ধ্যা বললে, 'আমরা দুই-ই চাই।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার হাতে একটি সাক্ষাৎ মালক্ষ্মী আছেন। এ মেয়ে যে ঘরে যাবে, লক্ষ্মী সেখানে বাসা বাঁধবেন। রঙটা একেবারে টকটকে ফর্সা নয়। কিন্তু গড়ন-পিটন, স্বাস্থ্য আহা গেরস্তর ঘবে অমন দেখাই যায় না। আর তেমনি মাথায় উঁচু। আজকাল, কেন মিথ্যে বলবো, বেশীর ভাগ মেয়েই তো বেগুন গাছে আঁকশি দেয়।'

শ্যামল বললে, 'আমার ভাই-এরও একটু লম্বা পছন্দ।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'বিলেত-ফেরতের যোগ্য মেয়ে—এর মধ্যেই দুটো পাস দিয়ে ফেলেছে।'

'তাহলে তো কথাই নেই।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'মেয়ের কুষ্ঠি আমি নিজে তৈরি করেছি—এ মেয়ে রাজরানী হবে।'

শ্যামল জিজ্ঞেস করলে, 'আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেবো?'

চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম্—এখন তোমাদের বাড়ি ছাড়া কোথাও নয়, ভাই। আগে মায়ের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

একেই বলে ভবিতব্য—বিয়ে হয়েছিল শুধু নয়, পনেরো

দিনের মধ্যে শুভকার্য সম্পন্ন। নরেন রায় তাঁর কথাও রেখেছিলেন। বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলেন চন্দ্রনাথ; ঘরের ভাড়াও দু' টাকা কমে গিয়েছিল।

এই নরেন রায়ের ভাইঝিকে পাত্রস্থ করবার সুযোগও চন্দ্রনাথের পাওয়া উচিত ছিল। ওরা থাকতো ফাঁসিতলা মোড়ের কাছে। ওরাও ভাল পাত্র চেয়েছিল।

চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'নরেনবাবুর জামাই-এর মতোই ছেলে খুঁজে দেবো। ওই রকম রাজপুত্তুরের মতো চেহারা। নিজেদের মোটরগাড়ি চড়ে মেয়ে-জামাই যখন শনিবারে বেড়াতে আসবে তখন চোখ জুড়িয়ে যাবে।' তবে এমন পাত্র তো পথেঘাটে চরে বেড়াচ্ছে না, তাকে খুঁজতে হবে। সুতরাং আগাম পনেরো টাকা এবং রাহাখরচ বাবদ আরও কিছু চেয়েছিলেন। ওরা বলেছিল, আচ্ছা খবর দেবো।

হয়তো একটু বেশীই চেয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। দরদস্তর না করে কলিকালে কেই বা টাকা দিয়ে থাকে? কয়েক টাকা কম নেবার জন্যে চাঁদুঘটক'ও তো প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কোনো খবরাখবর নেই এ কেমন কথা? কয়েকদিন পরে খোঁজ করতে গিয়ে দেখলেন, সুধা সেখানে বসে আছে। কালে কালে হলো কী? ঘটকীর স্পর্ধা দিনে দিনে বাড়ছে। অন্য লোকের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিচ্ছে।

রাস্তার মোড়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চন্দ্রনাথ। রক্ত টগবগ করে ফুটছে। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করেই ঘটকালির ব্যবসাটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। আজই একটা এসপার-ওসপার করবেন চন্দ্রনাথ। সুধাকে রাস্তাতেই ধরবেন। সুধা আসছে, দূর থেকে দেখতে পেলেন চন্দ্রনাথ। হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে চন্দ্রনাথ কি বলবেন তা রিহার্সাল দিতে লাগলেন—বাবার পুরনো ঘরগুলো নিয়ে পড়ে

থাকো, বলবার কিছু নেই। কিন্তু অন্যের জমিতে লাঙল দিতে গেলে…

সুধা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। সুধাকে ঘটকী বলে মনে হয় না। নেহাতই কম বয়স। তবু গায়ে এণ্ডির চাদর জড়িয়ে, হাতে একটা পুরনো পাড়ের তৈরি থলে নিয়ে সুধা ভারিক্কি গিন্নি-বান্নি হবার চেষ্টা করেছে। সুধার এণ্ডির চাদরের খুঁটটা আঁচলের মতো খসে খসে পড়ছে; আর সুধা বারবার সেটা তুলে দিচ্ছে---ওটা যেন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

একটা ঢোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন চন্দ্রনাথ—এবার রাস্তার উপর ছ্যাড়ছ্যাড় করে শুনিয়ে দেবেন সুধাকে।

সুধা কাছে এল; চন্দ্রনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে সে একবার থমকেও দাঁড়াল। কিন্তু কে যেন চন্দ্রনাথের গলা আটকে ধরেছে। একটা কথাও বলতে পাবলেন না। হাজার হোক মেয়েমানুষ—খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকে কিছু বলা চাঁতুঘটকের কাজ নয়। হাজার হোক ভদ্দরলোকের ছেলে; নিতান্ত পয়সার অভাবে এই ঘটকের বৃত্তি নিতে হয়েছে।

সুধা এবার সামনের বাড়িতে ঢুকলো। ওখানেও ঘটকালী করছে নাকি সুধা? কত কাজ আছে তাহলে ওর? এ-সব কাজ তো চাঁতুঘটকের পাওয়া উচিত ছিল। সত্যি, যুদ্ধ লেগেছে তু'জনের মধ্যে।

সুধার বাড়িও এমন কিছু দূর নয়। চায়ের দোকানে বসে ওখানে নজর রাখলেই বোঝা যায়—কারা কারা আসছে। কিন্তু তাতে লাভ কী, চন্দ্রনাথের কাজ তাতে বাড়বে না। তবে ভিতরের খবর একটু নিতাই-এর কাছে নিলে হয়।

নিজের গলির মোড়ে নিতাই-এর পান-বিড়ির দোকানে এলেন চন্দ্রনাথ। নিতাই ছোকরা পান সাজতে সাজতে বললে, 'আমার কথাটা মনে আছে, না ভুলে গিয়েছো?'

'ভুলবো কেন? তোর কপালে নেই, আমি কী করবো? অমন মেয়ে দিলুম—বছর না ঘুরতেই বাঁশতলাঘাটে পাঠিয়ে ছাড়লি।'

'কুষ্টি-টুস্টি ভালো করে মেলালে না তুমি তখন,' নিতাই পানে চুন ঘষতে ঘষতে বললে।

'কুষ্টি মিলিয়ে কী করবো? তোর ছকেই লেখা রয়েছে দোজবরে হবি তুই। দ্বিতীয় বউ প্রথম বউ-এর থেকেও সুন্দরী হবে।'

'তাহলে একটু উঠে পড়ে লাগো। মেয়ে যেন এবার একটু ডাগর-ডোগর হয়—গতবারে নেহাত খুকী ছিল।'

'ফেলো কড়ি মাখো তেল। ঘটককে কিছু আগাম দাও।'

'এ্যাদ্দিন ধরে এতো যত্ন করে ডবল মশলা দিয়ে পান খাওয়াচ্ছি।'

'তাতে কি মাথা কিনে নিয়েছিস, বাপু? তোর ব্যবসা তুই করছিস, আমি আমার। ঘটক বিদায় চাই—দশটি টাকা, একজোড়া ধুতি, গামছা, একটা গাড়ু।'

'আগে মেয়ে দেখো তো, তারপর কথা।'

পানের পিক ফেলবার জন্যে চন্দ্রনাথ একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় সুধাকে নিতাই-এর দোকানে থামতে দেখা গেল। এই বাড়ির পিছনের দিকে একটা ঘরে সুধারা থাকে। সুধার সঙ্গে নিতাই-এর যথেষ্ট ভাব। সুধা বাবার জন্যে বিড়ি কিনছে; আর একটা কাপড়-কাচা সাবান। মেয়েটা আরও কী একটা জিজ্ঞেস করছে যেন। চন্দ্রনাথের কান সজাগ হয়ে উঠলো।

সুধা বলছে, "৮২/৩, কুলিয়া ট্যাংরা ফাস্ট লেনটা কোথায় জানেন?"

নিতাই বললে, "এমন নাম তো মনে পড়ছে না, দিদি। খোঁজ করে বলতে পারি।"

এ-সব কতদিন আগেকার কথা। মনে রাখবার কোনো কথা নয়; ভুলে গেলে কোনো ক্ষতিও হতো না; কিন্তু চন্দ্রনাথের স্মৃতিতে সব যেন আকাশের তারার মতো স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে।

এয়ার কুলার মেশিনের ঠাণ্ডাটা আরও বাড়িয়ে দিলেন চন্দ্রনাথ। বিছানা ছেড়ে চেয়ারে এসে বসলেন। রকিং চেয়ারটা পায়ের চাপে সামান্য তুলিয়ে দিলেন। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো তাঁর প্রাচীন শীর্ণ দেহটা তুলছে।

মাথায় দুষ্ট সরস্বতী ভর করেছিল সেদিন। সঙ্গে সঙ্গে মতলব ভেঁজে ফেলেছিলেন চন্দ্রনাথ। সুধা বাড়িতে ঢুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিতাই-এর দোকানের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। বিবেক থেকে একবার বাধা এসেছিল, কিন্তু থেমে যাননি চন্দ্রনাথ।

'একটা দেশলাই দে তো,' চন্দ্রনাথ বলেছিলেন।

'তুমি ফিরে এসেছো ভালই হয়েছে। কুলিয়া ট্যাংরা ফাস্ট লেনটা কোথায় বলো তো?'

কলকাতার পথঘাট চন্দ্রনাথের মুখস্থ। তিনি জানেন, ওটা পামার বাজারের দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড থেকে বেরিয়েছে। এন্টালির কনভেন্ট রোড থেকে কনভেন্ট লেন, কনভেন্ট লেন থেকেই পামার বাজার।

কিন্তু আজ একটু বুদ্ধি খাটানো যাক। বিজ্ঞের মতো বললেন, 'কুলিয়া ট্যাংরা ফাস্ট লেন? ওটা বেহালায়। বেহালা ফাঁড়ির কাছে নেমে পশ্চিম দিক ধরে যেতে হবে। তারপর পড়বে হরিসভা স্ট্রীট। হরিসভা স্ট্রীট থেকে হরিসভা লেন। আরও মিনিট আষ্টেকের পথ ওখান থেকে।'

'ঠিক জানো তো?' নিতাই প্রশ্ন করে।

'যা জানি, তাই বলে দিলাম,' চন্দ্রনাথের মুখের ভাব দেখে অবিশ্বাস করবার মতো কিছুই ছিল না।

দেরি না করে খাওয়া-দাওয়ার পর চন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়েছিলেন। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। নম্বরটা যখন পেয়েই গিয়েছেন, তখন কুলিয়া ট্যাংরা লেনে যেতে হচ্ছে একবার। ওখানে সুধা যাচ্ছে কেন? পাত্র না পাত্রী? হয়তো এখানকারই কোনো মেয়ের পাত্র সন্ধান করতে। চন্দ্রনাথের হাতেও তো অনেক মেয়ে আছে—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বদ্যি, সোনারবেনে, গন্ধবেনে, তেলি, তামলি, কৈবর্ত, ক্ষত্রিয়। অভাব কেবল ছেলের—না হলে তো মাসে দু ডজন বিয়ে লাগিয়ে দিতে পারতেন চন্দ্রনাথ। অথচ ওই এক-ফোঁটা মেয়ে সুধা টপাটপ বিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছে। কি বুদ্ধি, হিংসে হয় চন্দ্রনাথের।

এই এতদূর থেকে যখন পামার বাজারে যাচ্ছে সুধা, নিশ্চয় কোনো মধু আছে। বেহালার রাস্তায় ঘোরপাক খেয়ে শেষ পর্যন্ত যখন পামার বাজারে পৌঁছবে সুধা, তখন দেখবে ভ্রমরে মধু খেয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মধু চুরি করতে গিয়ে সেবার কি লজ্জাই পেয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। যখন ট্যাংরা ফাস্ট লেনের বাড়িটা খুঁজে বার করলেন, তখন রহস্যটা স্পষ্ট হয়ে গেল। এটা একটা হকিমি মালিসের দোকান।

এই বিশ্রী নোংরা পল্লীতে হকিমের বাড়িতে সুধা আসতে চেয়েছিল কেন? হঠাৎ লজ্জায়, অনুশোচনায় মনটা ভরে উঠেছিল চন্দ্রনাথের। জেদের বশে একি করে ফেলেছেন চন্দ্রনাথ। আরে মেয়েটা—টাকার জন্যে টোটো করে বিশ্বসংসার চষে বেড়ায়। কোনদিন কোথায় বিপদে পড়ে যাবে।

এন্টালির মোড়ে বাসে বেশ ভীড় ছিল—কিন্তু প্রথম

বাসটাই ধরে ফেলেছিলেন চন্দ্রনাথ। মনটা কেমন ছটফট করছে। সুধা এখানে আসতে চেয়েছিল কেন? সমস্ত দেহটা শিরশির করছে চন্দ্রনাথের।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে চন্দ্রনাথ নিতাই-এর দোকানে চলে এসেছিলেন। 'কী ব্যাপার দাদা? এতো হাঁপাচ্ছো কেন? আমার কোনো সম্বন্ধ পেয়েছো নাকি?'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'নারে, একটা বেজায় ভুল করে বসেছি। সকালে তোকে ভুল খবর দিয়েছিলাম। কুলিয়া ট্যাংরা লেন বেহালায় নয়। কার জন্যে খবর নিয়েছিলি তুই? তাকে বারণ করে দে।'

নিতাই অমনভাবে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কেন? ওকি সব বুঝতে পারছে? না, বোধ হয় ও বোঝেনি। নিতাই বিড়ি পাকাতে পাকাতে বললে 'কি করলে বল দিকিনি। দিদি তো বেরিয়ে গেছে। বাবার কষ্ট খুব বেড়েছে। ওখান থেকে ওষুধ নিয়ে আসবে।'

ভয় হচ্ছে চন্দ্রনাথের। বেহালায় ঘুরে ঘুরে যদি সন্ধ্যে হয়ে যায়, তারপর সুধা খবর করে আবার ক্যানাল সাউথ রোড ধরে রাত্রের অন্ধকারে ওই বিশ্রী গলিটায় যাবে না তো? জায়গাটা তেমন সুবিধে মনে হয়নি চন্দ্রনাথের।

নিতাই বলে, 'কী এতো ভাবছো? গভরমেণ্টের রসিদ স্ট্যাম্প সই করে রাস্তার খবর দাওনি তুমি।'

'না, কিন্তু তা হলেও'—চন্দ্রনাথ ভালভাবে কথা বলতে পারছিলেন না।

'একবার খোঁজ করবি নাকি?' চন্দ্রনাথ নিতাইকে অনুরোধ করেন। দোকান ফেলে রেখে নিতাই সুধার ঘর দেখেও এল। সুধা ফেরেনি। সুধার বাবা গোঙাচ্ছে।

এদিকে সন্ধ্যা নেমেছে। পঞ্চাননতলা রোডের আলোগুলো

জ্বলে উঠেছে। অনেক বাড়িতে শাঁখ বাজছে; আর ছটফট করছেন চন্দ্রনাথ।

বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে লাগলেন চন্দ্রনাথ। গোপাল ব্যানার্জি লেনে একটা সম্বন্ধ আছে—সন্ধ্যেবেলায় যাবার কথা ছিল। কিন্তু সে সব পড়ে থাক। হাওড়া স্টেশনের বাসে চড়ে বসলেন চন্দ্রনাথ। স্টেশন থেকেই এণ্টালীর বাস পাওয়া যাবে। তারপর দরকার হলে রিকশা করবেন। রিকশা করবার মতো সামর্থ্য নেই তাঁর। কিন্তু উপায় কী? নিজের প্রায়শ্চিত্ত নিজেকেই করতে হবে তাঁকে। এখন মেয়েটা ভালয় ভালয় ফিরলে হয়।

রিকশার উঠতে গিয়ে দেখা হয়ে গল। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাস থেকে নেমে সুধা চলেছে। চন্দ্রনাথকে দেখে থমকে দাঁড়াল সুধা।

এগিয়ে এসে চন্দ্রনাথ বললেন, 'ভালই হলো দেখা হয়ে গেল। ভুল খবর দিয়ে ফেলেছিলাম সকালে। রাত্রিতে জায়গাটা মেয়েদের পক্ষে খুব ভাল নয়।'

সুধা তবুও যাচ্ছিল। তখন বাধ্য হয়েই চন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনি বাড়ি ফিরে চলুন।'

সুধাকে সঙ্গে নিয়ে হকিমের দোকানে যাবার প্রস্তাব করতে পারতেন চন্দ্রনাথ। কিন্তু সাহস করেননি। অনেকটা পথ—একটা রিকশা। দুটো রিকশাও করা যেতো হয়তো। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন।

বাসে উঠে পড়েছিলেন দু'জনে, আর কোনো কথা হয়নি।

তারপরের সব ঘটনাও চলমান ছবির মতো দেখতে পাচ্ছেন চন্দ্রনাথ। সড়যন্ত্রটা সুধার কাছে ধরা পড়ে যায়নি; গেলে লজ্জার শেষ থাকতো না।

দুই ঘটকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য বেড়েই চলেছে। একটা

মেয়ে ঘটকীর কাছে হার মেনে নেবার মতো পুরুষ চন্দ্রনাথ নন। তিনি রেট কমিয়ে দিয়েছেন। মেয়েদের পাত্রস্থ করবার জন্যে সুধার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পাত্রদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। যখন একটা লেগে গিয়েছে, তখন ঘটক-বিদায়ের জন্য দরদস্তুর করেননি। বলেছেন, 'আমি কি চাইবো? আপনার যা খুশি হয় দিন। বরং কিছু পাত্রপাত্রীর খবর দিন—আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যদি আমার নামটা একটু বলে দেন তাহলে আরও দু'একটা সম্বন্ধ করে আনন্দ পাই।'

কিন্তু এতো চেষ্টা করেও সুধার সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন না চন্দ্রনাথ। যেন কোনো বশীকরণ মন্ত্র শিখে রেখেছে সে। এ-পাড়ার কতো মেয়েই সুধার ঘটকালীতে ঝটপট কপালে সিঁদুর পরে ফেললে।

নিতাই-এর দোকানে পান খেতে এলে, নিতাই বলে, 'তা দাদা আমার কী করলে?'

'আগাম ছাড় কিছু, তবে তো পাত্রী সন্ধান শুরু করি। দোজবরের জন্যে মেয়ে জোগাড় করা খুব সোজা কাজ নয় রে।'

একটু থেমে চন্দ্রনাথ বললেন, সুধা ঘটকীকে বল্ না। তোর সঙ্গে তো খুব আলাপ।'

বিড়ির কোণ মুড়তে মুড়তে নিতাই বলে, 'মরণ আর কি! ওই এক ফোঁটা মেয়েকে আমি নিজের বের সম্বন্ধ করতে বলি।'

চন্দ্রনাথ পান চিবোতে চিবোতে বলেন, 'ঘটক বিদায় ছাড়া আমি কোনো কাজ করি না। যদি আমার দাদার মেয়ের বিয়েও পাকা করি—ঘটকের পাওনা ছাড়বো না।'

নিতাই বলে, 'তোমাদের লাইনটা বেশ ভাল। সারাদিন ঢুলে ঢুলে বিড়ি পাকিয়ে বারোগণ্ডা পয়সা রোজগার করতে বাই জন্মে যায়। আর তোমাদের কিছু না করেও টাকা আসে। আবার যেখানে যাও সেখানে চা, সিঙ্গাড়া, অমৃতি, দরবেশ খেতে দেয়!'

'দূর থেকে যত সুখের মনে হয়, তত সুখের নয়।'

'দূর থেকে কেন? কাছ থেকেই তো সুধাকে দেখছি—এইটুকু মেয়ে, এই ক' বছরে কী করে ফেললে। বাপের চিকিৎসার খরচ করেও টাকা জমিয়ে গয়না গড়াচ্ছে। আরও হতো যদি না তোমার সঙ্গে রেষারেষি থাকতো।'

'মানে?' চন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

'মানে তুমিই তো বাজারে দাম কমিয়ে দিয়েছো—অনেক কম পয়সাতে কাজ করছো সুধাকে তাড়াবার জন্যে।'

'তাড়াবার জন্যে—'

'তাই তো কানে আসে।'

'কানে তোমার ভুল খবর আসে। তাড়াবার জন্যে নয়, বেঁচে থাকার জন্যে। যেভাবে আমার খদ্দের ভেঙে নিচ্ছিল, আর দেরি করলে আমার হাতে কোনো কাজই থাকতো না।'

'তোমার কত বুদ্ধি। তোমার সঙ্গে একটা আইবুড়ো মেয়ে ঘটকালীতে পেরে উঠবে? বাপের অসুখ, নিতান্ত আর কোনো গতি নেই, তাই এই ব্যবসায় লেগে রয়েছে। নইলে ওর জন্যেই তো ঘটক লাগানোর কথা।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'বুদ্ধিতে সুধার কাছে আমি ছেলেমানুষ। ঐ মেয়ে যে কী করে ডজন ডজন ছেলের খবর জোগাড় করে ভেবেই পাই না। কোন ছেলে পাস করেছে; কোন ছেলের চাকরি পাকা হলো, সব খবর আগে থেকে নিয়ে বসে আছে।'

নিতাই বললে, 'জানি না বাপু, সুধা তোমাকে ভয় পায়, এইটুকু বলতে পারি। ভেবে ভেবে মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে।'

চন্দ্রনাথের লজ্জা লাগছিল। নিশ্চয় এমন কিছু করেছেন তিনি যার জন্যে মেয়েটার ব্যবসা সম্বন্ধে চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। তিনি বললেন, 'আমার সাতকুলে কে আছে বলো? একটা পেট এই ঘটকালীতে চলে গেলেই হলো। আমাকে কারুর

ভয় পাবার নেই। আসল ভয় পাবার হলো—আজকালকার লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েদের। নিজেরা জানাশোনা করে যদি বিয়ে করে ঘটকরা বেকার হবে। ওই যে চাটুজ্যে বাড়ির বড় ছেলের বাপ যেমন পণ পেলে না; ঘটকরাও একটা আধলার মুখ দেখলে না। আমি না হয় সুধা যে কেউ তো কিছু পেতো।'

নিতাই বললে, 'এ চত্বরে তোমরা দুজনেই তো কেবল আছো। আর ভগবানের দয়ায় এ দিককার লোকের মেয়ের সংখ্যা একটু বেশী।' চন্দ্রনাথ বললেন, 'হুঁ, কিন্তু অসুবিধে অনেক —কম বয়সের ঘটকদের কত অসুবিধে সে তো জানো না।'

নিতাই বললে, 'তাহলে সুধার কথা ভাবো। আইবুড়ো ঘটকীকে কে বিশ্বাস করবে?'

'মানে?' চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন।

'আমার বাপু মুখের বাঁধন নেই কিছু মনে করো না—মানে হলো আপনি পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে! আইবুড়ো অন্য আইবুড়োর বে'র সম্বন্ধ করবে!'

চন্দ্রনাথের সঙ্গে নিতাই-এর সম্পর্কটা বেশ মধুর হয়ে উঠেছিল। নিতাই-এর স্বার্থ আছে, বিনাখরচে ঘটকালী করাতে চায়। দ্বিতীয়পক্ষেও পণ নেবার ইচ্ছে নিতাই-এর। বলে, নিজের পকেট থেকে খরচ করে বিয়ে আমি কেমন করে করবো।' চন্দ্রনাথ বলেন, 'দোজবরেদের তাই করতে হয়।' চন্দ্রনাথেরও স্বার্থ আছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর খবরাখবর দরকার। সুধা ঘটকীর কাজকর্মের এবং প্রতিপত্তির একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিতাই-এর কাছে। সুধা এতো সুপাত্রের খোঁজ পায় কোথা থেকে চন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারেন না। একটা ভালো পাত্র গাঁথতে পারলেই কড়কড়ে কুড়িটি টাকা।

নিতাই মিটিমিটি হাসে। 'কিছু খরচ করতে হয় দাদা।

এই শম্মার কানে অনেক পাত্রের খবর আসে—পানবিড়ির দোকান কিনা! তাছাড়া ইন্দ্রর সেলুন রয়েছে—বিড়ি মুখে কাঁচি চালাতে চালাতে ইন্দ্র বহু পাত্রের পেটের খবর নেয়। তার বদলে সুধার কাছ থেকে কিছু পাওয়াও যায়!'

চন্দ্রনাথ সুধার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যান! এতোদিনে তাহলে রহস্যটা বোঝা গেল। তাই বলি, ঘরে বসে বসে সুধা দুনিয়ার সংবাদ পেয়ে যায় কি করে! দেখতে অত লাজুক অত বোকাসোকা হলে কী হয়, সুধা সত্যি মগজে কিছু রাখে।

এবার যেন একটু শীত শীত করছে। এয়ারকুলারটা বোধ হয় বেশী বাড়ানো হয়ে গিয়েছে। বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন চন্দ্রনাথ। দেওয়ালে টাঙানো ঠাণ্ডা মাপার যন্ত্রটা দেখতে বললেন। বেয়ারা গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিয়ে গেল। কম্বল রাখতে ইচ্ছে করে না; কিন্তু নরোত্তম না হলে রাগ করবে; হয়তো সত্যিই নার্স অ্যাপয়েন্ট করে বসে থাকবে।

নরোত্তমের প্রখর বুদ্ধি। নিজের প্রচেষ্টায় কি বিশাল ব্যবসা ফেঁদে বসেছে এই ক' বছরে। কিন্তু নরোত্তমের বুদ্ধি হবে না তো কার হবে? এই আশ্চর্য বুদ্ধি তাঁকে মোটেই আশ্চর্য করে না। এ রকম না হলেই বরং তিনি বিস্মিত হতেন।

সুধা, সুধা, সুধা। নিতাই, পাত্র, পাত্রী, পণ, দানসামগ্রী, পাকা-দেখা, বিয়ে, বৌভাত, ঘটক-বিদায় কত অবিন্যস্ত কাটা কাটা স্মৃতি চন্দ্রনাথকে আজ দোলা দিচ্ছে। আজ যে বড় আনন্দের দিন। অথচ সবচেয়ে যার আনন্দ হতো সে নেই।

সুধা তাঁর মধ্যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। একটা সামান্য মেয়ের কাছে ঘটকালীতে হার মানবো, কিছুতেই নয়। সুধা যেন বড় বাড়ছে। সুধার কাছে আজকাল কত মেয়ের বাবা ধন্না দেয়। চন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে পিছনে লাগতে পারেন। তাঁর এক

বন্ধু বলেও ছিল, 'ভাঙচির চিঠি পাঠাও। একটু খোঁজখবর নিয়ে, যেখানে সুধা সম্বন্ধ করছে সেখানে উড়োচিঠি দাও।'

না, তা করবেন না চন্দ্রনাথ। উমাকিঙ্করবাবুর মেয়ের ঘটনাটা ফলাও করে রটালেও বেশ কাজ হতে পারে। উমাকিঙ্করবাবুর জামাই মাতাল; অস্থানে কুস্থানে রাত্রি কাটায়। উমাকিঙ্করবাবুর মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এর বিয়েতেই গরদের কাপড় দিয়ে উমাকিঙ্করবাবু সুধা ঘটকীকে বিদায় করেছিলেন। নাঃ, চন্দ্রনাথ কোনো বাঁকা পথে যাবেন না। এণ্টালির মোড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মেয়েটা কেমন অসহায়-ভাবে তাকিয়েছিল। তবে পয়সা খরচ করে চায়ের দোকান থেকে এবং সেলুন থেকে তিনিও পাত্রের খবর নেবেন। দরকার হয়, সুধা যা দেয় তার থেকে দুটো পয়সা বেশী দেবেন।

নিতাই-এর সঙ্গে আবার দেখা হয়। নিতাই বলে, 'আমার কী হলো?'

'বলেছি তো ফেলো কড়ি মাখো তেল। ঘটক বিদায়ের ব্যাপারটা ঠিক করে নে।'

নিতাই দাঁত বার করে হাসে। বলে, 'বেড়ে আছো তোমরা। বিড়ি বাঁধা ছেড়ে ভাবছি এই লাইনেই লেগে যাবো।'

নিতাইটার মনে তখন থেকেই দুষ্টুবুদ্ধি উঁকি দিচ্ছিল তা চন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি। চন্দ্রনাথ বললেন, 'একটা সদ্গোপ মেয়ে দিতে পারিস? হাতে একটা পাত্র রয়েছে—বি এ পাস।'

'সুধার কাছেই তো সদ্গোপ মেয়ে রয়েছে—ছেলে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেল সুধা।'

'না সুধার সঙ্গে কোনো কাজকারবার নেই—কাকে কখনও কাকের মাংস খায়?'

'অবুঝের মতো কথা বলছো কেন দাদা? এ-পাত্র হাতছাড়া করে তোমার তো কোনো লাভ হবে না। বরং সুধা তোমাকে অন্য

একটা পাত্র দিয়ে ধার সুধে দেবে।' মন্দ কথা বলেনি নিতাই—ঘাড় নেড়ে নেড়ে বিড়ি পাকালে কি হয়, ছোকরার বুদ্ধি আছে।

নিতাই নিজেই সুধাকে নিয়ে চন্দ্রনাথের বাড়িতে এসে ছিল। সেদিনের দৃশ্যটা চন্দ্রনাথের স্পষ্ট মনে আছে। সবেমাত্র ভাতের জলটা উনুনে চাপিয়ে, চন্দ্রনাথ নিজের বিছানাটা ঠিকঠাক করছিলেন। সেই সময় ওরা এসে হাজির। সুধাকে সেই প্রথম চাদর না জড়ানো অবস্থায় দেখলেন চন্দ্রনাথ। একটা রঙীন শাড়ি পরেছিল সে। হাতে এবং গলায় সোনার গয়নাও ছিল—নিতাই মিথ্যে বলেনি, সুধা তাহলে সত্যিই আজকাল গয়না গড়াচ্ছে।

শশব্যস্ত চন্দ্রনাথ নিতাইকে বকতে লাগলেন। 'আমাকে বললেই পারতে, আমি গিয়ে দেখা করতাম। ওঁকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া। একটু যে ভাল করে বসতে দেবো সে জায়গাও নেই।' সত্যি লজ্জা লাগছে চন্দ্রনাথের, ঘরের যা অবস্থা হয়ে আছে।

সুধা সেই প্রথম কথা বললে। 'আমাদের বাড়িতেও সেই এক অবস্থা—টিনের ঘরে জল পড়ছে। নিতাইবাবু রাজী হচ্ছিলেন না, আমিই জোর করে এলাম। সদ্গোপ ছেলেটির খবর পেলে বড় উপকার হয়—মেয়ের বাবা খুব ভাল পার্টি। বরং শুভকাজ হলে···'দ্বিধাগ্রস্ত সুধা এবার নিতাই-এর মুখের দিকে তাকালে। নিতাই বললে, 'দিদি বলছিল, বরং ঘটক বিদায় যা পাওয়া যাবে, সেটা তুমিই নিও।'

লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে যেন চন্দ্রনাথের। নিতাই বোধ হয় সুধাকে সব লাগিয়েছে। সুধা বললে, 'তাতে কী হয়েছে? এতে কোনো অন্যায় নেই—অথচ একজনের কন্যাদায় উদ্ধার হয়।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনি ঠিকানা নিন! আমার কিছু দরকার নেই।' হাঁড়ি নামিয়ে চন্দ্রনাথ চায়ের জল চাপিয়ে

দিলেন। সুধার কোন বারণ শুনলেন না। 'তা কখনো হয়। হাজার হোক এসে পড়েছেন।'

নিতাইকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিস্কুট আনতে দিলেন চন্দ্রনাথ। সুধাও যেন লজ্জা পেয়ে গিয়েছে। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা কেমন আছেন?'

'সময় ঘনিয়ে এসেছে—চেষ্টার তো কোনো ত্রুটি করলাম না,' সুধা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে।

হাতের গোড়ায় সাঁড়াশি খুঁজে পাওয়া গেল না। জামার খুঁট দিয়েই ফুটন্ত জলটা চন্দ্রনাথ কেটলিতে ঢেলে ফেললেন। সুধা একবার বলেছিল, 'আমি করে দেবো?'

'না না, তা কখনও হয়। আমার বাড়িতে আপনি অতিথি।'

'আপনি নিজেই রাঁধেন বুঝি?'

'এক বেলা রান্না করি; আর এক বেলা হিন্দুস্থানীর দোকান থেকে রুটি আলুরদম আনিয়ে নিই।' চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যা দিনকাল পড়েছে। রাধু মিত্তিরের মেয়ের জন্যে সম্বন্ধ দেখছিলুম, ক' জায়গায় কুষ্টি দিয়েও এসেছি। ওমা, আজ শুনলাম জানাশোনা কাউকে বিয়ে করছে। সবাই যদি এমন করে, তাহলে চলে কি করে আমাদের?'

সুধার কিন্তু ভয় নেই। সরল বিশ্বাসে সে বললে, 'যতদিন চন্দ্র সূয্যি উঠছে ততদিন ঘটকালী করেই বিয়ে হবে।'

চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের জন্ম-কালটা মেরে কেটে চলে যাবে; তারপর এ ব্যবসা আর থাকবে না।'

ছেলের ব্যবসার কথা; শুভবিবাহ প্রাইভেট লিমিটেডের নতুন বাড়ির কথা ভেবে এখন চন্দ্রনাথের হাসি আসছে। সুধা ঠিকই বলেছিল, তিনিই অযথা ভয় পেয়েছিলেন।

চা খাবার পর সুধা সেদিন ফিসফিস করে নিতাইকে কি যেন বলেছিল। নিতাই বললে, 'তা দিদি বলছে, তুমি এই

পাত্রের বদলে অন্য একটা পাত্র নাও।' চন্দ্রনাথ কিছুতেই রাজী হননি।

নিতাই-এর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। নিতাই বিড়ি মুড়তে মুড়তে বলেছে, 'তা হলে, পাত্র কবে নেবে ?'

'কেন পাত্র না শোধ করে দেওয়া পর্যন্ত তোর ঘুম হচ্ছে না?'

আমি বিড়ির কারিগর, আমাকে এই ঘটকালীর ব্যাপারে টানছো কেন ? আমি যখন এ-লাইনে নামবো, তখন তোমাদের দুজনকেই প্যাঁচে ফেলে দেবো। সুধা আমাকে জ্বালাতন করে খাচ্ছে।'

চন্দ্রনাথ কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, 'যদি কিছু বলবার থাকে সোজাসুজি বলতে বোলো আমাকে।'

আর একদিন চন্দ্রনাথ চিঠি লিখতে বসেছিলেন : 'মহাশয়, লোকমুখে অবগত হইলাম আপনার একটি বিবাহযোগ্য পুত্র আছে। আমি বর্তমানে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, আলিম্মন গোত্রীর পাত্রীয়া বিবাহসম্বন্ধের চেষ্টা করিতেছি।'···

'এই যে এসে গেলাম।' নিতাই-এর গলার স্বর। সঙ্গে মিষ্টির হাঁড়ি। 'দিদিমণি পাঠালে। তোমার সেই পাত্রের বিয়ে হয়ে গেল কাল।'

'এতো মিষ্টি নিয়ে আমি কী করবো ? খাবে কে ? ফেরত নিয়ে যা।'

'আমাকে ওসব বলে লাভ কী ? আমি বিড়ি বাঁধার কাজ ফেলে রেখে দিদির হুকুম তামিল করতে এসেছি।'

অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁড়িটা খুলে, চন্দ্রনাথ বললেন, 'এতো মিষ্টি এখন খাবে কে, বল তো ?'

'সেটা তো আমার দোষ নয়। ইচ্ছে করলেই ঘরসংসার পেতে অনেক খাবার লোক করে ফেলতে পারতে।' মৃদু হেসে চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সব জেনেশুনে মনে দাগা দিস কেন

ভাই? খাওয়াতে পারবার মতো সামর্থ্য ঘটকের কোথায় আছে?'

নিতাই নরম হলো না। ওর মাথায় ঢুকে গিয়েছে' বিড়ি বাঁধা থেকে ঘটকগিরিতে লাভ বেশী। রসগোল্লা খেতে খেতে সে বললে, 'একটা বিয়ে লাগালে কত পাওয়া যায়? আচ্ছা দুপক্ষের কাছ থেকে ঘটক ফি নেওয়া যায়?'

'যে পক্ষ তোমাকে লাগাবে তারাই দেবে।'

'যদি কোনো পক্ষই আমাকে না লাগায়; আমি যদি নিজে থেকেই লাগি?'

'তা আবার হয় নাকি? কি বোকার মতো কথা বলছিস?' চন্দ্রনাথ নিতাইকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন।

কিন্তু নিতাই যে মোটেই বোকা নয়, চন্দ্রনাথ আজ জোর করে বলতে পারেন। কয়েক দিন পরে নিতাই আবার এসেছিল। 'দাদা, আরও কিছু খোঁজ খবর দাও। যদি কেউ ঘটককে ফাঁকি দিতে চায়?'

'কেউ কেউ চেষ্টা করে বৈকি! ঘটক ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেষ্টা করে। তাই হাতের সুতো সবটা ছাড়তে নেই, বেগড়বাঁই করলেই ভাঙচি লাগাও।' চন্দ্রনাথ বলেছিলেন।

'বিয়ে হয়ে গেলে বলছো, আর কোনো উপায় নেই', নিতাই জিজ্ঞেস করে।

'সুধার বাবা তো কাকে একবার উকিলের চিঠি দিয়েছিল শুনেছি। চিঠি পেয়েই সুড়সুড় করে ঘটকবিদায় করে গেল।'

'আচ্ছা তাহলে ইচ্ছে করলেই কেস করে দেওয়া যায়?'

চন্দ্রনাথ ভাবছিলেন, নিতাই হয়তো সত্যিই এ-লাইনে ঢোকবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। চন্দ্রনাথ তাই বলেও ফেলেছিলেন, 'তুই আমার আণ্ডারে কাজ কর। বিয়ের খবরাখবর নিয়ে আয়, কিছু পয়সা পাইয়ে দেবো।'

'না দাদা, কারও আণ্ডারে কাজ করবো না আমি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, ঘটকালী করবো।'

'ঘরামি আগে নিজের ফুটোঘর সার!' চন্দ্রনাথ রসিকতা করেছিলেন।

'আমি কেন; আমার থেকে অনেক বড় বড় ঘটক আর ঘটকীর ঘর ফুটো হয়ে রয়েছে! সেখানেই হাত পাকাবো।'

সত্যিই চাঁছুঘটক আর সুধা ঘটকীর বিয়ের ঘটকালী করেছিল নিতাই। চন্দ্রনাথকে বুঝিয়েছিল, 'এতে তোমাদের তুজনেরই লাভ হবে দাদা। পাত্রীর কোনো কিছু জানতে তো বাকি নেই তোমার। আর তোমাদের চার হাত এক হলে, কম্পিটিশন থাকবে না। নিজের খুশী মতো তু'জনে কাজ বাড়িয়ে যেতে পারবে। সুধার বুদ্ধি আর তোমার বুদ্ধিতে মিশে কি কাণ্ড হয়ে যাবে!'

পাকা কাজ করেছিল নিতাই। সুধার বাবাকে আগেই বুঝিয়ে এসেছিল, এতে মেয়ের মঙ্গল হবে। 'আর মেয়ে, তাকে তো তুমি নিজেই জয় করে ফেলেছো দাদা। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।'

বিয়ের রাত্রে নিতাই খুব হৈ-চৈ করেছিল। 'হাম নাহি ছোড়েগা। ঘটক বিদায় ভাল না হলে, আমি রসাতল করবো', নিতাই বলেছিল।

ঘটক বিদায় দিতে হয়েছিল, কারণ ঘোমটার আড়াল থেকে সুধা ফিসফিস করে চন্দ্রনাথকে বলেছিল, 'ঘটকরা ওই রকমই হয়—ঝগড়া না করে, ঘটক বিদায় করো।'

ঘরের আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠলো। কথা শেষ করে নরোত্তম ফিরে এসেছে। 'বাবা, আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?' নরোত্তম বাবাকে ডাকছে।

'নারে ঘুমোইনি। ঘুম আসছে না।'

'আচ্ছা বাবা, শুভবিবাহ নামটা মা দিয়েছিলেন, তাই না?' নরোত্তম প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁরে, লেখাপড়া তেমন না জানলেও তিনি গল্প-কবিতা-টবিতা পড়তে খুব ভালবাসতেন।'

শুভবিবাহ প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নরোত্তম ঘটক আর কোনো কথা বললে না। আলোটা আবার নিভিয়ে দিলে। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে নরোত্তমের একটুও বুঝতে অসুবিধে হলো না, বাবা এখন মায়ের কথা ভাবছেন। মা বেঁচে থাকলে বাবার আজ সুখের সীমা থাকতো না।

নৈতিক

যেন শেয়ালদা স্টেশনের ফুটপাথে কোলে-বাজারের বাসি শুকনো বেগুন। হরকিঙ্কর ভটচায্যির চেহারাটা দেখলে সপ্তাহ খানেকের শুকনো বেগুনের কথাই মনে পড়ে। বাইরের চামড়াটা কুঁকড়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে ভেতরের মাংসও যেন রোদে শুকিয়ে ছোবড়া হয়ে রয়েছে। সরু লম্বা নাকটা যেন একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন! রঙটা এককালে বেশ ফর্সা ছিল দেখলেই বোঝা যায়—এখনও খানিকটা আছে। চোখ দুটোও বেশ বড় বড় কিন্তু এখন ঝিমিয়ে পড়েছে—যেন একশো পাওয়ারের লাইট থেকে পঁচিশ পাওয়ারের আলো বেরোচ্ছে।

খালি গায়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে হরকিঙ্কর নিজের পৈতেটা দুহাতে ধরে পিট চুলকোচ্ছিলেন। এমন সময় ডাকপিওনকে দেখে বললেন, 'হরকিঙ্কর ভটচায্যির নামে কিছু আছে নাকি?'

পিয়ন বললে, 'কোনো চিঠি নেই।'

'হরকিঙ্কর দেবশর্মাও লেখা থাকতে পারে।'

'চিঠি থাকলে কেন দেব না বলুন?'

'ওইরকম তো তোমরা বল বাপু; অথচ লোকের চিঠি তো হারাচ্ছেও। সেবার আমার যজমানের চিঠি তোমরাই তো দেরি করে দিলে। চিঠি যখন এসে পৌঁছল তখন রমেশ ঘোষালের শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে যে ব্রাহ্মণের কি ক্ষতি হয়, তা তোমরা বুঝবে কী করে?'

পিওন বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমাদের বিশ্বাস না হয়, পি-এম-জি কে কমপ্লেন করুন।'

কথা আরও বাড়তো। কিন্তু দূর থেকে হরকিঙ্করের মেয়ে সুব্রতাকে দেখা গেল। সুব্রতা সকালে সরকারী দুধের দোকানে কাজ করে। সেখান থেকেই ফিরছিল। পিওনকে

সেই সরিয়ে দিল। তারপর বাবাকে বললে, 'আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন।'

হরকিঙ্কর গভীর হতাশার সঙ্গে বললেন, 'শুধু শুধু কি আর ব্যস্ত হচ্ছি মা। নাকতলার সুদর্শন রায় কি সত্যিই এবার দুর্গা পুজো করবে না? কিন্তু কী করে তা হয়? সুদর্শনদের পুজো কি আজকের? আমার ঠাকুর্দা ওদের বাড়িতে মায়ের অর্চনা করেছেন, আমার বাবা করেছেন, আমিও করে আসছি এই এত বছর। পাকিস্তান হবার পরও তো ওদের কাজ বন্ধ হয়নি। মাকে ওরা যশোর থেকে সোজা নাকতলায় এনেছে! ঈশ্বরের আশীর্বাদে সর্বস্ব যায়নি ওদের। এখানেও তো ক'বছর পুজো করলাম আমি। এবারই বা পুজো হবে না কেন? নিশ্চয় চিঠি হারিয়েছে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'স্বীকার করলাম, প্রথম চিঠিটা না হয় গোলমাল হয়েছে। কিন্তু আমি যে জোড়া পোস্টকার্ড ছাড়লাম, তার উত্তর?'

সুব্রতার মুখটা এবার সত্যিই মলিন হয়ে উঠলো। 'কেন বাবা, সে-উত্তর তো কালই এসে গিয়েছে।'

'কালই এসেছে? আর আমি পিওনের সঙ্গে ঝগড়া করে মরছি'—হরকিঙ্কর রেগে উঠলেন।

'আপনি তখন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন,' সুব্রতা উত্তর দিলে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হরকিঙ্কর গুম হয়ে বসে রইলেন। সুদর্শন রায়রা এবার থেকে পুজো বন্ধ করে দিলেন। ছেলেরা পুজোটাকে বাজে খরচ মনে করছে। হরকিঙ্কর মুখ বিকৃত করে বললেন, 'সনাতন ধর্মের কিছুই আর থাকবে না।'

সুব্রতা বললে, 'বাবা, চা খাবেন তো? জল চাপাই?'

হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'ভালই হয়েছে—

আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ওদের বড় ছেলেটা কোথাকার এক বস্তির মেয়ে বিয়ে করেছে। বাউনের ঘরে যত অনাসৃষ্টি। সে-বাড়িতে পুজো করে নিজের অমঙ্গল ডেকে না আনাই ভাল।'

সুব্রতা চা নিয়ে এল। হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন. 'ওদের কর্তা কিন্তু জানতো কেমন করে দেব-দ্বিজের সেবা করতে হয়। ওদের দেওয়া গামছাগুলোর সাইজ দেখেছিস। অন্য লোকেরা আজকাল যে গামছা দেয়, তা দিয়ে রুমালের কাজও হয় না। নামই হয়ে গিয়েছে —পুজোর গামছা!'

মেয়ে বললে, 'বাবা চা খান।'

বাবা বললেন, 'এ-যুগে আর পুরোহিতের কাজ চলবে বলে মনে হয় না। লোকে ভাবে আমরা একটা নুইসেন্স। আমরা কিছু না করেই পয়সা আদায় করি, ভিখিরীর ভদ্র-সংস্করণ।'

মেয়ে বললে, 'বাবা, নবারুণ স্পোর্টিং খুব জাঁকিয়ে পুজো করছে এবার। ওদের সেক্রেটারি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। আজও বলছিলেন আপনার কথা।'

'কী বললি?' হরকিঙ্কর এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন যেন কেউ ভারি বুটজুতোসমেত পা তাঁর পায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। 'বারওয়ারি পুজো করতে হবে আমাকে এই বয়সে? কোনদিন হয়তো কেউ বলবে···'পরের কথাগুলো হরকিঙ্কর মেয়ের সামনে উচ্চারণ করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, 'হয়তো কোনদিন আমাকে বেশ্যাবাড়িতে শীতলা পুজো করে আসবার কথাও বলবে।'

মেয়ে বললে 'সেক্রেটারি বলছিলেন, নবারুণ স্পোর্টিং-এর পুজো করবার জন্যে পুরুতদের মধ্যে কাড়াকাড়ি।'

'ভাগাড়ের মড়ার জন্যেও কাড়াকাড়ি হয়। বারওয়ারি পুজোর পত্তন করেই সনাতন ধর্ম উচ্ছন্নে যেতে বসেছে।

ও-সব জায়গায় পুরুত না এলেও কেউ খোঁজ করে না; একটা পুরুতই তিনটে বারোয়ারি পুজো সারে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'মা মহামায়ার পুজো বলে কথা। তাঁকে তুষ্ট করে রামচন্দ্র রাবণ বধ করলেন। দেবী দশভুজা মহিষাসুর নিধন করে দেবগণকে স্বর্গে পুনপ্রতিষ্ঠা করলেন। পুজোর ত্রুটি হলে তাঁর রোষ থেকে কে আমাকে রক্ষে করবে?'

মেয়ে আর প্রতিবাদ করবার সাহস পেলে না। হরকিঙ্কর বললেন, 'একবার মোড়ের বাসনের দোকানে যাবো। যদি কয়েকটা দানের সামগ্রী বিক্রি করতে পারি। বেটা দিনদুপুরে চৌরাস্তার মোড়ে বসে গলা কাটে। অমন সুন্দর পিতলের চাদরের ঘড়া, ছাঁকা কাঁসার থালা বলে কিনা আড়াই টাকার বেশী দেবে না। কিছুদিন ধরে রাখলে দাম উঠতো। কিন্তু সে সামর্থ্য কোথায়?'

সুব্রতা বললে, 'দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করবেন না বাবা। জানেনই তো ওরা চোর।'

হরকিঙ্কর ভাবলেন, 'সবই ভাগ্য। মায়ের ইচ্ছা—না হলে সনাতন ধর্মের এমন সর্বনাশ হবে কেন? কেন আমাদের নিজের দেশঘর ছেড়ে এই বিদেশের বস্তিতে এসে উঠতে হবে?'

হরকিঙ্কর বাইরে যাবার জন্যে উঠে পড়েছেন। ঠিক সেই সময়ই বাইরে আওয়াজ শোনা গেল, 'সুব্রতা ভট্টাচার্যের বাড়ি কোনটা?'

সুব্রতা দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। 'আরে শুভ্রাদি! আপনি? এখানে?'

'কেন আসতে নেই?' শুভ্রাদি হেসে বললেন।

শুভ্রাদিকে বাবার কাছে নিয়ে এসে সুব্রতা পরিচয় করিয়ে দিলে, 'বাবা, মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপিকা শুভ্রা রায়। ইনিই আমাকে কলেজে ফ্রীশিপ পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'ও।' নমস্কার করলেন হরকিঙ্কর। মেয়ে ততক্ষণ অতিথির দিকে একটা আসন এগিয়ে দিয়েছে। শুভ্রাদির বয়স বেশী নয়। খোঁজ করলে ওই বয়সের মেয়ে কলেজেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া শুভ্রাদির মুখে এমন একটা লাবণ্য আছে যে মনে হয় আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। ওঁর মুখের সঙ্গে হরকিঙ্কর নিজের মেয়ের মুখটাও মিলিয়ে নিলেন। অভাবে অযত্নে থাকলেও তাঁর মেয়ের রঙটা অনেক ফর্সা, দৈর্ঘ্যেও কয়েক ইঞ্চি বেশী হবে। এত অনটনের মধ্যেও বাড়ন্ত গড়ন—দেখে কে বলবে এখনও সতেরো পুরো হয়নি।

বেশ বিব্রত হয়েই হরকিঙ্কর সুবেশা শুভ্রাদিকে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, একটু বসতে দেবার জায়গাও নেই।'

'কী ব্যাপার, শুভ্রাদি?'

'ব্যাপারটা তোমার বাবার সঙ্গে। আমি তোমাদের কাছাকাছি থাকি, তাই প্রিন্সিপ্যাল বললেন তুমি নিজেই দেখা করে এস।'

'কেন বলুন তো?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

'কলেজে এবার আমরা দুর্গাপুজো করবো ঠিক করেছি'—শুভ্রাদি জানালেন।

'কলেজে দুর্গাপুজো, তাও কিনা মেয়ে কলেজে!' হরকিঙ্কর তাঁর বিস্ময় চেপে রাখবার কোনো চেষ্টা করলেন না।

শুভ্রা রায় স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। সুব্রতা লক্ষ্য করছিল, কি সুন্দর ব্যবহার শুভ্রাদির। শুনেছে খুব বড়লোকের মেয়ে, অথচ কেমনভাবে কথা বলেন। শুভ্রাদি বললেন, 'অনেকেই কথাটা শুনে অবাক হচ্ছেন। পরিকল্পনাটা আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সুভদ্রা হালদারের। ওঁর ধারণা, দেশের যা অবস্থা তাতে মেয়েদের শক্তিপুজোর দরকার হয়ে পড়েছে।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'আচ্ছা!'

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদের মধ্যে যারা একটু তথাকথিত

মডার্ন তারা খুব আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে মেয়েরা পুজো-মাইণ্ডেড হোক—তারা পুজোর কাজকর্ম শিখুক। শেলি বায়রণ কীটস পড়ে দেশের কোনো মঙ্গলই হবে না।'

হরকিঙ্কর জানতে চাইলেন, 'আগে কখনও এমন পুজো হয়েছে?'

শুভ্রাদি জানালেন, 'সুভদ্রা হালদার বলেছেন, আগে কী হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। জিনিসটা যখন ভাল, তখন করতে বাধা কোথায়? মহিষমর্দিনী পুরুষমানুষ ছিলেন না। সুতরাং মেয়েরা ইচ্ছে করলেই নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পারে।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'পুজোর তো আর দেরি নেই।'

শুভ্রাদি বললেন, 'ঠিক বলেছেন, মোটেই সময় নেই। অনেকে ভয় পাচ্ছিল, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সব হয়ে উঠবে না। কিন্তু মিসেস হালদার বললেন, চব্বিশঘণ্টার নোটিশে তাঁর নিজেরই বিয়ে হয়েছিল!'

সুব্রতা যা ভয় পাচ্ছিল এবার তাই হলো। হরকিঙ্কর দ্বিধা না করে শুভ্রাদির মুখের উপরই বললেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু বারোয়ারি পুজোকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। হাজারজন যেখানে মাতব্বর—পুজোর নাম করে যেখানে কেবল নাচগান হাসিঠাট্টা আর বেলেল্লাপনা হয়—না খেয়ে মারা গেলেও আমি সেখানে পুজো করবো না।'

সুব্রতা বাবাকে বুঝিয়ে শান্ত করবে ভেবেছিল। কিন্তু তাঁর চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে সাহস করলে না।

শুভ্রাদি কিন্তু মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, 'মিসেস হালদার আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। উনিও চান শুদ্ধ পুজো—যেখানে ধর্মীয়ভাবটা বজায় থাকবে। মাইক, আলোকসজ্জা,

প্যাণ্ডাল, প্রসেশন এসব আমরা কিছুই করবো না। আমাদের প্রতিমাও হচ্ছে শাস্ত্রসম্মত।

'ফিল্ম অ্যাকট্রেসের মুখের আদলওয়ালা আলট্রামর্ডান ফিগার চাইছেন না আপনারা?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

চিত্রতারকার কথা উঠতেই সুব্রতা কেমন চমকে উঠেছিল। কিন্তু এঁদের দু'জনের কেউই তা লক্ষ্য করলেন না।

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদের প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে, সনাতন আদর্শে পুজো হোক—তবেই তো মেয়েদের মঙ্গল হবে। আমরা সব কিছুর দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছি। মেয়েরাই সব কিছু করছি। আমাদের সকলের অনুরোধ পুজোটা আপনি করুন। মিসেস হালদার আপনার কথা শুনেছেন কোথাও। আপনি যদি ওঁর সঙ্গে একবার সময় মতো দেখা করেন।'

হরকিঙ্কর নিজের মনকে বোঝালেন, কলেজের মেয়েদের পুজোকে বারোয়ারি পুজো বলা চলে না। শুভ্রাদিকে বললেন, 'আপনি আমার মেয়েটাকে সাহায্য করছেন অনেক, কী করে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তিনপুরুষ ধরে আমরা রায়দের বাড়িতেই পুজো করে এসেছি। আর কোথাও কখনও বোধন করিনি। এবার করে দেখি, মা কি বলেন। আমি আজই কলেজে যাবোখন।'

হরকিঙ্কর শুভ্রাদিকে বসিয়ে এবার উঠে পড়লেন, বাসন-ওয়ালার সঙ্গে এখনই দেখা করা প্রয়োজন। বেরোবার আগে মেয়েকে বললেন, 'দিদিমণি তোমার বাড়িতে এসেছেন একটু চা অন্ততঃ করে দাও।'

শুভ্রাদি এবার হতশ্রী ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। 'ছাদটা ফেটে রয়েছে দেখছি। জল পড়ে?'

'জলে ভেসে যায়।' সুব্রতা উত্তর দিলে।

'কলেজ যাও না কেন?'

'অনেক দিন যাচ্ছি না। কাউকে যেন বলবেন না শুভ্রাদি। তাহলে সকালে দুধের চাকরিটাও যাবে। স্টুডেন্ট ছাড়া গভর্নমেন্ট কাউকে রাখে না।'

ঘরের অবস্থা এবং সুব্রতার মুখ চোখ দেখে শুভ্রাদি যেন সব বুঝতে পারছেন।

লজ্জা পেয়েছে সুব্রতা। বললে, "বাবার কথায় রাগ করবেন না, শুভ্রাদি। শাস্ত্রীয় ব্যাপারে ওঁকে একগুঁয়ে বলতে পাবেন। ওখানে কোনোরকম শৈথিল্য সহ্য করতে পারেন না। তাই কষ্টও পাচ্ছেন।"

'কেন ?'

'অনাচার হলে যজমানের মুখের উপর যা-তা বলেন। তাতে যজমান সন্তুষ্ট থাকবে কেন ? পাড়ায় কিছু পুরুতের অভাব নেই। তাছাড়া আমরা বাইরের লোক, পাকিস্তানে ভিটেমাটি হারিয়ে ভাসতে ভাসতে এখানে হাজির হয়েছি। স্থানীয় যজমানরা নিজেদের লোক ছেড়ে কেনই বা বাবাকে ডাকবে ?'

শুভ্রাদি চুপ করে ওর কথা শুনে যেতে লাগলেন—'বাবাকে বলি, আপনি তো লেখাপড়া জানতেন, কেন এই বাজে লাইনে এলেন। বাবা বলেন, ওঁদের পরিবারের অন্ততঃ একটি ছেলেকে এই লাইনে আসতে হবে এই নিয়ম ছিল। তাছাড়া ওঁদের যৌবনকালে পুরোহিতের সম্মানও ছিল।'

'তোমার কে কে আছেন ?' শুভ্রাদি প্রশ্ন করলেন।

'এক দাদা, বাইরে চাকরি করেন। মা নেই। এখন আমিই সংসার দেখছি।'

'তুমি কলেজ বন্ধ করলে কেন ? বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে বুঝি ?'

সুব্রতা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু হাসলো।

'আচ্ছা এবার আসি। পুজোর ক'দিন কলেজে যেও', বলে শুভ্রাদি বিদায় নিলেন।

সুব্রতার হাসি থেকে শুভ্রাদি কি বুঝলেন কে জানে। সুব্রতা কিন্তু গুম হয়ে বসে থাকলো। বিয়ে! বিয়েই বটে! ধানবাদে চাকুরে দাদা! তাই বটে। গতমাস থেকে টাকা আসছে না। দাদা নাকি ওখানে কি একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে, রেল কলোনির কোন একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে, ধন্য পুরুষ জাত। কি দায়িত্ববোধ! একশ তিরিশ টাকা মাইনের রেলবাবুর আবার প্রেম! .

বাবা যতই গলা ফাটিয়ে ধর্মের জয়গান করুন, টাকা—টাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা। বেঁচে থাকতে গেলে টাকা চাই-ই।

ড্যাল্টন কোম্পানি এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ড্রামা সেক্রেটারি মিস্টার চ্যাটার্জি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। তিনিই সেবারে বলেছিলেন—'আপনার গলার স্বরটা খুব সুইট।'

বিরক্ত কণ্ঠে সুব্রতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক মোটেই বিব্রত না হয়ে বলেছিলেন, 'অভিনয়ের লাইনে এলে উন্নতি করতে পারতেন। আজকাল পাড়ায় পাড়ায়, অফিসে অফিসে খুব চাহিদা। আমরা হঠাৎ বিপদে পড়ে গিয়েছি। আমাদের পার্ট করছিল কমলিনী। বেচারার টাইফয়েড হয়েছে অথচ অভিনয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে, স্টেজের জন্যে বুকিংও করা রয়েছে। এখন পেছোবার উপায় নেই। আসুন না। টাকা পাবেন। মেডেলও পেতে পারেন। একবার নাম হলে তখন দেখবেন বাড়িতে লোক এসে সাধাসাধি করছে।'

সুব্রতা রাজী হয়ে গিয়েছে। লুকিয়ে কয়েকদিন রিহার্সাল দিয়ে এসেছে। তারপর অভিনয়ও। মেডেল পায়নি, কিন্তু টাকা পেয়েছে ষাটটা। কাজে লেগে গিয়েছে টাকাগুলো। সুব্রতা প্রশ্ন করেছিল, 'আপনাদের অফিসে একটা চাকরি পাওয়া যায় না?'

'মেমসাহেব ছাড়া এরা রাখে না। তাছাড়া, কোন দুঃখে আপনি চাকরি করতে যাবেন? এ-লাইনে চাকরির দশগুণ রোজগার করবেন। আর যদি একবার কোনো সিনেমা প্রোডিউসারের নজরে পড়ে যান, তাহলে তো কথাই নেই!'

কথাটা মন্দ বলেননি ভদ্রলোক। একবার নজরে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। মিস্টার চ্যাটার্জির এক বন্ধু স্টুডিওর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ক্যামেরামান। তার সঙ্গে দেখাও করেছে সুব্রতা।

সে বলেছে, ফিচার খুব শার্প, ক্যামেরায় খুব ভাল আসবে। নায়িকা হবার সমস্ত গুণই রয়েছে আপনার। এ-লাইনে কোনো চাঁইকে ধরবার চেষ্টা করুন। ওই প্রথমবারই যা একটু ধরা-করা প্রয়োজন। তারপর যদি তেমন লাক ফেবার করে, সেই একই লোক আবার বাড়িতে গিয়ে সুটিং ডেটের জন্যে কান্নাকাটি করবে।

লোকে হয়তো যা-তা বলতে চাইবে। কিন্তু কিছুই তোয়াক্কা করে না সুব্রতা। নিজের ভবিষ্যতের জন্যে তার যা খুশি সে করবে। টাকা যখন কেউ দেবে না, তখন কারুর কথাতেই সে কান দেবে না। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা নিতান্তই ভাল মানুষ, একমাত্র বাবাকে নিয়েই চিন্তা। এত শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য নিয়েও অন্নের সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না। বাবা না বুঝেই বাধা দেবেন। ওঁকে এখন কিছু না-বলাই ভাল। তবে যখন সুব্রতার অনেক টাকা হবে, সে তখন বাবাকে একটা খুব সুন্দর মন্দির করে দেবে। সেখানে নিজের মনে নিজের ঠাকুরকে পুজো করবেন। যজমানদের দরজায় দরজায় তখন তাঁকে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না।

ভেবেছিল, শুভ্রাদিকে সে সব বলবে। কিন্তু বলা হয়নি কিছুই। বোধ হয় ভালই হয়েছে। এখন নয়। যখন সুব্রতা ভট্টাচার্য দেশজোড়া সুনাম পাবে, সবার মুখে মুখে যখন তার নাম ফিরবে, তখন সব প্রকাশ করবে। কাগজের প্রতিনিধিরা

যখন তার জীবনী লিখতে আসবে, সুব্রতা তখন শুভ্রাদির মহৎ হৃদয়ের কথাও বলবে। তাঁর জন্যেই যে বিনা মাইনেতে কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল সে কথা গোপন করবে না।

তাকের উপর টাইমপীসটার দিকে এবার নজর পড়ে গেল। বসে বসে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। এখনই একবার বেরনো প্রয়োজন।

আর তো ভাবা চলবে না। এখনই সুযোগের সন্ধানে বেরোতে হবে।

বালিকা মহাবিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে পুজোর আয়োজন চলেছে।

হরকিঙ্কর গায়ের চাদরটা ঠিক করে নিয়ে বললেন, 'শাস্ত্র মতো সব জোগাড় যন্তর না করলে, শুধু আপনাদের নয় আমারও অমঙ্গল। দুর্গা পুজো বলে কথা। অনেক জিনিস লাগে—সিঁদুর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি, দর্পণ, তেকাটা, তীর, পুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, কলাগাছ, কচুগাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তী গাছ, ডালিম ডাল, অশোক ডাল…'

তালিকা আরও দীর্ঘ হতো, কিন্তু শুভ্রা বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না. আমরা সব গুছিয়ে যোগাড় করে রাখবো। আপনি শুধু পুরো ফর্দটা আমাকে দিয়ে যান।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'তুমি মা বোধহয় কখনও পুজোর জোগাড় করনি।'

শুভ্রা সলজ্জ ভাবে বললেন, 'শুনেছি এক সময় নাকি আমাদের বাড়িতে পুজো হতো। কিন্তু তখন আমি খুব ছোট। এবার কিন্তু আপনার কাছে সব শিখে নেবো।'

হরকিঙ্কর অনেকদিন এমন মধুর ব্যবহার পাননি। অন্তত:

পাঁচভূতের রাজত্বে এমন নিষ্ঠাবতীর সন্ধান পাবেন আশাই করেন নি। উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু চিন্তা নেই মা, এবার আমি সব শিখিয়ে দেবো। আমাদের মায়েদের জন্যেই তো সনাতন ধর্ম আজও কোনোরকমে টিকে আছে। লেখাপড়া জানা মায়েরা যদি আবার আগ্রহ নিয়ে সব শিখতে আরম্ভ করে, তবে আমাদের কিসের ভয় ?'

শুভ্রা নম্রভাবে বললেন, 'নিজের দেশের, নিজের ধর্মের নিয়মকানুন জানবো না, এটা তো গর্বের কথা নয়। এর মধ্যেই তো আমাদের দেশের, সভ্যতার এবং সমাজের যুগ যুগান্তের ইতিহাস নিহিত রয়েছে।'

'কিন্তু সে-কথা কে বোঝে মা ? বারোয়ারি পুজো আমি করি না; লোকে বলে গোঁড়া পুরুত; কেউ কেউ পাগলও বলে। কিন্তু মা ওখানে পুজোর প-ও থাকে না। কেউ জিজ্ঞেস করে না পুজোর সব উপকরণ ফর্দ অনুযায়ী এলো কিনা। যদি কোনো কিছু না থাকে, বলবে যা এসেছে তাই দিয়ে সেরে নাও। কিন্তু মা, সেরে নেবার মালিক কি পুরোহিত ? তার পিতৃপুরুষেরও জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগে এ-সব কাগজে কলমে লেখা হয়ে গিয়েছে।'

শুভ্রা বললেন, 'আমরা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল বলেন, যদি পুজো করতে হয় ভালভাবে করো, না হলে কোরো না।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'ফর্দ আমার মুখস্ত। বলে যাচ্ছি, টপাটপ লিখে নিন। প্রথমে নবপত্রিকার দ্রব্যাদি, নিয়ম হচ্ছে প্রতিপদ থেকে দেওয়া। প্রথম দিন—মাথাঘসা ফুলেল তেল, আতর, চিরুণী, গোলাপজল। দ্বিতীয়াতে মাথা বাঁধবার পটি, তৃতীয়াতে দর্পণ, সিঁদুর, আলতা। চতুর্থীতে মধুপর্ক, কাঁসার বাটি, তিল, চন্দন। পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ এবং অলঙ্কার।'

হরকিঙ্কর একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'বরং পুজোর ফর্দটাই আগে লিখুন—বোধনের দ্রব্যাদি···'

আমন্ত্রণের জিনিস, অধিবাসের ডালার তালিকা শেষ করে হরকিঙ্কর সপ্তমী পুজোর ফর্দ শুরু করলেন—'নারায়ণবরণ, গুরুবরণ, পুরোহিতবরণ, ব্রহ্মবরণ, সদস্যবরণ, হোতৃবরণ, আচার্যবরণ, বরণাঙ্গুরীয়, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা···'

ছাত্রীজীবনে শুভ্রা অত্যন্ত দ্রুত লিখতে পারতেন। কিন্তু পুরুতমশায়ের গতির কাছে তাঁকে হার মানতে হলো।

হরকিঙ্কর হেসে ফেললেন। বললেন, 'দরকার নেই; আমিই লিখে দিচ্ছি মা। অনেকে লিস্টিও নেয় না, দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে সোজা গিয়ে সাপ ব্যাঙ যা পায় তাই কিনে নিয়ে আসে। আগেকার সে-সব দশকর্মা ভাণ্ডারও নেই—বেশীর ভাগই জোচ্চোর। যা-তা জিনিস দিয়ে দেয়।'

শুভ্রা এবার হরকিঙ্করের দিকে কাগজ এগিয়ে দিলেন। ফর্দ লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'যে কোনো ফর্দের প্রথমেই লিখতে হয়—সিদ্ধি; সিদ্ধিদাতা গণেশ তবেই তো সিদ্ধি দেবেন।'

শুভ্রা পণ্ডিতমশায়ের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মহাস্নানের জিনিসগুলো একটু সাবধানে যোগাড় করতে বলবেন মা। দোকানে যা দেয় তা প্রায়ই ভেজাল।'

'শুভ্রা, কাজ কেমন এগোচ্ছে?' সুভদ্রা হালদার প্রশ্ন করলেন।

'খুব ভাল। পুরুতমশাইটি চমৎকার—একটু রাগী বটে, কিন্তু নিষ্ঠাবান।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'নিষ্ঠাবান পুরোহিতের আজকাল খুবই অভাব। অবশ্য দোষ আমাদেরই। আমাদের কাছে আজকাল পুরুতঠাকুরও যা রাঁধুনীঠাকুরও তাই।'

কলেজের সর্বত্র এখন পুজো পুজো ভাব। বেশ হৈ চৈ চলেছে। কাজের বাড়ির চাপে প্রিন্সিপ্যালও তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্যের মুখোসটা খুলে রেখেছেন। সেই সুযোগ নিয়েই টিচারস্-রুমে অর্থনীতির অধ্যাপিকা শিপ্রা মিত্র প্রশ্ন করলেন, 'একথা বলছেন কেন মিসেস হালদার?'

'জানি বলেই বলছি। আমাদেরও তো বলতে গেলে পুরোহিতের বংশ। কিন্তু আয় নেই বলে কেউ আর ও-লাইনে যায়নি। আজকাল যার লেখাপড়া হয় না সেই যাজক হচ্ছে—কিন্তু শিক্ষিত না হলে, সে কী করে শাস্ত্র পাঠ করবে?'

প্রিন্সিপ্যালের কথায় অনেক অধ্যাপিকা সায় দিলেন। মিসেস হালদার বললেন, 'এ-যুগে মুড়ি মিছরির একদর—এইটাই দুঃখ। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে একখানা সুরেন ভট্চায্যির পুরোহিত দর্পণ ছিল। তাতে দেখেছি তিনি দুঃখ করছেন সূপকার ষষ্ঠীপুজা করলে যা পাবে; একজন জ্ঞানী পুরুষও সেই পাবে। এই জন্যেই ভাল লোক ব্যবসা ছেড়ে যাচ্ছে।'

'সূপকার মানে কি, দিদিমণি?' সেচ্ছাসেবিকাদের লিডার ও ছাত্রী ইউনিয়নের সেক্রেটারি রমলা প্রশ্ন করলো।

সুভদ্রাদি বললেন, 'শুভ্রা, আজকাল তোমরা কি যে বাংলা শেখাচ্ছো। আমাদের সময় বাংলার কোশ্চেনও ইংরিজীতে হতো—তবু আমরা অনেক কথা জানতাম। এখন তোমরা শুধু নাটক নভেল পড়াচ্ছ—তাও আধুনিক। তাই ছাত্রীরা সূপকার মানে জানে না।'

দিদিমণির কথায় রমলা লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু সুভদ্রা

হালদার বললেন, 'লজ্জার কিছু নেই। না-জেনে পণ্ডিত সেজে থাকার চেয়ে, বোকার মত প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া অনেক ভাল। সূপকার মানে রাঁধুনী—আজকাল নভেলে যাদের বাবুচি বলে!'

অধ্যাপিকাদের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা হালদার বললেন, 'আপনারা অনেকে হয়তো এইভাবে পুজোর ব্যবস্থা করায় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন—ভাবছেন, আমি সময় এবং অর্থ অপব্যয় করছি। কিন্তু একটা দুর্গাপুজো হাতে কলমে করলে, আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে মেয়েরা যা জ্ঞান লাভ করবে, তা দেড় ডজন টেক্সটবুক থেকেও পাবে না।'

একবার ঢোক গিলে তিনি বললেন, 'কত অদ্ভুত সব জিনিস লাগে, আমি পুরুত-বাড়ির মেয়ে হয়েও খোঁজ রাখতাম না। যদি চোখ কান খুলে রেখে, ওগুলোর মধ্যে একটু ঢোকা যায়, তাহলে আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমাদের জীবন-যাপন সম্বন্ধে আমরা কত কি জানতে পারি।'

সুভদ্রাদি বললেন, 'এই মহাস্নানের কথাই ধরুন না কেন। সপ্তমীর দিনে দর্পণ স্নান—শুভ্রা তোমার হাতেই তো লিস্ট রয়েছে, পড় না।'

শুভ্রা পড়তে লাগলেন, শোধিত পঞ্চগব্য—অর্থাৎ গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। শিশির, আখের রস, সাগরোদক, গজদন্ত মৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, চতুষ্পথমৃত্তিকা…' এবার হঠাৎ শুভ্রা থমকে দাঁড়ালেন।

'কী থামলে কেন? পড়ে যাও' সুভদ্রাদি বললেন।

কিন্তু শুভ্রা আর পড়তে পারছেন না। তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

'কী হলো?' বলে শিপ্রা মিত্র এবার একটু সরে এসে তালিকার দিকে তাকালেন। তাঁরও মুখটা যেন কেমন অপ্রস্তুত

দেখালো। ‘কী আছে, শিপ্রাদি?’ দুজন ছাত্রী একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলো।

‘না কিছু নয়, ও-নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।’ শিপ্রাদি উত্তর দিলেন।

ঠিক বুঝতে না পেরে, প্রিন্সিপ্যাল বললেন, হাতে অনেক কাজ রয়েছে—এখন এ-ভাবে সময় নষ্ট করলে চলবে না। পড়ে যাও।’

শিপ্রা বললেন, ‘ওটা বাদ দিয়েই না হয় পড়ে যা।’

বাদ দেবার কথা উঠতেই সবার কৌতূহল যেন বেড়ে গেল। আরও কয়েকজন অধ্যাপিকা এবার শুভ্রার কাছে উঠে এসে ফর্দর দিকে তাকালেন। তাঁদের মুখের অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে শুরু করলো।

একজন বললেন, ‘সত্যি নাকি? ও-সব লাগে, তাতো কখনও শুনিনি, এতো পুজোয় গিয়েছি।’

আর একজন বললেন, ‘লাগে নিশ্চয়, না হলে পুরুতমশায় লিখে দেবেন কেন?’

ছাত্রীরা তখনও বুঝে উঠতে পারছে না। তারা বললে ‘কী দিদিমণি? পুজোতে কী লাগে?’

অধ্যাপিকারা এবার সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। শুভ্রাদি কোনোরকমে বললেন ‘না কিছু নয়।’ তিনি এবার সেই বিশেষ জিনিসটি বাদ দিয়ে পড়া শুরু করবার চেষ্টা করলেন—‘মধু, কর্পূর, অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম……’কিন্তু বাদ দেওয়া চললো না। সবার দৃষ্টি যেন বাদ দেওয়া জায়গাতেই আটকে গিয়েছে। সুভদ্রা হালদার বললেন, ‘কী ব্যাপার?’

শুভ্রা অগত্যা এবার নিজের চেয়ার থেকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে উঠে এসে তালিকাটা দেখালো। এবার তাঁর চোখেও

বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। ঘরের মধ্যে ক'জন ছাত্রী আছে তিনি দেখে নিলেন। মাত্র দু'জন। তাদের বললেন, 'তোমরা এবার ফল-টলের ব্যবস্থাগুলো দেখো। আর তো সময় নেই।'

মেয়েরা বুঝলে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। তারা আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল এবার বললেন, হুঁ—জানতাম না।'

শিপ্রা মিত্র বললেন, 'মোস্ট এমব্যারাসিং। কম বয়সের কুমারী মেয়েরা রয়েছে। পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে পুজোতে কিনা বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা লাগে!'

'বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা দিয়ে কী হবে?' আর একজন অধ্যাপিকা প্রশ্ন করলেন।

'হরকিঙ্করবাবুর তালিকা অনুযায়ী ওই দিয়ে সপ্তমীর দিনে মহাস্নান হবে'—শুভ্রা বললেন।

ইতিমধ্যে আর সবাই লজ্জায় এমনই লাল হয়ে উঠেছেন যে কথা বলতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'স্বীকার করছি জিনিসটা এমব্যারাসিং—বিশেষ করে আমাদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে যা হয়ে আসছে তার উপায় কি?'

'ওইটুকু বাদ দিলেই হয়', একজন প্রস্তাব করলেন।

সুভদ্রাদি বললেন, 'তার উপায় কোথায়? বাদ দিলে সমস্ত পুজোটাই বাদ দিতে হয়।'

সুভদ্রাদি এবার সমাজনীতির অধ্যাপিকা তন্দ্রা রায়ের মুখের দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? শুভকাজে এই সব নোংরামি কি করে ঢুকতে দেওয়া হলো?'

অধ্যাপিকা রায় সদ্যডক্টরেটপ্রাপ্তা। বললেন, 'এনসাই-

ক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকসটা খুঁজে দেখলে হয়। কিছু পাওয়া যেতেও পারে। তবে আমার মনে হয়, দুটো কারণ হতে পারে।'

'কী কারণ?'

তন্দ্রা রায় বললেন, 'আমাদের দেশের বিশ্বাস পতিতাগৃহে প্রবেশের পূর্বে পুরুষ তার সমস্ত সদগুণ দরজার বাইরে ফেলে রেখে যায়। হয়তো সেইজন্যেই এই মৃত্তিকা বিশেষভাবে গুণান্বিত।'

কারুর মুখেই তখন কথা নেই। সবাই, এমন কি শিপ্রা মিত্রও, তন্দ্রা রায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তন্দ্রা রায় বললেন, 'আর একটা হতে পারে, হিন্দু ঋষিরা দুর্গোৎসবে উচ্চনীচ সবার সহযোগিতা কামনা করতেন। সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে বলতে পারেন।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'ইণ্টারেস্টিং। তবে ছাত্রীদের সামনে এ-সব আলোচনা না করাই ভাল। আপনারা এখন যে-যার কাজগুলো সেরে ফেলুন।'

হরকিঙ্কর সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন। মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা কিলবিল করছে। ছেলেটা মনের মতো হয়নি। অমানুষ জানোয়ারও বলা চলতে পারে। না হলে নিজের সমস্ত দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শূদ্রা রমণীর অঙ্কশায়িনী হয়ে, ধানবাদে সে কী করে পড়ে রয়েছে? কেন এমন হয়? ছেলেটা জন্মাবার আগে তিনি তো কোনো প্রকারে শাস্ত্রীয় আচরণের ত্রুটি করেন নি। যথাসময়ে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, ষষ্ঠী, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন—শাস্ত্রীয় কোনো পুজোতেই কোনো অনাচার হয়নি। তবুও ছেলেটা শেষপর্যন্ত কেন এমন হলো স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন।

এবার মহাশক্তির বোধনের সময় মার কাছে তিনি সব দুঃখের কথা নিবেদন করবেন।

কারা যেন কড়া নাড়ছে। কারা আবার এই সময় জ্বালাতন আরম্ভ করলে? বাড়িটা সত্যিই যেন ভূতের হাট হয়ে উঠছে। ওরা কারা কে জানে? মেয়েটা ওদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মনে হচ্ছে। বলছে, 'শোভনবাবু, আসুন আসুন। কতদিন খবর পাই না। শেষপর্যন্ত মনে পড়লো তাহলে?'

লোকটা যেন অভিনয় সম্বন্ধে কী আলোচনা করছে। সুব্রতাকে বলছে, 'তুমি চিন্তা কোরছো কেন, তোমাকে একটা ভাল রোল দেবই।'

'সে তো কতদিন হয়ে গেল শোভনবাবু। এই অ্যামেচার থিয়েটারি অসহ্য হয়ে উঠেছে। থিয়েটারের দিনটা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু এই রিহার্সেলটাই আর পারি না। আগে তবু দু'তিনদিন রিহার্সেল হলেই চলতো। এখন চোদ্দদিন হলে বাবুরা খুশী হন। তাও ট্যাক্সি ভাড়া দিতে চান না।'

হরকিঙ্করের কানে কথাগুলো ভেসে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে একটা লাঠি নিয়ে তিনি দরজার দিকে তেড়ে যান। কিন্তু যেন পক্ষাঘাতের রোগী তিনি। আসন থেকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই তাঁর।

হরকিঙ্কর শুনলেন, মেয়ে চলচ্চিত্রে নামবার জন্যে পাগল। লোকটা বলছে, 'সাইড পার্ট থেকে শুরু করো। তারপর আস্তে আস্তে উঠবে।'

মেয়ে বলছে, 'শোভনবাবু, তা হয় না। আপনি তো এ লাইনে অনেকদিন রয়েছেন। যে হিরোইন হয়, সে প্রথম দিন থেকেই হয়। সাইডগার্ল যে সে চিরকাল সাইডগার্লই থেকে যায়।'

মেয়ে যেন শোভনবাবুর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে।

বলছে, 'না শোভনবাবু, আপনার 'একস্ট্রা' যোগাড় করবার কনট্রাক্ট—আপনি যোগাড় করুন, সাপ্লাই করুন। কিন্তু আমাকে ভাল একটা প্রোডিউসার ধরিয়ে দিন। সুযোগ যদি পাই, দেখিয়ে দেবো কোথায় লাগে আপনাদের···'

শোভনবাবুর গলা যেন এবারে নিচু খাদে নেমে এল। ফিসফিস করে কি বলছে মেয়েটাকে। বাড়িটা হলো কি? এতো বড়ো আস্পর্ধা, বাড়ির কর্তা কি মারা গিয়েছে? কিন্তু প্যারালিসিসটা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে—আঙুল নাড়াবার শক্তিও নেই হরকিঙ্করের।

হরকিঙ্করের মনে পড়লো বাড়িভাড়া বাকি। মালিক উকিলের চিঠি দিয়েছে, ছাড়তেই হবে বাড়ি। ওরা বলেছে, বাড়ি ভেঙে ফেলবে। কিচ্ছু নেই বাড়িটার। অন্য বাড়ি দেখেছেন হরকিঙ্কর। অনেক ভাড়া চায়। তিন মাসের আগাম। এখানেও সাত মাস বাকি। টাকা চাই—অনেক টাকা। তবে যদি বাঁচা সম্ভব হয়। টাকাটাই যেন বিষ হয়ে গলে গলে দেহের রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—যেন তারই ক্রিয়ায় স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে প্যারালিসিসের সূচনা করেছে।

ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। হরকিঙ্কর চোখ বুঁজে তখন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন—ওং ভূর্ভুবস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।···

আবার যেন বল ফিরে পাচ্ছেন হরকিঙ্কর। তিনি এবার আসন থেকে উঠে পড়লেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা বলছে, 'আচ্ছা তাই ঠিক রইল। কোনো অসুবিধে হবে না।'

ভুলে যাবার চেষ্টা করছেন হরকিঙ্কর। যেন তাঁর চোখ কান সব বিষে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট পেট নিয়ে এক সর্বভুক হরকিঙ্কর যেন শুধু বেঁচে রয়েছেন।

মেয়ে এবার বাবার দিকে তাকালে। 'বেরোচ্ছিস নাকি তুই?'

'হ্যাঁ বাবা, একটু কাজ আছে।'

বাবা চুপ করে রইলেন, মেয়ে বললে, 'একটা বাড়ির খবরও সেই সঙ্গে নিয়ে আসবো।'

বাবার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। মেয়ে বললে, 'বাবা, কী এতো ভাবেন বলুন তো? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হরকিঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দশকর্মা ভাণ্ডারে গিয়েছেন। পুজোর জিনিসগুলো কেনবার দায়িত্ব শুভ্রা শেষ পর্যন্ত ওঁর ঘাড়েই চাপিয়েছেন। পৃথিবীর যত উদ্ভট জিনিস সব ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। ফর্দ মিলিয়ে কিনতে শুরু করেছেন হরকিঙ্কর। 'আপনারা সব আসল জিনিস দেন তো? না পুজোর জিনিসেও ভেজাল ঢুকেছে আজকাল?'

দোকানদার বিরক্ত হয়ে বলেছেঃ 'কেন বলুন তো?'

হরকিঙ্কর উত্তর দিয়েছেন 'মায়ের পুজোয় আজকাল তেমন ফল হয় না কেন? হয়তো ভেজালের জন্যেই।'

দোকানদার গুম হয়ে থেকেছে। 'ভরসন্ধ্যেবেলায় এমন কথা শুনিয়ে গেলেন?'

জিনিস মেলাতে মেলাতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মৃত্তিকা কই! বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথায়?'

'নেই।'

'রাখেন না?'

'ভেজাল। এমনি মাটি তুলে পুরিয়া করে বিক্রি করি আমরা', দোকানদার উত্তর দিয়েছে।

'তাহলে চাইনে।' মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে হরকিঙ্কর সোজা কলেজে চলে এসেছেন। সেখানে তখন পুরোদস্তুর হৈ-হৈ চলেছে। রাত পেরোলেই পুজো। ঢাকি আসবে এখনই। আর ঢাকের বাদ্যি শুরু হলেই তো পুজো আরম্ভ হয়ে গেল।

হরকিঙ্কর মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরা মা মহাশক্তির পুজো করবে? করুক না, করতে আপত্তি কি, তিনি নিজের মনেই বললেন।

শুভ্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'সব জিনিস পেয়েছেন তো হরকিঙ্করবাবু?'

'একটা বাকি আছে, এখনই আনছি,' হরকিঙ্কর উত্তর দিলেন।

আবার পথে বেরিয়েছেন হরকিঙ্কর। কি যেন খুঁজছেন তিনি। জায়গাটা কোথায়? নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও পল্লীটা আছে। ছোটবেলায় ওঁদের দেশের পল্লীটা চিনতেন। গ্রামের এককোণে, কয়েকখানা মেটে বাড়ি। আমোদিনী দাসী বলে একটা বুড়ি ও-লাইন ছেড়ে দুধের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। ছোটবেলায় কয়েকবার তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলেন হরকিঙ্কর।

কিন্তু এখানে পাড়াটা কোথায়? খবর রাখেন না কোনো কিছুরই তিনি। রাস্তার মোড়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল বেশ্যাবৃত্তি বেআইনী হয়ে গিয়েছে। সত্যিই যদি কোনো দিন পতিতাবৃত্তি উঠে যায়, তাহলে পুজোর সময় বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু কাগজেই তিনি পড়েছেন, আইন করে কিছুই হয়নি—ব্যবসা পুরোদস্তুর চলেছে। সুতরাং এখন থেকে সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী লাভ?

পানের দোকানে খোঁজ নেওয়াই বোধ হয় ভাল, ওরা নিশ্চয় খবর রাখে। সোজা গিয়ে দোকানদারকে প্রশ্ন করেছিলেন। ওরা ফিকফিক করে হেসেছে। 'এই বয়সেও! বুড়ো হয়ে মরতে চলেছে এখনও!'

একজন বললে, 'তোর অত গার্জেনগিরিতে দরকার কি? জিজ্ঞেস করছেন রাস্তাটা বলে দে।'

পানে চুন লাগাতে লাগাতে দোকানদার বলেছে, 'জরুর। বহুত আদমীই খবর নেয়। কিন্তু ঠিক এই সময় নয়, আর কিছুক্ষণ পরে।'

তারপর হরকিঙ্করকে আর একবার ভালভাবে দেখে, মুখ-টিপে হাসতে হাসতে বলেছে, 'নতুন শখ হয়েছে বুঝি? বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যান। মিনিট পাঁচেক পরে ডান দিকের পাকা রাস্তাটা ধরবেন। ওইখানেই সিনেমা হল। হলের পিছন দিকেই গোটা কয়েক গলি—ওইখানেই যা চাইছেন, তা পাবেন!'

আর সময় নষ্ট না করে হরকিঙ্কর এগোতে শুরু করেছেন। সিনেমা হলের কাছে আরেকটা দোকানকে জিজ্ঞেস করতে হলো। তারাও মুচকি হাসলে। বললে, 'শরাব চাই নাকি বাবু? ভাল জিনিস পাবেন।'

দাঁতে দাঁত চেপে হরকিঙ্কর গলিতে ঢুকে পড়লেন। কয়েকটা দরজার কাছে কারা যেন সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরকিঙ্কর একবার থমকে দাঁড়ালেন। গ্যাসপোস্টের আলোয় মেয়েগুলোও তাঁকে ভাল করে দেখে নিলে। এমন নামাবলী গায়ে সদ্‌ব্রাহ্মণ অতিথি তারা বড় একটা পায় না। তাই আহ্বান জানালে, আসবেন নাকি ঠাকুর?'

হরকিঙ্কর ওদের দরজার দিকে তাকালেন। লাল সিঁদুরে কা যেন লেখা—শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়। পাশের দরজাতেও তাই লেখা। ব্যাপার কী?

এগিয়ে গেলেন হরকিঙ্কর। এখানে লেখা—'ভদ্রলোকের বাড়ি।' হরকিঙ্করের দেহটা যেন ঘুলিয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি মৃত্তিকা সংগ্রহ করে ফিরে যেতে হবে।

এইখানটা একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে। দরজার মাথায় মায়ের নামও রয়েছে। এ-বাড়ির মেয়েরা এখনও বেরিয়ে আসেনি। হয়তো এখনও সাজপোশাক করছে, কিংবা ওদের হয়তো বাইরে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয় না। এইখানকার মৃত্তিকাতেই কাজ চলে যাবে। উবু হয়ে বসে মাটি সংগ্রহ করতে বসলেন হরকিঙ্কর। এমন সময় কে যেন নারীকণ্ঠে বললে, 'ও-মাগো, লোকটা ওখানে বসে কী করছে?'

হৈ হৈ করে ভিতর থেকে আরও দুটো-তিনটে মেয়ে এসে হরকিঙ্করের হাত চেপে ধরলো। 'এই মিন্‌সে, এখানে কী করছিস?'

হরকিঙ্কর ঘাবড়ে গিয়েছেন। 'না মা, কিছু করছি না।'

'মুয়ে আগুন মিন্‌সের, ঢঙ দেখলে মরে যাই। উনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!'

'সত্যি বলছি মা,' হরকিঙ্কর কাতর আবেদন করলেন।

'ওর হাতে কী রয়েছে, দেখ তো?' একজন বললে, আর একজন জোর করে হরকিঙ্করের মুঠোটা খুলে ফেললো। 'এক মুঠো ধুলো নিয়ে বুড়ো কী করছিল গা?'

আর একজন মেয়ে প্রসাধন অর্ধসমাপ্ত রেখেই বোধ হয় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। গা দিয়ে তার সস্তা স্নো-এর গন্ধ বেরোচ্ছে! সে এবার ভয়ে শিউরে উঠলো। 'সর্বনাশ করেছে, কাপালিক নিশ্চয় তুক করছিল।'

'না না, আমি পুরুত মানুষ, তুক করবো কেন?' হরকিঙ্কর একটু ভয় পেয়েই বললেন।

মেয়েদের গলার স্বরে একটা মোটকা লোকও কোথা থেকে হাজির হয়েছে। 'ঘেঁটুবাবু, দেখুন না, লোকটা এখানে বসে মাটি তুলছিল। কি তুক তাক করে গেল কে জানে।'

ঘেঁটুবাবু এবার হরকিঙ্করের গলার চাদরটাকে টেনে ধরলো।

অশ্লীল গালি দিয়ে বললে, 'তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কেবল এখানকার মৃত্তিকা নিতে এসেছি দুর্গাপুজোর জন্যে।'

ঘেঁটুবাবু হরকিঙ্করের হাতে আচমকা একটা থাপ্পড় দিলে। সমস্ত মাটিটা ঝরে পড়ে গেল। মেয়েরা বললে 'কী সর্বনাশ গা, এত বাড়ি থাকতে আমাদের দরজা থেকে মাটি তোলা। মরণ আর কি! গতর বেচে করে খাচ্ছি, তাও সহ্য হচ্ছে না মিন্সের।'

ঘেঁটুবাবু বললে, 'যা শ্লা! আর খবরদার মাটি নিতে আসিস না এখানে। তাহলে জান লিয়ে লেবো।'

ঘেমে নেয়ে উঠেছেন হরকিঙ্কর। উত্তেজনায় দেহটা কাঁপছে। সামান্য মৃত্তিকা সংগ্রহ করতে এসে এ কি বিপত্তি! কেন বাপু, সামান্য একটু মাটি নিলে কী তোমাদের ক্ষতি হতো?

হরকিঙ্করের দেহটা ঘিনঘিন করছে। যেন কয়েকটা নর্দমার ধেড়ে ইঁদুর তাঁর গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। স্নান করতে হবে তাঁকে। গঙ্গাজলে নিজেকে পবিত্র করতে হবে।

কিন্তু মাকে কী দিয়ে স্নান করাবেন তিনি? মহাস্নানের সময় এই মৃত্তিকা আসবে কোথা থেকে? পাগল নাকি তিনি? এত ভাববার কী আছে? হাজার হাজার পুজো তো-দশকর্মা-ভাণ্ডারের ভেজাল মাটি দিয়েই হচ্ছে। আরেকটা হবে।

একটা রিকশা ডাকবেন নাকি হরকিঙ্কর? কিন্তু এই অবস্থায় রিকশায় চড়লে লোকে মাতাল ভাববে। হাঁটছেন হরকিঙ্কর।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন হরকিঙ্কর। ক্যাঁচ করে একটা মোটর এসে প্রায় ঘাড়ের কাছে থামল।

গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিপরা এক ভদ্রলোক নামলেন। পেটটা বেশ মোটা, গলায় হার ঝুলছে। 'সুব্রতা দেবীর বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? ক্লাবে ক্লাবে থিয়েটার করে বেড়ায়।'

হরকিঙ্কর বিরক্তভাবে লোকটার মুখের দিকে তাকালেন। 'সুব্রতা দেবীর বাড়িতে এত রাত্রে দেখা হয় না।'

লোকটা এবার নেশার ঘোরে খিলখিল করে হাসতে লাগল। 'মাইরি আর কি? গোঁসাই বাড়ির মেয়ে বুঝি।'

'যা বলছি, তাই শুনুন। সুব্রতা এমন সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে না।'

'আহা-হা, চু চু! তাহলে সব বলবো নাকি? কিন্তু কে হে তুমি বাবার ঠাকুর?'

'মুখ সামলে কথা বলুন বলছি।'

'ওরে বাপরে, মানে মানে কেটে পড় বাছাধন, নইলে স্রেফ ট্রেনে কাটা পড়বে।'

'এটা ভদ্দরলোকের পাড়া, যদি বেশী কিছু করেন।'—হরকিঙ্করের দেহে শক্তি থাকলে লোকটার গালে একটা থাপ্পড় মারতেন।

'ও বাবা! সুব্রতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো, কবে থেকে উনি ভদ্দরলোকদের পাড়ায় উঠে এসেছেন!'

তু'জনেই এবার বাড়ির দরজার সামনে হাজির হয়েছেন।

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না হরকিঙ্কর। হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির উপরের দিকটা ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটার সঙ্গে তিনি পারবেন কী করে। এক ঝটকায় সে হরকিঙ্করকে মাটিতে ফেলে দিলে। 'শালা, আমি ভাবছিলাম আমিই শুধু মাতাল হয়েছি। দেখছি তুমিও মাল টেনেছো।'

লোকটা, হয়তো এবার হরকিঙ্করের বুকের উপর চেপে বসতো। হরকিঙ্করও গড়াতে গড়াতে লোকটার পা ধরে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলেন। হয়তো সর্বনাশা কিছু একটা ঘটতো। কিন্তু গোলমাল শুনে সুব্রতা এসে দরজা খুলে দিয়ে থমকে দাঁড়াল।

'এই যে সুব্রতা দেবী। একটু আগে আপনি বাড়িতে আসতে বারণ করে দিলেন। কিন্তু আপনি চলে আসবার পর দেখলাম হাতে কাজ নেই। আপনাকে দেখবার জন্যে মনটাও কেমন হুহু করতে লাগল।'

হরকিঙ্কর মাটি থেকে উঠে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মা তুই ভিতরে চলে যা। কোথাকার মাতাল এসে পাড়ায় ঢুকেছে। কোত্থেকে তোর নাম জেনেছে। আমি ওর দেখাচ্ছি মজা।'

কিন্তু এ কি হলো ? এখনও মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন ?

লোকটা বললে, 'কোথাকার এই বুড়োটাকে আপনার বাড়ির খোঁজ জিজ্ঞেস করে ফ্যাসাদে পড়েছি। আপনি তৈরি হয়ে নিন। গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

সুব্রতা তখনও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আস্তে আস্তে বললে, 'আপনি এখন যান। আমি যাবো না।'

'কেন কী হলো আপনার ? এই তো কিছুক্ষণ আগে হোটেল থেকে এলেন। ডার্করুমে টেস্ট দিলেন। এর মধ্যেই ক্যারাকটার পাল্টিয়ে গেল ? বইতে নাবার ইচ্ছে নেই বুঝি !'

'কী ?' হরকিঙ্কর আবার লোকটার দিকে তেড়ে গেলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, যা-বলছি ঠিক তাই। লোকটা দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

সুব্রতা এবার চিৎকার করে উঠলো, 'যান বলছি। না

হলে এখনই লোক ডাকবো। চাই না আপনার বইতে পাঠ নিতে।' সুব্রতা এবার ঠক ঠক করে কাঁপছে।

লোকটা বুঝলো কোথাও আজ একটা মস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছে। বললে, 'ঠিক হ্যায় যাচ্ছি।' তারপর হরকিঙ্করকে শুনিয়েই যেন বললে, 'অন্য কারুর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে নিশ্চয়।'

দরজা বন্ধ করে দিলেন হরকিঙ্কর। ঘামে নেয়ে উঠেছে তাঁর দেহটা। সুব্রতা হাঁপাচ্ছে আর কাঁপছে। কাঁপছে আর হাঁপাচ্ছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন হরকিঙ্কর। মেয়ে বললে 'বাবা!'

বাবা চুপ করে রইলেন

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'বাবা, লোকটা সপ্তমীর দিনে আমার সঙ্গে ফিল্মের কণ্ট্রাক্ট সই করবে বলেছিল। এই একবারই—ঢোকবার সময় কেবল ওদের কাছে ছোট হতে হয়। তারপর নাম হয়—সব ঠিক হয়ে যায়।

বাবা পাথরের মত চুপ করে রইলেন।

মেয়ে ডাকল 'বাবা!'

বাবা কোন উত্তর দিলেন না।

এখন রাত অনেক। ওরা শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ সুব্রতার ঘুম ভেঙে গেল। দরজাটা যেন খোলা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাই তো, খোলাই রয়েছে। বাবার বিছানাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সুব্রতা। বুকটা ছাৎকরে উঠলো, বিছানায় তো কেউ নেই।

তড়াং করে সভয়ে উঠে দাঁড়াল সুব্রতা। 'বাবা, বাবা তুমি কোথায় গেলে?'

বাবা দরজার বাইরে রয়েছেন। 'বাবা, এখনও জেগে রয়েছেন আপনি? কাল ভোরবেলাতেই না পুজো!'

দরজার সামনে উবু হয়ে বসে হরকিঙ্কর কি যেন করছিলেন। হরকিঙ্কর এবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ ছুটো রাত্রের অন্ধকারে কাপালিকের চোখের মতো জ্বলছে।

ওখান থেকে কী কুড়োচ্ছিলেন বাবা?'

হরকিঙ্করের চোখ ছুটো থেকে এবার যেন সত্যিই আগুন বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'মাটি।'

সুব্রতা বাবার মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে। তবু কাছে গিয়ে পরম স্নেহে বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললে, 'মাটি কী করবেন বাবা?'

বাবা প্রথমে নির্বাক হয়ে রইলেন। মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাঁর ঠোঁট ছুটো এবার কাঁপতে শুরু করলো। 'পুজোয় লাগবে,' এই বলে রাত্রের অন্ধকারে পুরোহিত হরকিঙ্কর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।